শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত : প্রথম প্রকাশ ১৯২৯

প্রকাশক :
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

বর্ণ সংস্থাপক :
দি বেঙ্গল পি টি এস এণ্ড কমপিউটার সেন্টার
৯এ, রায়বাগান স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৬

মুদ্রাকর :
শিবদুর্গা প্রেস
৩০ বি, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ :
ইন্দ্রনীল ঘোষ

করুণা সংস্করণ প্রসঙ্গে

গত শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষে মানদা দেবীর 'শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। সেই আমলে যে কারণেই হোক বইটির একাধিক সংস্করণ ও অন্য ভাষায় অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছিল।

মানদা দেবীকে যে-'রমেশদা' ঘরের বাইরে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং মানদা দেবীর কথানুসারে পরোক্ষে দেহ-ব্যাবসার দিকে যেতে বাধ্য করেছিলেন, সেই 'রমেশদা'-ও কিন্তু লিখেছিলেন 'রমেশদার আত্মকথা'। বইটির পাঁচটি সংস্করণ হয়েছিল। পরে আরো পুনর্মুদ্রণ হয়েছে কিনা জানা নেই। 'রমেশ' বা 'রমেশদা'—গ্রন্থকার রমেশচন্দ্রর লেখা থেকে জানা যায়, সেটি তার পিতৃদত্ত নাম নয়, ছদ্মনাম। বইটির পঞ্চম সংস্করণ অনুসরণ করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে মানদা দেবীর বইটি সম্প্রতিক কালেও একাধিক প্রকাশক কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। যদিও আমাদের জানা নেই—'রমেশদার আত্মকথা' সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে কি-না।

অথচ, গত শতকের ষাটের দশক থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে, ফ্রান্সে নারী আন্দোলন যা 'Women's Lib' অভিধায় অভিধিত, তার প্রসার ঘটতে থাকে সেই সূত্রে প্রসঙ্গটি লিঙ্গ-রাজনীতি, সমাজতত্ত্বে ও নীতিশাস্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গেও—নারীবাদ/ মানবীবাদ নিয়ে বৈদ্যায়তনিক চর্চাও শুরু হয়ে গেছে।

এই সব কথা মনে রেখে বাঙালি প্রকাশকদের মূর্খতার বদনাম/সুনাম বাজারে প্রচলিত। তা জানা সত্ত্বেও আমরা এই সুলভ এবং দুর্লভ বই দুটিকে দুই মলাটে বেঁধে আমাদের এই সংস্করণ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছি। বই দু'টির কথাবস্তুর কালসীমা গত শতকের বিশ থেকে ত্রিশ দশক। ইতিমধ্যে নারীদেহের দেহ-ব্যাবসার প্রকরণগত পদ্ধতির আপাতদৃষ্টে কলা-কৌশলও পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়ে আরও প্রকট ও আগ্রাসী হয়েছে। গড়ে উঠেছে ব্যাবসা-চক্রের নানা র‍্যাকেট, যার একটি নারী-পাচার চক্র।

যুগধর্মের এইটাই তো বিষয়। আমরা এখনকার পরিভাষায় বই দুটিকে 'সফ্‌ট পর্নো'র পর্যায়েও ফেলতে পারি না। যৌন-লালসাকে বই দুটি কোনক্রমেই যে উত্তেজিত করবে না তা বোঝবার মতো ব্যাবসাবুদ্ধি প্রকাশকের আছে বলেই বিশ্বাস। তবে কেন এই বই দু'টি প্রকাশিত করলাম। সংগত ভাবেই এই প্রশ্ন উঠবেই। এর জবাব আদিমকাল থেকেই নানাভাবে নারীদেহ নিয়ে ব্যাবসা নিয়ে আজ আমাদের মধ্যেও প্রশ্ন উঠেছে। 'পতিতা', 'বেশ্যা' এই সব অভিধা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। চর্চা চলছে 'মানবীবিদ্যা' নিয়ে। এই পরিপ্রেক্ষিতে যাঁরা এ-বিষয়ে আগ্রহী তাঁদের হাতে তথাকথিত এক 'পতিতা'র এবং অভিযুক্ত 'পতিত'-এর লেখা বই দুটির তুলনামূলক পাঠের সুবিধার জন্য এই সংস্করণ। সংকলক সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন টীকা-টিপ্পনী দিতে। কিন্তু সংকলক গবেষক নন, এবং

এই বিষয়ে নানা আন্দোলনের কথা সংবাদপত্র মাধ্যমেই তাঁর জানা মাত্র। তবে প্রবাদ আছে 'নেই মামার থেকে কানা মামা'ই শ্রেয়।

শ্রদ্ধেয়া বেলা দত্তগুপ্তর মূল্যবান প্রবন্ধের অনুবাদ প্রকাশ করবার অনুমতি তিনি আগেই দিয়েছিলেন। তাঁর সেই অনুবাদ থেকে এই সংকলনটির ক্ষেত্রে অনাবশ্যকবোধে শেষ দুই অনুচ্ছেদের আগের চারটি অনুচ্ছেদ বর্জিত হয়েছে।

মূল বই-এ যে-সব ক্ষেত্রে বড় টাইপ ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলি লেখিকা বা লেখকের নয়। পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করবার জন্য সংকলক এই পদ্ধতি নিয়েছেন বলে আমাকে জ্ঞাত করিয়েছেন।

আমাদের ক্রটি-বিচ্যুতি দেখিয়ে বইটির সমালোচনা বা চিঠি পাঠালে কৃতজ্ঞ বোধ করবো। আর আশি বছর পেরনো বই-এর কপি থেকে ছবি পুনরুদ্ধার করা খুবই দুরূহ।

বিনীত—

প্রকাশক

বারবণিতা প্রসঙ্গ

বেলা দত্তগুপ্ত

বারবণিতাবৃত্তি বা বেশ্যাবৃত্তিকে পৃথিবীর প্রাচীনতম পেশা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কত প্রাচীন সে সম্বন্ধে সামান্যতম একটি ধারণা করা যেতে পারে **দ্য ইপিক অব গিলগামেস বইটির সূত্রে। খ্রীঃপূঃ দু'হাজার বছর আগে সুমের, আক্কাদ ও ব্যাবিলনীয় ইতিহাসে এই কাহিনী বিধৃত আছে এবং কাহিনীর মধ্যেই উল্লেখ পাওয়া যায় "Harlat"** বা বেশ্যার। বাইবেলে উল্লিখিত মহাপ্লাবনের পর প্রথম রাজবংশ "কিশ"-এর শেষ রাজা গিলগামেস। এ বিষয়ে সুমেরিয় ইতিহাসে কিছুটা মতভেদ থাকলেও গিলগামেস-এর রাজত্বকালের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ পোষণ করা উচিত হবে না।

প্রবল পরাক্রান্ত ও অসীম শক্তিধর ছিলেন এই গিলগামেস। তাঁর পরাক্রমে প্রজাকুল অতিষ্ঠ হয়ে ওঠায় তারা দেবাদিবের "অনু"-র কাছে আকুল প্রার্থনা জানায় যেন গিলগামেসকে পর্যুদস্ত করতে সম-শক্তিশালী কাউকে পাঠান হয়। "অনু" তখন সৃষ্টি দেবী "অরুক"-র কাছে আবেদন করে :

> You made him. O *Aruru,* now create his equal ; let it be as like him as his own reflection, his second self, stormy heart for stormy heart. Let them contend together and leave *Uruk* in quiet.

প্রসঙ্গত, গিলগামেস URUK-এর অধীশ্বর ছিলেন। এর পর সৃষ্টি হল এনকিদু (Enkidu)-এর যে কিনা না-মানুষ, না-পশু। মানুষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতাহীন এবং বনের প্রাণীই তার নিত্য সহচর। এহেন 'এনকিদু'-কে বশ করবার জন্য গিলগামেস তাঁর অনুচরদের নিম্নলিখিত আদেশ দিচ্ছেন :

> Trapper, take with you a harlot, a child of pleasure. At the drinking-iole she will stich and when he sees her beackoning he' will embrace her and the game of the wilderness will surely reject him.

আদেশ অনুযায়ী কাজ হল এবং "এনকিদু" বাঁধা পড়লো মানবসম্পর্কের বেড়াজালে। প্রাচীন মিশরে পতিতাবৃত্তি সমাজের অনুমোদন অনুসারেই বহাল ছিল। "থেস" নামে একজন প্রখ্যাত রূপোপজীবিনী প্রাচীন মিশরের এক বিশেষ উল্লেখনীয় ব্যক্তিত্ব। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ফরাসি লেখক **আনতোল ফ্রাঁস "থেস" (১৯০৮) উপন্যাসটি**

লেখেন। এ থেকেই বোঝা যায় যে ''থেস''-এর কতটা প্রতিপত্তি ছিল প্রাচীন মিশরীয় সমাজে। তাছাড়া, পিরামিড নির্মাণে পতিতাদের দেহবিক্রয় লব্ধ অর্থসাহায্যের ভূমিকা কোন মতেই অগ্রাহ্য করার নয়। পতিতাদের অর্থে গির্জা নির্মাণ রোমের সেন্ট পিটর্স গির্জা সম্পর্কেও প্রযোজ্য—এ কথা জানিয়েছেন বেঞ্জমিন ও মাস্টারস তাঁদের **দ্য প্রস্টিটিউট ইন সোসাইটি** বইটিতে (পৃ ৩৬)।

বর্তমান প্রবন্ধের ক্ষেত্রে যেটি প্রাসঙ্গিক তা হল পাঁচহাজার বছর আগের সমাজেও কোন বারবণিতাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার করা। এই ঘটনাসূত্রে এটাও মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে এটি একটি উটকো ব্যাপার ছিলনা। বেশ্যাবৃত্তি নিশ্চয়ই তখন যথেষ্ট দানা বেঁধেই বর্তমান ছিল সমাজে। প্রচীনত্বের নিরিখে এটি একটি মূল্যবান উদাহরণ।

বিদেশের চারণভূমি থেকে দেশের বৃত্তে আসা যাক। বারবণিতা পেশার ইতিহাস এদেশেও কম খানদানের নয়। **রামায়ণ মহাভারতে এবং অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে (শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক)** বারবণিতা সম্বন্ধে সংখ্যাতীত উল্লেখ আছে। **মহাভারতের "স্ত্রী পর্ব" এখানে উল্লেখনীয়।** পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধযুগে আমরা আম্রপালী, পদুমাবতী, শালবতী, শ্যামা, সুলভা প্রভৃতি সমাজের সেরা বারবণিতাদের নাম পাই। প্রখ্যাত চিকিৎসক জীবক শালবতীর সন্তান। জন্মের অব্যবহিত পরে শালবতী নিজের পেশা বজায় রাখতে পুত্র সন্তানকে নগরের সড়কের উপর রেখে আসার নির্দেশ দেন। পরে এই শিশু চিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। **তিনি স্বয়ং বুদ্ধদেবের চিকিৎসক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতক থেকেই গণিকারা সমাজে প্রবল হয়ে ওঠে।** প্রকাশ্য ও পরোক্ষভাবে গণিকাবৃত্তি চলতে থাকে। এই সময়ে গণিকাদের নিম্নরূপ শ্রেণীকরণ হয় :
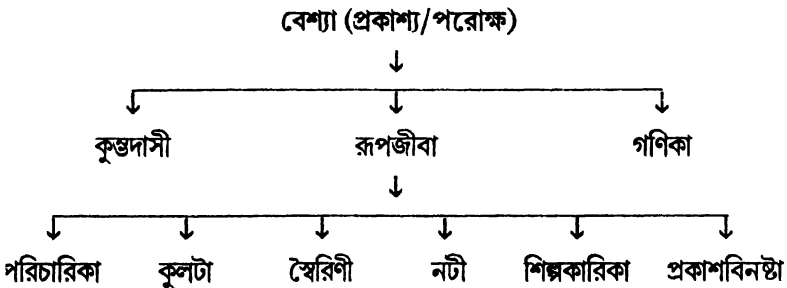
কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র" লেখা হয় মৌর্যদের রাজত্বকালে, খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে। মৌর্যযুগে আরো একটি জিনিস লক্ষণীয়। **পতিতাদের সম্বন্ধে এই প্রথম একটি ম্যানুয়াল বা রীতিবিধি রচিত হয় এই মৌর্যযুগেই।** দত্তক এই কাজে এগিয়ে আসেন এবং **"বৈষিকম্"** নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। পরবর্তী কালে বাৎস্যায়ন তাঁর **কামসূত্র বইটিতে দত্তকের বৈষিকম্ পুস্তিকটি অত্যন্ত নিবিড় ভাবে ব্যবহার করেছিলেন।**

বৈষিকম্ অথবা পতিতার কামকলার সূত্রাবলী সারা পৃথিবীতে অনন্যতার দাবি রাখতে পাবে, কারণ I he Courtesans Art সম্বন্ধে এমন বিশদ আলোচনা পৃথিবীতে বিরল। বাৎস্যায়নের "**কামসূত্র**"ও এই সময়েই লেখা হয়েছিল। উভয় গ্রন্থেই বারবণিতাদের সম্বন্ধে অসংখ্য তথ্য আছে। দেহোপজীবিনীদের উপর রাষ্ট্র তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখতো। এরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শ্রেণিকৃত হত, যথা দেবতাদের সেবাকারিণী—**অবরুদ্ধা** এবং **ভূয়িশ্যা**। দেবতাদের সেবিকাদের সম্বন্ধে রাষ্ট্রের দায়দায়িত্ব ছিল না। পুরোহিতেরাই তাদের হিতাহিতের দায় বহন করতেন। **অবরুদ্ধা**-রা দুটি দলে বিভক্ত ছিল। একদল বিশেষ বিশেষ পরিবারের রক্ষিতা হিসেবে থাকতো। রাষ্ট্রের গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ধনকুবেররাই এদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভরণপোষণের ভারও ছিল এঁদেরই হাতে। পরিবারের গন্ডিবদ্ধ নিয়ম কানুন, সতীত্বের রীত-সহবৎ এই দলের অবরুদ্ধাদের মেনে চলতে হত। দ্বিতীয় দলের অবরুদ্ধারা অতিঅবশ্য অপেক্ষাকৃত নিচু মানমর্যাদার শরিক ছিল। জনসাধারণ তাদের ভোগ করতে পারতো—**গণিকা, বারবণিতা হিসেবে**। বংশপরম্পরায় এদের এই পেশা চালিয়ে যেতে হত। অর্থাৎ তারা রাষ্ট্র বা সরকার অনুমোদিত সব বারাঙ্গনা। এসব দেহোপজীবিনী-রা শহরের চৌহদ্দির মধ্যেই বাস করার সুযোগ পেত। কিন্তু, তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত '**ভূয়িশ্যা**"-রা শহরের গন্ডিতে বাস করতে পারতো না। তাদের বাস করতে হত শহরের বাইরে। **এদের উর্পাজনের উপর রাষ্ট্রের দাবিও ছিল। কারণ মাসিক আয়ের থেকে দু'দিনের উপার্জন সরকারকে দিতে হত তাদের।** পরিবর্তে সরকার তাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ভার নিত। বারবণিতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রব্যবস্থা যে যথেষ্ট সুচিন্তিত ছিল এবং তার প্রমাণ পাওয়া যায় এদের জন্য রাজকর্মচারী বহাল করার ব্যবস্থা থেকে। কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র"-এ "গণিকাধ্যক্ষ" একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি চাকুরে। এ সব ছাড়াও অন্যান্য বিশদ ব্যবস্থা ছিল "অর্থশাস্ত্র"-এ। কৌটিল্যের অর্থনীতি বইটির **দ্বিতীয় খণ্ডের ২৭ পরিচ্ছেদে** পতিতাদের সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ আছে। পতিতারা রাজা এবং সাধারণ্যের ভোগ্যা ছিল সন্দেহ নাই কিন্তু মানবিক অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা আমরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র-এ পেয়ে থাকি। পতিতাদের জন্য নিযুক্ত কর্মাধ্যক্ষ পতিতাদের আয়-ব্যায় (বর্তমান ও ভবিষ্যতের) সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করতেন। কারণ প্রতিটি পতিতাকেই প্রতি মাসেই সরকারকে তার প্রাপ্য "খাজনা" মেটাতে হত। অপরাধের ক্ষেত্রে পতিতাদের খুব কঠোরভাবেই সাজা পেতে হত। পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে আসা মহিলাদের জন্য ত্রুটি-বিচ্যুতি বিধায়, খুব কঠিন শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

দেহোপজীবিনী পেশার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে একরকম নিঃসন্দেহ হওয়া গেল। এর পরের প্রসঙ্গ কেন এই পেশা? এ ব্যাপারে কোন সহজ, সদুত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। কাম ও রতি-র জগতকে সীমাহীন সমুদ্র এবং অন্তহীন আকাশের সঙ্গেই তুলনা করা চলে এবং প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের ভোগের চাহিদা ও বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। বিভিন্ন দেশের কামউদ্দীপক প্রক্রিয়া/ প্রণালীর ইতিহাসে এসব তথ্য মেলে। ফলে, পরিবারের গন্ডিতে স্বাভাবিক যৌনপ্রক্রিয়ায়

অনেক মানুষই তৃপ্ত থাকে না। অ-স্বাভাবিক যৌনতৃপ্তির জন্য তাদের বাইরে সঙ্গী খুঁজতে হয় এবং দেহোপজীবিনীরা এদের পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম হয়। এই অ-স্বাভাবিক যৌনাচারের কিছু বর্ণনা ও তথ্য পাওয়া যাবে প্রখ্যাত **কিনসী প্রতিবেদনে** এবং সি. এইচ. রোলফ প্রণীত **"উইমেন অব দ্য স্ট্রীট"** বইটিতে। পঞ্চাশের দশকে লণ্ডনে প্রকাশিত হয় এই বই। এই পেশা গ্রহণ করার পিছনে আরো অনেক কারণ থাকতে পারে, বিশেষ করে আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে। এসবের মধ্যে সামাজিক কারণ নিঃসন্দেহে প্রাধান্য পাবে। কুলীনপ্রথাসর্বস্ব [বালবিধবা, বহু বিবাহ প্রথা—এরও আগে থাকতে এই বৃত্তির সহায়ক ছিল। সংকলক] উনবিংশ শতকের কলকাতা নগরীর অর্ধেকের বেশি বারাঙ্গনা ছিল কুলীনব্রাহ্মণদের বিবাহিত এবং পরমুহূর্তেই পরিত্যক্ত সব স্ত্রী-রা। সমসাময়িককালে কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেট এই মর্মে প্রতিবেদন রাখেন। সামাজিক অন্য কারণও ছিল এবং আছে। জাতি ও ধর্মে বিভক্ত আমাদের সমাজে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের স্ত্রী-পুরুষের মিলনে বাধা ছিল। বিয়ের লোভ দেখিয়ে মেয়েদের শেষ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হত "লালবাতি এলাকায়"। এই প্রক্রিয়া এখনও খুবই জোরদার আছে। ভিন্ন ধর্মভুক্ত পুরুষনারীর প্রণয়ের ক্ষেত্রেও এই এক-ই পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। অর্থনৈতিক ভাবে নির্জলা দারিদ্র্য বহু মেয়েকে এই পেশা গ্রহণে প্ররোচিত করে।

এসব তথ্য আমাদের মোটামুটি জানা। বর্তমানে এই পেশা সম্পর্কে কয়েকটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে সামাজিক পরিবর্তনের আবহে এবং মানবিক অধিকার স্বীকৃতির প্রসঙ্গে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

সামাজিক পরিবর্তন কি ভাবে বারবণিতাবৃত্তিতে নতুনমাত্রা এনে দিয়েছে সে সম্পর্কে প্রথমেই আলোচনা করছি।

স্ত্রীপুরুষের যৌনজীবন সম্বন্ধে বিগত শতাব্দীর মতো ততটা কঠোরতা বর্তমানে দেখা যায় না। অবাধ মেলামেশার সুযোগ আসাতে দেহসম্পর্কের ধারণাও এখন অনেক শিথিল। ফলে, যৌনসম্ভোগে সেই কড়াকড়ি এখন অতীতের ব্যাপার। ফলে, বর্তমান সমাজে "লালবাতি এলাকা"-র বাইরেও অসংখ্য "মধুচক্র" গড়ে উঠতে দেখা যায়। "পতিতাবৃত্তি" নিয়ে আমার যে-সব ছাত্র-ছাত্রী মাঠভিত্তিক গবেষণা [field research] করেছেন তাদের কাছ থেকেই জেনেছি যে "দেহবিক্রয়" আজ অনেক সহজ ও স্বেচ্ছাধীন। "সেক্স ও পাপ"-এর মধ্যে যে সম্বন্ধ আগে মানুষ দেখতে অভ্যস্ত ছিল, এখন তা অনেকাংশে দূর হয়েছে। যৌনক্ষুধা স্বাভাবিক এবং আশু মিটিয়ে ফেলার মনোভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই 'লিভ টুগেদার" বা বিবাহ বহির্ভূত সহবাস আজ অনেক সহনীয় ও স্বীকৃত।

সামাজিক পরিবর্তনের অন্য একটি মাত্রা হল 'অঢেল সমাজ"-এর ব্যবস্থা। এই সমাজে ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ সীমাহীন এবং চাহিদাও মাত্রাতিরিক্ত। অথচ আয় এবং সৎপথে আয়ের পথ সীমিত। বর্তমান জীবনে, বিজ্ঞাপন, [বৈদ্যুতিন] সঞ্চার-মাধ্যমে যে অজস্র লোভনীয় সামগ্রীর ইশারা প্রতিমুহূর্তে আমাদের কাছে পৌঁছয় তাতে কোন স্বাভাবিক

মানুষের প্রলুব্ধ না হবার কোন ব্যতিক্রম থাকে না। অর্থের প্রয়োজন হয় মাসকাবারি মাইনে ছাড়াও। এক্ষেত্রে, **স্বল্পসময়ের জন্য দেহদান করে অর্থ উপার্জন করতে পূর্বতন পাপবোধ আর কাজ করে না।** প্রায় কেউ-ই আজ আর "মেঘে ঢাকা তারা"-র নায়িকা হতে চায় না। এ জিনিস বিদেশে ভুরি ভুরি প্রত্যক্ষ করা গেছে। আজ আমাদের দোরগোড়ায় এসে গেছে এ ব্যবস্থা।

এ ছাড়াও আরেকটি ব্যাধি প্রবেশ করেছে ব্যাবসার Indenting-এর সূত্রে। নারীকে বন্ধক না রাখলে [যৌন প্রলোভন] বড় রকমের অর্ডার পাওয়া কঠিন। তাই হোটেলে হোটেলে "কলগার্ল" (Call Girl)-দের ছয়লাপ। এদের সুঠাম সুন্দরী হওয়া আবশ্যিক। তাই, হাড়জিরজিরে "লাল আলো" এলাকার মেয়ে দিয়ে কাজ হয় না। ভদ্রপরিবারের মেয়ে ছাড়াও প্রতিবেশী অঞ্চল থেকে মেয়ে আমদানি করতে হয়। প্রতিবছর নেপাল থেকে আনা হয় লক্ষাধিক মেয়ে যাদের বয়স ১৪ থেকে ১৮-এর মধ্যে। দেহব্যাবসায় এদের প্রয়োজন স্তিমিত হয়ে আসলে এদের ফেরত পাঠানো হয় নিজ গ্রামে, অর্থে ও দেহে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত অবস্থায়। কারণ ইতিমধ্যেই AIDS-এর মারাত্মক ব্যাধি তাদের শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করেছে। নিজ দেশে, নিজ গ্রামে তাই তারা অপাংক্তেয় পর্যায়ে চলে যায়। অপ্সরীঈপ্সিত দেহসৌন্দর্য ও সুষমার পরিণতি ঘটে এই ভাবে।

পতিতাবৃত্তি সম্বন্ধে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন ধারণা বর্তমান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে লীগ অব নেশনস্ (LON) উঠে পড়ে লেগেছিল এই বৃত্তি বন্ধ করার জন্য। LON-এর ক্ষেত্রে কয়েকটি সামাজিক ঘটনা বিশেষ ভাবে উৎসাহউদ্দীপক ছিল যথা, রাশিয়ায় নভেম্বর বিপ্লব। সোভিয়েত রাশিয়ার পত্তন ও সোভিয়েত রাশিয়ার পতিতাবৃত্তি বন্ধের আন্তরিক প্রয়াস। ইলা উইন্টার (Ela Winter) লিখিত 'Red Virtue' বইটি থেকে জানা যায় যে মহান নভেম্বর বিপ্লবের পর পরই চেষ্টা শুরু হয় কী ভাবে এই বৃত্তি থেকে পতিতাদের সরিয়ে আনা যায়। সংকল্প অনুযায়ী স্থির হয় এদের সবাইকে উৎপাদনশীল কর্মে নিযুক্ত করা হবে যাতে সারাদিনের পরিশ্রমের পর তারা আর অবাধ যৌনসঙ্গমের কথা ভাবতে না পারে। কিন্তু কিছুদিনের পরীক্ষার পর দেখা গেল যে দীর্ঘদিনের অভ্যাসবশত ঐ একদা-পতিতার দল দিনের কাজের শেষে সন্ধের নিরিবিলিতে আবার "*যৌন খদ্দের*" সংগ্রহে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। তদানীন্তন সোভিয়েত সরকার অবিলম্বে তাদের logistics বা কৌশল বদল করে ফেললেন। এদের কাজের সময় নির্দিষ্ট হল সন্ধ্যা থেকে ভোর অবধি। অর্থাৎ, অন্য কর্মীদের ক্ষেত্রে যে সময় দিন, এদের পক্ষে তা হল রাত এবং তাদের রাত এদের দিনে বর্তালো। বহুতর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সোভিয়েত সরকারকে পতিতাবৃত্তির মোকাবিলা করতে হয়েছিল। সোভিয়েত রাশিয়ার এই ধরণের প্রয়াস ইওরোপের দেশগুলির জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করে। **ততদিনে অবশ্য কুপ্রীন-এর প্রখ্যাত বই 'ইয়ামা" অর্থাৎ 'গর্ত" বইটি পতিতাবৃত্তির নিকৃষ্টতম ভয়াবহতা নিয়ে প্রকাশিত হয়ে গেছে।** ফলে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে LON এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

পর্বে UNO মানুষের সামাজিক ও নৈতিক স্বাস্থ্য ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। তৎপরতা দেখা দেয় কিভাবে সমাজ থেকে এই জঘন্য ও ঘৃণ্য প্রথাটি তুলে দেওয়া যেতে পারে তার জন্য বিভিন্ন ধরণের চিন্তাভাবনা ও কার্যক্রম গ্রহণ করে। স্বাধীন ভারতে SITA (Suppression of Immoral Traffic in Women & Children Act 1916) ও তার সংশোধনী PITA (Preventaion of Immoral Traffic Act 1919) আইন পাশ হয়। আজ পর্যন্ত ওই আইন নিয়ে সারা ভারতে আলোচনা চলছে। ১৯৯৮ সালে UN-এর পতিতাবৃত্তি নিরোধক চুক্তি অনুযায়ী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে (চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী) পতিতাবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বিরত থেকেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেখানে আনুষ্ঠানিক পতিতা বৃত্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট কঠোরতা বর্তমান। সেখানে, অর্ধেক অঙ্গ রাজ্যে "Customer Amendment" বলে একটি ব্যবস্থা চালু আছে যার অর্থ হল পতিতাদের মত তাদের পৃষ্ঠপোষক বা Patron-ও সমভাবে অপরাধী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পতিতাদের সাজা দেবার ব্যবস্থা আছে, জরিমানা/কয়েদ অথবা উভয়ই পতিতাদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

১৯৬০-এর দশক থেকে নারীবাদী বা Feminist আন্দোলন শুরু হয়। নারী সম্পর্কে তাদের নানাবিধ ধ্যানধারণার মধ্যে পতিতাবৃত্তি সম্বন্ধে ভাবনাটিও এক স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার। পুরুষের পক্ষ থেকে নারীশোষণের ঘৃণ্যতম প্রকাশ হল পতিতাবৃত্তি, এটি একদল নারীবাদীর মত। অন্য দলের মতে, পুরুষ ও নারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে পতিতাবৃত্তিই শ্রেয়, "ফেল কড়ি, মাখো তেল"-এর ভিত্তিতে। বিবাহিত জীবনে নারীকে বিনা পারিশ্রমিকে সর্বদাই শ্রম দান করতে হয়। ব্যক্তিগত ঔপনিবেশিকতার এটি একটি চরম দৃষ্টান্ত। সুতরাং, একদল পতিতা বৃত্তি বহাল রাখার ক্ষেত্রে মত দিয়েছে।...

স্বপক্ষে বিপক্ষে হাজারো যুক্তি তর্ক বর্তমান থাকা সত্ত্বেও পতিতাবৃত্তিকে শ্লাঘনীয় মনে করার কোন ন্যায়সঙ্গত যুক্তি থাকতে পারে না। তবে বর্তমান সমাজে নরনারীর ক্ষেত্রে শোষক-শোষিতের ধারণার প্রেক্ষিতে দু-চারটি আইন করে পতিতাবৃত্তি দূর করা যাবে না। সমাজের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোয় সমতা ও শোষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হলে, ভবিষ্যতে পতিতাবিহীন সমাজের কথা চিন্তা করা অসম্ভব হবে না। দাম্পত্য জীবনের বাইরে কেউ যদি কারুর সম্পর্কে আকর্ষণ বোধ করে দেহসম্পর্ক স্থাপন করে তাহলে সেটা ঘৃণ্য, নিন্দনীয় হবে না। এজন্য যে সেখানে কেন *Cash nexus* থাকবে না। যা কিনা "অর্থে ও সামগ্রী"-তে কোন ভোগ্যকে দেওয়া হয়ে থাকে। আপাতত, পতিতাবিহীন সমাজ কল্পনা করা দুরূহ! তবে এ উদ্দেশ্যে অবিরত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সংগ্রাম করতে হবে নারীকে শুধুমাত্র পণ্য হিসেবে গণ্য করা চলবে না।

বর্তমানে পতিতারা "যৌনকর্মী" হিসেবে চিহ্নিত হতে চলেছেন। ফলে, রাষ্ট্রের প্রেক্ষিতে অন্যান্য শ্রমিক স্বার্থসংরক্ষণের মত পতিতারাও তাদের স্বার্থসংরক্ষণে সরকারকে এগিয়ে আসার দাবী জানাচ্ছে। পতিতাদের সাবেকি অবস্থা, যা কিনা শ্রদ্ধেয়া জ্যোতির্ময়ী

দেবী তাঁর "মর্ত্যের অপ্সরী" বইটিতে লিপিব্ধ করেছিলেন, তাদের কাছে আর গ্রহণযোগ্য নয়। সামাজিক নিরাপত্তার দাবী তাদের মধ্যে এখন খুব সোচ্চার। পশ্চিমবঙ্গে কিছু কিছু পতিতা ইতোমধ্যেই বার্ধক্যভাতা পেয়ে গেছে। মানবিক অধিকারের ধারণা তাদের মধ্যেও আরো গভীর প্রসারী হবে, এটাই বর্তমান লেখকের বিশ্বাস। ¬

The Police Journal 54 : pp—239-249

[বাঁকা এবং গুরু হরফ সংকলকের

শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত

মানদা দেবী

প্রথম প্রকাশ : ১৯২৯

আমার কৈফিয়ত

পুস্তকের নাম দেখিয়া অনেকেই হয়তো মনে করিবেন যে এইপ্রকার জীবনী লিখিবার উদ্দেশ্য কি? মহৎ জীবনীর উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও তাহা সমাজের পূর্ণ চিত্র নহে। আমার জীবন মোটেই মহৎ নহে, অধিকন্তু ঠিক তাহার বিপরীত ; কিন্তু পুস্তকের উদ্দেশ্য মহৎ। আমি পাপী, কলঙ্কিনী, যশের প্রার্থী নহি—সুতরাং আমার জীবনের খাঁটি কথাগুলি আমি যেমন অকপটে বলিতে পারিব, কোনো মহৎই তাঁহার জীবনের ঘটনা তেমন অকপটে বলেন নাই। বলিতে পারেন না। পাপের স্বরূপ চিনিয়া রাখা প্রয়োজন। পাপ জিনিসটা যে কি কৈশোরে তাহা বুঝিতে পারি নাই বলিয়াই আজ আমি—আমি কেন--আমার মতো সহস্র সহস্র নারী পতিতা।

বারবনিতা-জীবনে যে দুঃখ কষ্ট এবং অনুতাপ ভোগ করিয়াছি তাহারই স্মৃতি লইয়া এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। যাঁহারা আমাদের জীবনকে সুখময় মনে করেন, আমাদের সংস্পর্শে আসিতে আগ্রহান্বিত, তাঁহারা বুঝিবেন এ পৃথিবীতে যদি নরক থাকে তবে তাহা আমাদের জীবন।

আমি সমাজের ঘৃণিতা, অস্পৃশ্যা—সমাজে আমার স্থান নাই, স্থান থাকাও উচিত নহে, কিন্তু যে সকল সাধুবেশী লম্পট আমাদের সংস্পর্শে থাকিয়াও সমাজের উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছেন, আমার জীবনীতেও তাঁহাদেরও কতিপয় চিত্র দেখিয়া সমাজটাকে চিনিয়া রাখিতে পারিবেন। এই ভণ্ডের দল কি প্রকারে অবোধ বালিকার সর্বনাশ করে, তাহার চিত্র দেখিয়া স্তম্ভিত হইবেন।

আমার এই আত্মজীবনীতে ৺ শিবনাথ শাস্ত্রী, ৺ স্যার সুরেন্দ্রনাথ, ৺ দেশবন্ধু দাশ, ৺ ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, ৺ অশ্বিনীকুমার দত্ত, পূজনীয়া শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী, সন্তোষকুমারী গুপ্তা, ঊর্মিলা দেবী, সুনীতি দেবী, মোহিনী দেবী, হেমপ্রভা মজুমদার, বগলা সোম, লেডি অবলা বসু, কামিনী রায়, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি, মিসেস বি. এল. চৌধুরি, রমলা গুপ্তা, লীলাবতী দাশ, শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, কৃষ্ণকুমার মিত্র, মহেশচন্দ্র আতর্থী, কাজি নজরুল ইসলাম ও তৎপত্নী, মতিলাল নেহরু ও তৎকন্যা এবং সৈয়দ হুসেন, কুমার গোপিকারমণ রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, আক্রাম খাঁ, আবদুল রহিম, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বীরেন শাসমল, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্ত সরকার, প্রতাপ গুহরায়, ৺ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, ৺ অমৃতলাল বসু, ৺ দীনবন্ধু মিত্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, স্বামী সত্যানন্দ,

স্বামী সচ্চিদানন্দ, তারেকশ্বরের মোহান্ত প্রভৃতি মহোদয় ও মহোদয়ার নাম প্রয়োজনবশত উল্লিখিত হইয়াছে। আমার মতো নূতন লেখিকার অক্ষমতার দোষে যদি তাঁহাদের সুনামের কোনো হানি হইয়া থাকে এজন্য তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট এবং মৃত ব্যক্তিদের আত্মার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

এই জীবনীতে আমার ফোটো দিতে ইচ্ছা করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু আমার ভূতপূর্ব শিক্ষক মুকুলচন্দ্র ব্যানার্জি উকিল মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে তাহা দেওয়া হইল না।

—বিনীতা
মানদা দেবী

আমার এই জীবনী আমার নিজের লেখা কি অন্য পুরুষের লেখা, তাহা লইয়া একদল লোক মাথা ঘামাইতেছেন শুনিতেছি। নারী সম্বন্ধে পুরুষের নানাপ্রকার হীন ধারণার জন্যই নারী আজ বিশ্বে সমানাধিকার দাবি না করিয়া পারিতেছেন না। যদি তাঁহারা কেবল ইহাই ভাবিয়া থাকেন যে, পতিতার কি বই লিখিবার ক্ষমতা আছে—ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে পতিতগণ যদি বই লিখিতে পারে বা পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারেন, তবে পতিতাগণ পারিবে না কেন? বিশেষত পতিতাগণের লিখিত পুস্তকের যথেষ্ট আদর আছে শুনিতে পাওয়া যায়।

প্রতিভার পরিমাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি দ্বারা হয় না। পূজনীয়া শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী-নিরূপমা দেবীর কোনো ডিগ্রি নাই, ইঁহারা হিন্দু ঘরের সেকেলে মেয়ে, রিয়েলিস্টিক আর্টেরও কোনো ধার ধারেন না, কিন্তু ইঁহাদের লেখনী হইতে যেমন লেখা বাহির হইয়াছে এ পর্যন্ত কোনো উপাধিধারিণী তেমন সর্বাঙ্গসুন্দর পুস্তক যে লিখিতে পারেন নাই তাহা সর্ববাদিসম্মত।

'ভোটে পতিতার স্থান' নামক একটি অধ্যায় এই পুস্তকের জন্য লিখিত হইয়াছিল কিন্তু তাহা কোনো বিশিষ্ট রাজনৈতিকের মতামত গ্রহণ না করিতে পারায় এবারেও মুদ্রিত হইল না।

আমার জীবনীতে যাঁহাদের প্রতি সামান্য ইঙ্গিত আছে তাঁহাদের নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কাহার প্রাণে ব্যথা দিবার জন্য এ পুস্তক লিখিত হয় নাই। বর্তমান সমাজের খাঁটি চিত্র দেখাইয়া সমাজপতিগণের মনোযোগ আকর্ষণই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে, সমাজে সাড়া পড়িয়াছে।

নারী পতিতা হইলে তাহার নাকি কোনো মূল্যই থাকে না। তাহাকে অপমান করিলেও আইন অনুসারে 'মানহানি'র দাবি চলে না, কিন্তু 'পতিত' পুরুষের বেলায় এই আইনই কার্যকরী—কারণ আইনপ্রণেতা পুরুষ। আমার উকিল বলেন, আইনের এই ক্রুটির জন্যই সুরুচি পতিতা নহে—এই মিথ্যা কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছে কংগ্রেস কাউন্সিলে যাঁহারা নারীপুরুষের সমানাধিকার দাবি করেন। তাঁহারা কি আইনসভায় ইহার প্রতিকারপ্রার্থী হইতে পারেন না? প্রকাশ্যে পতিতাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইলে নিন্দার কোনো নতুন কারণ উপস্থিত হইবে না। কারণ কংগ্রেস ও কাউন্সিলের এই

সকল মার্কামারা সদস্যদিগকে দেশের লোক ভালো করিয়াই জানে। যদি আগামী কংগ্রেস ও কাউন্সিলে আমাদের এই দাবি কেহ উপস্থিত না করেন তবে মনে করিব যাঁহারা সমানাধিকারের জন্য চিৎকার করেন তাঁহারা নিছক মিথ্যাবাদী। হয় আমাদের দাবি পূরণ কর—না হয় 'পতিতদিগকেও' কংগ্রেস কাউন্সিল অথবা অন্য কোনো কার্য হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য আইন কর।

বিনীতা
শ্রীমতী মানদা দেবী

প্রথম

বাল্যে

১৩০৭ সালের ১৮ই আষাঢ় [১৯০০] তারিখে আমি জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতা কলিকাতার এক সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্রাহ্মণ। আমি তাঁহার প্রথম সন্তান। পিতার নাম ও পরিচয় প্রকাশ করিতে আমি অক্ষম। তিনি তাঁহার জ্ঞাতিকুটুম্ব, সন্তানসন্ততি এবং সম্পর্কিত ব্যক্তিগণ অনেকেই এক্ষণে জীবিত রহিয়াছেন। সমাজে তাঁহাদের মানমর্যাদা কম নহে। আমার এই আত্মচরিত হয়ত তাঁহাদের হাতে পড়িতে পারে। আমি তাঁহাদিগকে বিব্রত করিতে চাহি না।

আমার পিতামহ একজন সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। কলিকাতাতে তাঁহার চারিখানা বাড়ি এবং নগরের উপকণ্ঠে একখানা বাগানবাড়ি ছিল। তিনি বৃদ্ধ বয়সে রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। আমার পিতা হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার পসার বেশ জমিয়া উঠে, বাহিরেও তিনি মাঝে মাঝে যাইতেন।

আইন কলেজে পড়িবার সময় আমার পিতার বিবাহ হইয়াছিল। তখন আমার পিতামহ জীবিত। আমার মাতুল পরিবারও কলিকাতায় বাস করিতেন। তাঁহারা বিশেষ অর্থশালী ছিলেন না, কিন্তু বংশমর্যাদায় উচ্চ এবং রূপে অতুলনীয় সুন্দরী বলিয়া আমার মাতাকে পুত্রবধূ করিবার জন্য পিতামহ বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। আমার জন্মের দুই বৎসর পর আমার পিতামহের মৃত্যু হয়। ঠাকুরদাদার কোলের সুখলাভ যে আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল—কেবলমাত্র কল্পনাতেই সেই স্মৃতি জাগিয়া আছে।

কন্যা বলিয়া আমি শিশুকালে অনাদৃত হই নাই। পিতার বন্ধুগণ কেহ কেহ বলিলেন, 'প্রথম কন্যাসন্তান, সৌভাগ্যের লক্ষণ'। কথাটা হাস্যপরিহাসের সহিত বলা হইলেও, তাহার মধ্যে সত্য রহিয়াছে বোধ হইল। আমার জন্মের কয়েক মাস পূর্বে পিতা আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। দিন দিন তাঁহার উন্নতি দেখা গেল। কিছুকালমধ্যেই আমার পিতা কোনো সুযোগে বার্ষিক দশ হাজার টাকা আয়ের একটা ছোট জমিদারি নিলামে ক্রয় করিলেন।

শৈশব অবস্থায় আমার শরীর রুগ্ন ছিল। মা আমাকে লইয়া সর্বদাই বিব্রত থাকিতেন। পিতামহ আমার স্বাস্থ্যের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি নাকি আমার দিকে চাহিতে চাহিতে চক্ষু মুদিয়াছিলেন। আজ মনে হয় সেই ঋষিতুল্য বৃদ্ধ বুঝি তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস আমার প্রাণের মধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন, তাই আমি মরিতে মরিতেও বার বার বাঁচিয়া উঠিতেছি।

আমার যখন তিন বৎসর বয়স, তখন একবার কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলাম।

কলিকাতার বড় বড় ডাক্তার-কবিরাজ আমার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি লুপ্ত হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় দ্বারকানাথ সেন[১] আমার চিকিৎসায় বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন।

মা নিত্য শিবপূজা করিতেন। একদিন দুশ্চিন্তার উদ্বেগে নিতান্ত কাতরচিত্তে তিনি পূজার ঘরে অচেতন হইয়া পড়েন। জ্ঞান সঞ্চার হইলে মা বলিলেন 'খুকুমণি সেরে উঠবে, আর কোনো ভয় নাই।' তিনি অন্তরে অন্তরে তাঁহার অভীষ্ট দেবের নিকট হইতে কোনো আশ্বাস পাইয়াছিলেন কি না কে জানে, তারপর হইতে বাস্তবিক আমার দেহ এক প্রকার ঔষধাদি ব্যতীতই নীরোগ হইতে লাগিল। চারি মাসের মধ্যে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইলাম।

একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। মেঘমুক্ত চন্দ্রের মত আমার দেহকান্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমার পরিপুষ্ট অবয়ব, উজ্জ্বল মুখশ্রী, দীর্ঘ নিবিড় কুন্তলশোভা, আনন্দোৎফুল্ল চলনভঙ্গি দেখিয়া আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীগণ সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইল। আমি পূর্বে ধীর ও শান্তপ্রকৃতি ছিলাম ; কিন্তু এই রোগভোগের পর আমি কিছু চঞ্চল স্বভাব হইয়া উঠিলাম। বিস্কুট লজেঞ্জুস কিনিবার জন্য মায়ের নিকট হইতে পয়সা লইয়া বড় রাস্তার উপরে মনোহারী দোকানে ছুটিয়া যাইতাম, ঘুড়ি ধরিবার জন্য আমাদের বাড়ির প্রশস্ত ছাদে দৌড়াদৌড়ি করিতাম—অবশ্য পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা ছিল না। ঝির সঙ্গে কখনও কখনও তাহাদের বাড়িতে চলিয়া যাইতাম। চাকরেরা আমার দুষ্টামিতে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিত। বাবার বৈঠকখানা ঘরে যাইয়া আমি গোলযোগ আরম্ভ করিতাম। বাড়িতে আর ছোট ছেলেমেয়ে কেহই ছিল না। একমাত্র আমার চিৎকার ও হাস্যকলরবে এত বড় বাড়িখানা সর্বদা মুখরিত থাকিত। বাবার নিকট আমার ছেলেবেলার এই সকল কথা শুনিয়া আমি সঙ্কুচিত হইতাম।

স্নান করা আমার অতি আনন্দের বিষয় ছিল। মায়ের অনুরোধে বাবা আমার জন্য বাড়ির উঠানে একটা বৃহৎ চৌবাচ্চা তৈয়ারি করাইয়াছিলেন। তার মধ্যস্থলে সুন্দব ফোয়ারার জল উঠিত। ছয়-সাত বৎসর বয়সে আমি সাঁতার শিখিয়াছিলাম। স্নান করিবার সময় আমার সমবয়সি প্রতিবেশী ছেলেমেয়েদের ডাকিয়া আনিতাম। আমরা সকলে চেঁচামেচি হুটোপাটি করিয়া সেই বৃহৎ চৌবাচ্চার জলে হাঁসের মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেলায় মত্ত থাকিতাম। মা আমাকে অত্যন্ত আদর করিতেন, সেই জন্য বাবা আর কিছু বলিতেন না।

আমার আর একটা অভ্যাস ছিল—প্রত্যহ বৈকালে বেড়াইতে বাহির হওয়া চাই। যে দিন বাবা বাহিরে যাইতেন না, সে দিন আমি মায়ের সঙ্গে মোটরে চড়িয়া যাইতাম। আমার এক মামাতো ভাই আমাদের বাড়িতে থাকিয়া স্কুলে পড়িত। তাঁহার নাম ছিল নন্দলাল, তাঁহাকে আমি নন্দদাদা বলিয়া ডাকিতাম। তাঁহার সঙ্গে কখনও কখনও হাঁটিয়া বেড়াইতে যাইতাম। রাস্তার দুইধারে সুন্দর সুন্দর সাজানো দোকানপাট, ট্রামগাড়ি, আলোকমালা, অসংখ্য লোকচলাচল, সেসব দেখিয়া আমার মনে কি আনন্দ হইত। আলিপুরের

চিড়িয়াখানা, চৌরঙ্গীর যাদুঘর, হাওড়ার পুল, পরেশনাথের বাগান, কালীঘাটের মন্দির এসকল আমি বালিকাবয়সেই অনেকবার দেখিয়াছি।

পুতুলখেলা অপেক্ষা পাখি পুষিবার শখই আমার ছিল বেশি। পায়রা, ময়না, টিয়াপাখি, কাকাতুয়া, হিরেমন, শালিক প্রভৃতি নানাপ্রকার সুন্দর পাখি বাবা আমাকে আনিয়া দিতেন। কুকুর বিড়াল আমি ভালবাসিতাম না। ফুলগাছেও আমার মন আকৃষ্ট হইত না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পাখির নেশা আমার কমিয়া আসিয়াছিল।

দ্বিতীয়বার এক মৃত সন্তান প্রসবের সময় আমার মায়ের মৃত্যু হয়। আমার বয়স তখন দশ বৎসর [১৯১০]। প্রাণে দারুণ আঘাত পাইলাম। মৃত্যু কী, তাহা তখন আমি বুঝিতাম। আমাকে কেহ মিথ্যা বাক্যে ভুলাইতে পারিল না—কেহ আমাকে সান্ত্বনার কথা বলিতে পারিল না। আমি চিৎকার করিয়া মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিলাম। বাবা আমাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। কিন্তু আমি ছিন্নশির ছাগশিশুর মত ছট্‌ফট্ করিতে করিতে বাবার কোল হইতে নামিলাম। প্রতিবেশীগণ মায়ের মৃতদেহ পালঙ্কের উপর পুষ্পমালায় সাজাইয়া কাঁধে করিয়া লইয়া গেল। আমি তাহাদের পশ্চাতে ছুটিয়া চলিলাম। আমার মনে আছে, কতকদূর যাইয়া ফুটপাতের উপর আছড়াইয়া পড়িয়াছিলাম। মুখ তুলিয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখি, বাহকেরা দূরে চলিয়া গিয়াছে। পালঙ্কের পশ্চাদ্দিকে মায়ের আল্‌তা মাখানো পা-দুখানি বাহির হইয়া রহিয়াছে ; তাহাই আমার দৃষ্টিপথে।

আজ আমার দুঃখময় জীবনের কাহিনি লিখিতে বসিয়া চক্ষুর জল ঝরিতেছে। কতদিন কত দুঃখে অশ্রু বিসর্জন করিয়াছি—আমার মনে হইয়াছে, তাহা মায়ের সেই চরণযুগলে নিপতিত হইয়া তাঁর শুষ্ক অলক্তকরাগকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

মায়ের মৃত্যুতে বাবা খুব কাঁদিয়াছিলেন। তিন দিন পর্যন্ত কিছু আহার করেন নাই। অবশেষে বন্ধুদের সনির্বন্ধ অনুরোধে খাদ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাবার শয়নগৃহের প্রাচীরে মায়ের একখানি বৃহৎ সিপিয়া রং-এর ব্রোমাইড এনলার্জমেণ্ট ছবি ছিল। আমার সপ্তম জন্মতিথিতে বাবা আমাকে উহা উপহার দিয়াছিলেন। সাড়ে-সাতশত টাকা ব্যয়ে তিনি ওই ছবিখানি বিলাত হইতে তৈয়ারি করাইয়া আনেন। মায়ের মৃত্যুর পর হইতে বাবা নিত্য একছড়া ফুলের মালা দিয়া ছবিখানিকে সাজাইতেন।

মায়ের জীবদ্দশাতেই আমি বেথুন স্কুলে ভর্তি হইয়াছিলাম। তাঁহার মৃত্যুকালে আমি ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। বাড়িতে একজন গৃহশিক্ষক আমাকে ও নন্দদাদাকে পড়াইতেন। মায়ের মৃত্যুর পর বাবা আমাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া আনিলেন। বাড়িতে অধিক সময় পড়াইবার জন্য একজন ভাল শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। আমাকে সর্বদা কাছে কাছে রাখিয়া শোকাবেগ কতকটা প্রশমিত করিবার জন্যই বোধ হয় বাবা এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যাহা হউক ইহাতে আমার পড়াশুনার কোনো ক্ষতি হইল না।

ছয় মাস চলিয়া গেল। তখন বাংলাদেশে স্বদেশি আন্দোলনের অব্যবহিত পরেই বোমার গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে। নেতাদের নির্বাসন, যুবকদের কারাদণ্ড, বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার, বোমাওয়ালাদের ফাঁসি, এই সকল ভীষণ ব্যাপারে দেশময় একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। নানা স্থানে সভাসমিতি, লাঠিখেলার আখড়া প্রভৃতি স্থাপিত হইল। আমার পিতা এই আন্দোলনের মধ্যে ছিলেন। নন্দদাদা আমাকে মাঝে মাঝে স্বদেশি সভায় লইয়া যাইতেন। সেখানে কত উত্তেজনাময় বক্তৃতা শুনিতাম।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আমি বেশ গান গাহিতে পারিতাম। স্বাভাবিক শক্তিতেই আমার সুর তাল জ্ঞান ছিল, কণ্ঠস্বরও নাকি আমার সুমিষ্ট—যাঁহারা আমার গান শুনিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমার এই প্রশংসা করিতেন। সংগীতের ক্ষমতা আমার কিরূপে জন্মিল, আমি বুঝিতে পারি না। আমার পিতামাতা কেহই সংগীতজ্ঞ ছিলেন না। বাবা আমাকে একটি খুব ভাল টেবিল-হারমোনিয়াম কিনিয়া দিয়াছিলেন। একজন শিক্ষক আমাকে এস্রাজ বাজানো ও গান শিখাইতেন।

একদিন দেখিলাম নন্দদাদা দুইখানি লম্বা ছোরা কিনিয়া আনিয়াছে। আমার সম্মুখে টেবিলের উপর ছোরা দুইখানি রখিয়া বলিল 'মানি, তোকে ছোরা খেলা শিখতে হবে।' আমি একখানি ছোরা হাতে লইয়া বলিলাম, 'সে কি নন্দদা?' নন্দদা আর একখানি ছোরার বাঁট ধরিয়া তাহার অগ্রভাগ আমার বুকের দিকে লক্ষ্য করিল! অপর হস্তে আমার ডান হাতের কবজি ধরিয়া এমন ভঙ্গিমায় দাঁড়াইল, যেন সে সত্যই আমাকে মারিতে উদ্যত। আমিও বাঁ হাতে নন্দদা-র ডানহাতের কবজি ধরিয়া ফেলিলাম। সে বলিল, 'এই ত ঠিক, এমনি করেই ত আটকাতে হয়।' আমি কিছুদিন পূর্বে এক স্বদেশি সভায় ছেলেদের ছোরাখেলা দেখিয়াছিলাম, আমি বলিলাম, মেয়েদের এসব শিখে কি হবে?' নন্দলাল বলিল, "কেন রে মানি, শুনিস নি সেই গান—'আপনার মান রাখিতে জননী আপনি কৃপাণ ধর গো'।"

আমি বলিলাম, 'হাঁ, মনে আছে।' এই বলিয়া আমি তখন টেবিল-হারমোনিয়ামের সম্মুখে যাইয়া বসিলাম। তাহার ঢাকনা খুলিয়া চাবি টিপিয়া গলা ছাড়িয়া গান ধরিলাম—

আপনার মান রাখিতে জননী, আপনি কৃপাণ ধর গো—
পরিহরি চারু কনক ভূষণ গৈরিক বসন পর গো
আমরা তোর কোটি কুসন্তান,
ভুলিয়া গিয়াছি আত্মবলিদান,
করে মা পিশাচে তোর অপমান প্রতিকার তার কর গো।

গান শেষ হইলে বাবা আসিয়া বলিলেন, 'কি রে খুকু, তোদের কি হচ্ছে?' নন্দদা মুহূর্তের মধ্যে ছোরা দুখানি লইয়া আর এক দরজা দিয়া ছুটিয়া পলাইল। আজও আমার সে দিনের ঘটনা বেশ মনে আছে।

সে দিন বাবা আমাকে এক স্বদেশি সভায় লইয়া গেলেন। এই গানটি আমি সভাস্থলে গাহিলাম। সকলে আমার খুব প্রশংসা করিল। ৺ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সভায় সভাপতি ছিলেন। আমি তখন বুঝিতে পারি নাই, উহাতেই আমার সর্বনাশ হইতেছে। ওই সভাতে বাবা এক বক্তৃতা দিলেন।

তখন দামোদরেব বন্যায় বর্ধমান সহর ও তাহার বহুদূরব্যাপী স্থানসমূহের গৃহস্থগণ আশ্রয়হীন এবং দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। তাহাদের দুরবস্থা মোচনের জন্য সাহায্য-ভাণ্ডার খোলা হয়। দেশের সহৃদয় জনসাধারণ তাহাতে অর্থদান কবেন। অধিক পরিমাণে অর্থ সংগ্রহের জন্য কলিকাতার থিযেটার-সিনেমার বেনিফিট্ নাইট্ অর্থাৎ সাহায্য রজনী ও অপর নানাবিধ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থাও হইয়াছিল।

এই উপলক্ষে বাবা আমাকে কয়েকবার থিয়েটার ও বায়স্কোপ দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন। নন্দদাদাও সঙ্গে যায়। থিয়েটারের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সংগীত ও অভিনয় দেখিয়া আমি অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আমার মনে আছে, আমি প্রথম নাটক অভিনয় দেখি, 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'আলিবাবা'। 'দেবী চৌধুবাণী'র 'বীণা—বাজে না কেন' এবং 'আলিবাবা'র 'ছি ছি এত্তা জঞ্জাল' এই দুইটি গান আমি এমন সুন্দর অনুকরণ করিয়াছিলাম যে আমার পিতা অনেকবার বাড়িতে আমার মুখে উহা শুনিয়াছিলেন। রবিবার বায়স্কোপ যাওয়া আমার ক্রমশ অভ্যাস হইয়া উঠিল। কখনও নন্দদাদা, কখনও বা বাবা নিজে আমার সঙ্গে যাইতেন। কোনো কোনো রবিবারে আমি বাবার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দিরে যাইতাম। আমার পিতা ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ছিলেন না, কিন্তু সামাজিক রীতিনীতিতে তিনি ব্রাহ্মদের মত উদার ভাবাপন্ন ছিলেন।

মাতার মৃত্যু পর হইতে বাবা প্রতিদিন মায়ের ছবিতে একটি ফুলের মালা দিতেন।

এখন আর মায়ের ছবিতে ফুলের মালা দেওয়া হয় না। বহুদিন যাবৎ একছড়া বেলফুলের মালা উহাতে শুকাইয়া ছিল, একদিন চাকর দেওয়াল ঝাড় দিতে উহা ফেলিয়া দিয়াছে। আমাদের কাহারও মনেই তাহাতে কোনো চঞ্চলতা বা বিরক্তি আসে নাই। সকাল ছয়টা হইতে নয়টা, অপরাহ্ণ একটা হইতে চারিটা মাস্টার মহাশয় পড়াইতেন। শনিবার কখনও কখনও থিয়েটার, রবিবারে বায়স্কোপ যাওয়া আমার নিয়মিত কার্যমধ্যে ছিল।

নন্দদাদার চেষ্টায় ছোরাখেলা শিখিয়াছিলাম। আমার ডান হাতে একটা বড় কাটার দাগ এখনও তার সাক্ষী। বাবার আদেশে ছোরাখেলা পরিত্যাগ করি। তার পরিবর্তে গল্পের পুস্তক পড়ায় আমার মন আকৃষ্ট হইল। আমার গৃহশিক্ষক মহাশয় ইহাতে আমাকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন।

'দেবী চৌধুরাণী' নাটক অভিনয় দেখিবার পর আমি বোধ হয় 'ভ্রমর' ও 'কপালকুণ্ডলা' দেখিয়াছিলাম। মাস্টার মহাশয় একদিন আমাকে বলিলেন, বঙ্কিমবাবুর লেখা আসল বই না পড়লে, রস ও সৌন্দর্য উপলব্ধি হয় না। আমাদের বাড়িতে তিনটি আলমারি বোঝাই অনেক পুস্তক ছিল। মাস্টার মহাশয় অনুসন্ধান করিয়া তাহার মধ্য হইতে বঙ্কিমবাবুর

গ্রন্থাবলী বাহির করিয়া দিলেন। আমি দিবারাত্রি সেই উপন্যাস পাঠ করিতে লাগিলাম। সকল স্থানে বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু তথাপি প্রাণে কেমন একটা অপূর্ব পুলকের সঞ্চার হইত। আমাকে দেখাশুনা করিবার নিমিত্ত আমার বিধবা পিসিমা আসিয়াছিলেন। তিনি আমার পিতার জ্যেষ্ঠ ভগিনী। আমার যাহাতে কোনো কিছুর অসুবিধা না ঘটে, সে বিষয়ে তিনি সর্বদা দৃষ্টি রাখিতেন। একদিন আমি শুনিলাম, পিসিমা বাবাকে বলিতেছেন, 'হাঁ রে খোকা এই ত একবৎসর প্রায় হয়ে গেল। আর ত দেরি করা ভাল নয়। তোর শাস্ত্রজ্ঞান আছে—বংশ রক্ষা, পিতৃকুলের জলপিণ্ড, এসব তুই কি জানিস না।' আমি তখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারি নাই।

কিছুদিন পরে বাবা আমাকে পুনরায় বেথুন স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলেন। আমি পঞ্চম শ্রেণিতে পড়িতে লাগিলাম। আমি স্কুলের গাড়িতেই যাতায়াত করিতাম। কারণ—বাবা বলিলেন, তাঁহাকে এখন প্রায়ই মোটরে যাইতে হয়, সুতরাং আমাকে ঠিক সময়ে স্কুলে পৌঁছাইতে ও স্কুল হইতে লইয়া আসিতে নিজেদের মোটর সকল সময় পাওয়া যাইবে না। গৃহশিক্ষক মহাশয় সকালে ও সন্ধ্যায় দুবেলা আমাকে পড়াইতেন।

যতদিন মা বাঁচিয়া ছিলেন, আমি মায়ের সঙ্গে এক বিছানায় ঘুমাইয়াছি। মায়ের মৃত্যুর পর আমি বাবার ঘরে পৃথক বিছানায় শুইতাম। একদিন বাবা আমাকে বলিলেন 'খুকু, তুমি তোমার পিসিমার কাছে ঘুমিও।' আমি কখনও পিতার অবাধ্য হই নাই। আর একদিন বাবা চাকরকে ডাকিয়া দেওয়ালে মায়ের ছবিখানা দেখাইয়া বলিলেন, 'এই বড় ছবিখানা খুকুর পড়বার ঘরে টাঙিয়ে দিস ত।' আমার জন্য দুইটি নূতন বড় বুক্‌কেস্, একখানা বড় মেহগিনি কাঠের সুন্দর টেবিল ক্রয় করা হইয়াছিল। তাহা আমার পড়িবার ঘরে সাজানো হইল। মেজেতে পাতিবার জন্য সুন্দর কার্পেট আসিল। একটা কাটগ্লাসের খুব দামি দোয়াতদানি ও একটি ওয়াটারম্যানের ফাউন্টেন পেন বাবা আমাকে দিলেন। গ্রীষ্মকাল পড়িয়াছিল ; আমার পড়িবার ঘরে বিজলি পাখায় নূতন রং করা হইল। আরও চারিখানা বিলাতি ল্যাণ্ডস্কেপ-ছবির সঙ্গে মায়ের ছবিখানাও সেই ঘরে শোভা পাইল। মাস্টার মহাশয় আমার পড়িবার ঘরের সাজসজ্জা দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। আমি স্কুলের পড়ায়, নভেল, থিয়েটারে ও সিনেমার আমোদে নিমগ্ন।

এমন সময় এক বসন্ত প্রভাতে আমাদের গৃহদ্বারে নহবতে সুমধুর রৌসানচৌকি বাজিয়া উঠিল। প্রতিবেশী বন্ধুগণ ও আত্মীয়স্বজন অনন্দকোলাহলে মত্ত। পিসিমা কার্যে অতিশয় ব্যস্ত। পিতাকে নববর-বেশে সজ্জিত দেখিলাম। পুষ্পপত্র শোভিত চতুর্দোলা আসিয়াছে। শুভ সন্ধ্যায় শোভাযাত্রার আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিল। আমিও উৎসবে মাতিলাম। আমার পড়িবার ঘরের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় হঠাৎ মায়ের ছবিখানির দিকে আমার দৃষ্টি পড়িল। আমি মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম ; আমার চক্ষে জল আসিল। তারপর ধীরে ধীরে যাইয়া বিছানায় শুইলাম। কেহ আমাকে লক্ষ্য করিল না। পরদিন যখন ঘুম ভাঙিল—দেখিলাম বিমাতা আসিয়াছেন।

দ্বিতীয়

কৈশোরে

ক্রশম উৎসবের কোলাহল থামিল। দিন দিন আমিও প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। পিসিমার থাকিবার আর প্রয়োজন রহিল না। নবববধূকে সংসারধর্ম বুঝাইয়া দিয়া তিনি ছয়-সাত মাস পরে চলিয়া গেলেন। আমি তখন হইতে পিসিমার ঘরে একাকিনী শয়ন করিতাম।

বিমাতা বয়সে আমার অপেক্ষা এক বৎসরের বড় ছিলেন। আমার দেহের গঠন পরিপুষ্ট এবং বলিষ্ঠ হওয়ায় আমাকেই বড় দেখাইত। তিনি সুন্দরী ছিলেন, গৃহকার্য ও লেখাপড়া সামান্যরূপ জানিতেন। তাঁহার সহিত আমার বনিবনাও না হইবার কোনো কারণ ছিল না, কারণ আমি অধিকাংশ সময় আমার পড়াশুনা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতাম।

বাবা অন্তঃপুরে আসিলে, বিমাতা প্রায়ই কোনো কার্য-ছলে তাঁহার কাছে থাকিতেন। বিশেষ কোনো প্রযোজন ব্যতীত পিতার সহিত এখন আমার সাক্ষাৎ হইত না। পূর্বে তিনি আমাকে স্কুলের পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, কাছে বসিয়া আমার গান শুনিতেন, এখন আর তাহা নাই। বাবা যেদিন বিমাতাকে লইয়া থিয়েটারে যাইতেন, আমাকে নিতেন না, সেদিন নন্দদাদার সঙ্গে আমি বায়স্কোপে যাইতাম।

কি কারণে জানি না, আমার পুরাতন গৃহশিক্ষক ছড়াইয়া দেওয়া হইল। বাবা আমাকে বলিলেন, 'তুমি এখন উপরের ক্লাসে পড়ছ, পুরানো মাস্টারের বিদ্যা ত বেশি নয় ; আজকালকার স্কুল কলেজের শিক্ষাপ্রণালীর সাহিত পরিচিত লোক না হলে চলে না'। কয়েকদিন পরে আমার জন্য নূতন মাস্টার আসিলেন। ইঁহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

প্রথম যেদিন তিনি পড়াইতে আসিলেন, সেদিনই তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি ও পরিচ্ছদে আমি একটু আকৃষ্ট হইলাম। তাঁহার লম্বা চুল, কপাল হইতে উলটা দিকে আঁচড়ানো ও ঘাড়ের কাছে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাবরি পাকানো—তাঁহার বয়স আন্দাজ বাইশ-তেইশ—দাড়িগোঁপ উঠে নাই, না পরিষ্কার কামানো, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কাপড় ঢিলা মালকোঁচা দিয়া পরিয়াছেন, মনে হয় যেন কাবুলিদের পা-জামা। গায়ে একটা পরিষ্কার ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি জামা—তখনও খদ্দরের চলন হয় নাই। তাঁহার সূক্ষ্মাগ্র উন্নত নাসিকা, চোখ দুটি সুন্দর, কিন্তু একজোড়া সোনার ফ্রেমে বাঁধানো চশমা সেই সৌন্দর্যকে অন্য রূপ দিয়াছে। পায়ে নকল জরির কাজ করা নাগরা জুতা। তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, দেহ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। তাঁহার কথায় যেন বাঁশি বাজে। তিনি সম্প্রতি বি. এ. পাশ করিয়া কোনো স্কুলে শিক্ষকের কার্য করিতেছেন। মাস্টার মহাশয় অবিবাহিত।

তাঁহার নিকট আমার পড়াশুনা ভালই হইতে লাগিল। তিনি গণিতশাস্ত্র বিশেষ জানিতেন না—তবে সাহিত্য, ইতিহাস, বিশেষত কাব্য তিনি অতি চমৎকার পড়াইতেন। সকালে বিকালে দুইবেলাই তিনি আসিতেন। আমি চতুর্থ শ্রেণি হইতে প্রমোশন পাইয়া তৃতীয় শ্রেণিতে উঠিলাম।

নন্দদাদা আমার দুই ক্লাশ উপরে পড়িত। এবার তার এন্ট্রাস ক্লাসে উঠিবার কথা। কিন্তু লেখাপড়ায় বিশেষ মনোযোগ না থাকায় সে বার্ষিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইল। সুতরাং দ্বিতীয় শ্রেণিতেই রহিয়া গেল। নন্দদাদা ও আমি একই মাস্টার মহাশয়েরর নিকট পড়িতাম।

দুই-চারি দিনের পরিচয়ের পর একদিন মাস্টার মহাশয় আমাকে বলিলেন, 'মানু, তুমি আমাকে 'মাস্টার মশাই' বলো না—এ ভাবটা আমি ভারি অপছন্দ করি। আমাকে আমার নাম ধরে ডাকতে পার।' আমি কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিলাম—আপনি যেমন 'মশাই' কথাটা পছন্দ করেন না, আমিও তেমনি নামের শেষে 'বাবু' যোগ করা ভালবাসি না। দেখেন নি, আজকাল 'বাবু' উঠে গিয়ে 'শ্রীযুতে'র প্রচলন হয়েছে?'

মাস্টার মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, 'তা বেশ, তুমি আমাকে 'মুকুল দাদা' বলে ডাকতে পার। তুমি ত জান আমার নাম মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়।' এইরূপে মাস্টার মহাশয়ের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মিতে লাগিল। আমি সেইদিন হইতে তাঁহাকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করি।

একদিন বাবা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'খুকু, তোমার মাস্টার মহাশয়ের সকালে বিকালে চা খাওয়ার অভ্যাস আছে। ওঁর চায়ের ব্যবস্থা এখানেই করে দিও। তা হ'লে তিনি আরও একটু আগে আসতে পারেন।'

আমাদের বাড়িতে দু'বেলাই চা তৈরি হইত। পূর্বে বাবার সঙ্গে বসিয়া চা খাওয়া আমার নিয়ম ছিল। আজকাল বাবার চায়ের পেয়ালা বিমাতা হাতে করিয়া নিতেন। বাবাও আমাকে কখনও ডাকেন নাই, আমিও আর সেদিকে যাইতাম না। আমি মাস্টার মহাশয় আসিবার পূর্বেই আমার পড়িবার ঘরে একলা বসিয়া চা খাওয়া শেষ করিতাম।

এখন মাস্টার মহাশয় আমার চা পানের সঙ্গী হইলেন ; সেই সময় আমাদের মধ্যে সামাজিক ও রাজনীতির নানা কথাবার্তা হইত। তখন দেশনেতাদের মহলে 'আত্মশক্তি' র কথা উঠিয়াছে। মাস্টার মহাশয় বলিলেন, 'মানু, আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা সুখদুঃখের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন 'সর্বং আত্মবশং সুখং সর্বং পরবশং দুঃখং'। অন্নবস্ত্র ত দূরের কথা, সামান্য বিষয়ের জন্যও আমাদিগের পরের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই দেখ না কেন, চাকর চা তৈয়ারি করিয়া না দিলে আমাদের চা খাওয়া হয় না ; অথচ ইহা দুই মিনিটের কাজ। আমাদের সমাজে ও পরিবারে বিলাসিতা এত বেড়ে উঠেছে।'

বাবাকে বলিয়া আমি একটি ছোট ইলেক্‌ট্রিক্ হিটার কিনিলাম। আমার পড়িবার ঘরে বিজলি বাতির প্লাগ্ ছিল। তাহার সাহয্যে আমি সহজে জল গরম করিবার ব্যবস্থা করিলাম। পরদিন মাস্টার মহাশয় আসিলে যখন স্বহস্তে চা তৈয়ারি করিয়া তাঁহার সম্মুখে পেয়ালা ও প্লেট ধরিলাম, তখন তিনি আনন্দে হাত বাড়াইয়া বলিলেন, 'বাঃ, উপযুক্ত ক্ষেত্রে পড়লে উপদেশের বীজ এমনি ফলপ্রদ বৃক্ষে পরিণত হয়।' আমি তখন লক্ষ করি নাই, আমার ওই সোনাব চুড়ি পরা হাতখানিব ছায়া পেয়ালার মধ্যস্থিত তপ্ত তরল পদার্থে পড়িবার পূর্বে মাস্টার মহাশয়ের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছিল।

পূজাব সময হাইকোর্টের দীর্ঘ অবকাশ। বাবা বিমাতাকে লইয়া পশ্চিমে বেড়াইতে গেলেন। তাহাদের সঙ্গে দুইজন ভৃত্য ব্যতীত আর কেহ ছিল না। আমার যাইবার খুব ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া বাবাকে কিছু বলিতে পারি নাই। কারণ আমাকে সঙ্গে নেওয়া যে তাহার অভিপ্রায নয়, তাহা আমি পূর্বেই বুঝিযাছিলাম। আমার হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলাম। বিদেশে যাইয়া পিতা অথবা বিমাতা কেহই আমার নিকট চিঠিপত্র লেখেন নাই। পিসিমা বাড়িতে ছিলেন। তিনি মধ্যে দুই-একখানি চিঠি পাইতেন, আর টাকা পাঠাইবাব জন্য সবকাব মহাশয়েব নিকট চিঠি আসিত।

একদিন নন্দদাদা আমাকে বলিল, 'মানি, আজ মিনার্ভা থিয়েটারে যাবি?—চল, শিরীফরহাদ প্লে—খুব সুন্দব অপেরা। একেবাবে অফুবন্ত নাচগান। সে একখানি বিজ্ঞাপন দেখাইল। পিসিমার কাছে অনুমতি চাহিলে তিনি বলিলেন, 'তোরা দুজনেই ছেলেমানুয, মাস্টার মশাইকে সঙ্গে নিযে গেলে ভাল হয়।' বলা বাহুল্য মাস্টার মহাশয় আপত্তি করিলেন না।

আমরা তিনজনে একটা বক্স রিজার্ভ কবিয়া বসিয়াছিলাম। অভিনয় দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। বিশেষত নৃত্যগীত আমাকে অতিশয় প্রীত করিয়াছিল। মাস্টার মহাশয় প্রতি দৃশ্যের ঘটনাবলি ও চরিত্রসমূহ বিশ্লেষণ করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। ফরহাদের অপূর্ব প্রেম ও শিরীর আত্মবিসর্জন আমাব হৃদয়কে উল্লসিত করিয়া তুলিল। আমি অনুভব করিলাম, আমার বুকের মধ্যে যেন কোন্ সুষুপ্ত পশুর ঘুম ভাঙিতেছে।

মাস্টার মহাশয় প্রায়ই আমার সঙ্গে থিয়েটারে ও সিনেমায় যাইতেন। তিনি না গেলে আমার আমোদ উপভোগ সম্পূর্ণ হইত না। কারণ তিনি সমস্ত বিষয়টি পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিতেন। যেদিন 'বিল্বমঙ্গল', 'শঙ্করাচার্য' কিংবা ধর্মমূলক অভিনয় হইত, সেদিন পিসিমাও আমাদের সঙ্গে যাইতেন। ভক্তি ও ধর্মভাবের নাটকগুলি তাঁহার বড় প্রিয় ছিল।

আমার পিতা তখনও বিদেশে। আমি জ্বরে শয্যাগত। পিসিমা চিন্তাকুল। মাস্টার মহাশয় দিবারাত্রি আমার শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া আমার সেবা-শুশ্রূষা করিতেছেন। ডাক্তার ডাকা, ঔষধ আনা, পথ্য তৈয়ারি, আমার কাছে বসা, প্রায় সমস্ত কাজ মাস্টার মহাশয় করিতেন। তাঁহার স্কুল কামাই হইতে লাগিল। বেদনায় অস্থির হইলে তিনি আমার গা

টিপিয়া দিতেন, মাথায় হাত বুলাইয়া আমাকে ঘুম পাড়াইতেন ; আঙুর, বেদানা, নাসপাতি একটু একটু করিয়া আমার মুখে পুরিয়া দিতেন। পিসিমা ইহাতে একটু আশ্বস্ত হইতেন।

যন্ত্রণায় কাতর হইয়া আমি যখন মা মা করিয়া কাঁদিতাম তখন আমি লক্ষ করিয়াছি মাস্টার মহাশয় আমার সমবেদনায় চক্ষুর জল ফেলিয়াছেন। তিনি জানিতেন আমি মাতৃহীনা—পিতার অনাদৃতা কন্যা। একমাস পরে একটু সুস্থ হইয়া আমি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলাম, 'মুকুলদা, আপনি আমাকে এবার বাঁচিয়েছেন।' মাস্টার মহাশয় বলিলেন, 'মানু, ভগবান তোমায় রক্ষা করেছেন।' আমি তাঁহার হাতখানি ধরিয়া আবেগে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলাম—'মুকুলদা আপনার স্নেহের ঋণ আমি শোধ করতে পারব না।'

সেই হইতে অন্যের অসাক্ষাতে মাস্টার মহাশয়কে 'তুমি' সম্বোধন আরম্ভ। আমাদের হৃদয় যেন পরস্পর অধিকতর নিকটবর্তী হইল। একদিন তিনি একখানি সুন্দর বাঁধানো ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক আমার হাতে দিয়া বলিলেন, 'মানু, আমার 'ঝরণা' ছাপা হয়েছে। তোমার সেবা করবার যে সুযোগ পেয়েছি, তাকে চিরস্মরণীয় করবার জন্য আমার এই প্রথম গীতিকাব্য তোমারই নামে উৎসর্গ করেছি।' আমি ঈষৎ লজ্জিতভাবে পুস্তকখানি লইয়া বলিলাম, 'মুকুলদা তুমি তোমার কবিতা ছাপাতে দিয়েছ, এ কথা তা আমাকে কখনো বলনি।' মাস্টার মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, 'ওইটি অপরাধ হয়েছে?'

আমাকে ইংরাজি সাহিত্য পড়াইবার সময় মাস্টার মহাশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাসমূহ বাংলা পদ্যে অনুবাদ করিয়া দিতেন। তিনি যে কবি ও ভাবুক তাহার পরিচয় পূর্বে পাইয়াছিলাম। 'ঝরণা'র অনেক কবিতা আমার সম্মুখেই লেখা হইয়াছিল। আজ পুস্তক আকারে গ্রথিত হওয়াতে উহার মধ্যে যেন নূতন ভাব দেখিতে পাইলাম।

দিল্লি, আগরা, মথুরা, বৃন্দাবন, লাহোর, প্রয়াগ, কাশী, গয়া প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া বাবা পাঁচ মাস পরে কলিকাতায় ফিরিলেন। হাইকোর্ট খুলিবার পরেও দুইমাস তাঁহার কামাই হইল। ওকালতি ব্যাবসা করিবার আর তেমন ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। এখন তিনি নিজের বিষয়কর্ম দেখিতে অধিক মন দিলেন।

আমার এক দূর-সম্পর্কীয় জ্ঞাতি ভ্রাতা চাকুরির চেষ্টায় এক দিন আমাদের বাড়িতে পিতার নিকট আসেন। তাঁহাকে আমি পূর্বে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তিনি কিন্তু আমার সঙ্গে নিতান্ত পরিচিতের মত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি রে মানু, কেমন আছিস? কোন্ ক্লাসে পড়িস? কে তোকে বাড়িতে পড়াচ্ছে?' আমি বলিলাম, 'এখন বেথুনে সেকেন্ড ক্লাসে পড়ছি। মুকুলবাবু আমার প্রাইভেট্ টিউটর।'

তিনি আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, 'ও—আমাদের 'ঝরণা'র কবি মুকুল বাঁড়ুয্যে?—সে যে আমার ক্লাসফ্রেণ্ড, একসঙ্গে স্কটিস্ চার্চ কলেজে পড়েছি।' সন্ধ্যাবেলায় মাস্টার মহাশয় আসিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'কি ভাই মুকুল, শুনলুম তুমি মানুকে পড়াচ্ছ। বেশ। তারপর—কাব্যচর্চা ছাড়া আর কি কাজকর্ম হচ্ছে?'

মাস্টার মহাশয় তাঁহার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা কহিলেন। আমাকে বলিলেন,

'রমেশবাবু যে তোমাদের আত্মীয় এ কথা ত মানু তুমি আমায় বল নি।' আমি বলিলাম, আমি ত জানতাম না। বাবা সেদিন এঁর পরিচয় দিলেন। 'রমেশদাদা বলিলেন, 'আমি প্রায় দশ বৎসর পূর্বে একবার এ-বাড়িতে এসেছিলাম। তখন মানদার বয়স ৩/৪ বৎসর হবে। তখন আমি সবে মাত্র এণ্ট্রান্স দিয়েছি ; স্বদেশি আন্দোলন হল, পড়াশুনা ছেড়ে কয়েক বৎসর খুব হৈচৈ করা গেল। তারপর কলেজে ভর্তি হলুম। গত বৎসর এম. এ. পাশ করে এতদিন বসে আছি।'

আমার পিতার চেষ্টায় রমেশদাদার একটা ভাল চাকুরি হইল—কোনো লিমিটেড কোম্পানির অফিসের বড়বাবু, বেতন মাসিক দুইশত টাকা। তিনি প্রথম প্রায় একমাস আমাদের বাড়িতেই রহিলেন। পরে কোনো বোর্ডিং-এ একটা ভাল কামরা ভাড়া করিয়া থাকিলেন। বাবার নিকট বলিলেন, 'হাতে কিছু টাকা জমাইয়া বাড়ি ভাড়া করি—তখন মা, স্ত্রী ও ছোট ভাইবোনেদের এখানে লইয়া আসিব।' সেই বৎসরই রমেশদাদার বিবাহ হইয়াছিল।

পিসিমা চলিয়া গিয়াছেন। আমার মায়ের মৃত্যুর পর হইতে বামুন ঠাকুরই রান্না করিত। দুইটি ঝি ও তিনটি চাকর আমাদের বাড়িতে ছিল। নিত্যপ্রয়োজনীয় কোনো জিনিসের অভাব আমার হয় নাই। সুস্বাদু খাদ্য-পানীয়, বিচিত্র বসন-ভূষণ, প্রচুর পরিমাণে আসিয়াছে। আমার পড়িবার ঘর ও শয়নগৃহের সজ্জা অতুলনীয়, আরামের ব্যবস্থা একেবারে নিখুঁত। তথাপি আমার প্রাণের ক্ষুধা মিটিত না। পিতার অনাদর, অবজ্ঞা এই ক্ষুধাকে নিত্য সতেজ রাখিত। রাস্তা দিয়া যাইবার সময় যখন দেখিতাম কুলি-মজুরেরা তাহাদের ছেলেমেয়েকে কোলে লইয়া আদর করিতেছে, তখন আমি আমার সকল ঐশ্বর্যকে মনে মনে ধিক্কার দিতাম। আমি বুঝিয়াছিলাম, দৈহিক অভাব মোচনই আদর নহে—অন্নবস্ত্র প্রদানই আদর নহে—আদর প্রাণের জিনিস, প্রাণকেই উহা স্পর্শ করে, ভাবেই উহার প্রকাশ।

আমার ত্রয়োদশ জন্মতিথির পূর্ব দিন বাবা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'খুকু, তোমার মাস্টার মহাশয় ও রমেশদাদাকে নিমন্ত্রণ করো।' জন্মদিনের উৎসব করিতে আমার আর ভাল লাগিল না। তথাপি কোনো প্রকারে দিনটা চলিয়া গেল। বিমাতা আমাকে একছড়া সোনার হাড় উপহার দিলেন। রমেশদাদার নিকট হইতে একটা রূপার সুদৃশ্য পাউডারকৌটা উপহার আসিল। মাস্টার মহাশয় বোধ হয় দিয়াছিলেন একখানি রবীন্দ্রনাথের কাব্য।

আমি ছোটগল্প ও কবিতা লিখিতে শিখিয়াছিলাম। রমেশদাদা তাহা পড়িয়া খুব প্রশংসা করিলেন। তিনি বলিলেন, 'মুকুলকে দিয়ে মাসিক কাগজে এগুলো ছাপিয়ে দাও। এ ত বেশ সুন্দর হয়েছে। আজকাল মেয়েদের কি রাবিস্ লেখা বের হয়।'

আজকাল রমেশদাদাও আমাদের সঙ্গে থিয়েটার যাইতেন। নন্দদাদা এখন ফুটবল ও ক্রিকেট খেলায় মাতিয়াছিল, সে আর বড় একটা যাইত না। বিশেষত সে বেচারা নাটকের সাহিত্যের দিকটা কিছুই বুঝিত না এবং অভিনয়ের মধ্যে যে আর্ট আছে, তাহাও তার উপলব্ধি হইত না। স্টেজের উপরে যুদ্ধবিগ্রহ, নাচগান, সাজপোশাক এসব জমকালো রকমের হইলেই সে খুশি হইত।

তখন থিয়েটারে একটা পরিবর্তন আসিতেছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভদ্র যুবকেরা থিয়েটারে যোগ দিয়া তাহার মধ্যে শিল্পকলার বিকাশ করিতে অগ্রসর হইলেন। রমেশদা ও মুকুলদা এই অভিনব আর্টিস্টদের মর্যাদা বুঝিতেন এবং তাহাদের খুব প্রশংসা করিতেন। রমেশদার নিকট অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নাম ও পরিচয় আমি জানিলাম। এমন কি তাহাদের ভিতরের জীবনকাহিনিও তিনি আমাকে কিছু কিছু শুনাইলেন—যাহা মুকুলদারও অজ্ঞাত ছিল।

দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিবার দুই বৎসর পরে আমার পিতার একটি পুত্রসন্তান হয়। ইতিমধ্যে তিনি ওকালতি ব্যবসায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই বৈমাত্রেয় ভাইটিকে আমি অতিশয় স্নেহ করিতাম ; কিন্তু তাহার জন্য পৃথক আয়া ও দাসী নিযুক্ত হওয়ায় আমি তাহাকে সর্বদা কোলে নিতে পারিতাম না। সন্তান প্রসবের পর বিমাতার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। বাবা তাঁহাকে লইয়া বিব্রত হইলেন। বড় বড় ডাক্তার-কবিরাজ নিত্য আসিতে লাগিল। আট নয় মাস পরে বিমাতা একটু সুস্থ হইলেন বটে, কিন্তু শরীরের দুর্বলতা দূর হইল না।

আমার পিতার কোনো কোনো বন্ধু এবং আমার পিসিমা অনেকবার বাবার নিকট আমার বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন, আমার কানে তাহা আসিয়াছে। বাবা বলিলেন, 'এত অল্প বয়সে মেয়ের বিয়ে দিব না। ম্যাট্রিক পাশ করুক, তারপর দেখা যাবে।' পিসিমা ও পিতার বন্ধুগণ ইহার উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, সে সমস্ত এখানে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আজকাল খবরের কাগজে এ বিষয়ে নানা বাদ-প্রতিবাদ ও তর্কবিতর্ক আপনারা পাঠ করিয়া থাকেন।

আমার যৌবনোদ্ভব হইয়াছিল। অভিভাবকের অসাবধানতায় ও অনুকূল পবনে যথাসময়ে আমার হৃদয়ের মধ্যে প্রবৃত্তির অনল জ্বলিয়া উঠিল, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। বিবাহের জন্য মনে মনে আমার আকাঙ্ক্ষাও হইত।

তৃতীয়

পলায়ন

বেথুনে পড়িবার সময়ে আমার তিনটি অন্তরঙ্গ বালিকা-বন্ধু লাভ ঘটিয়াছিল। তন্মধ্যে কমলার পরিচয় একটু বিশেষভাবে দিব। কারণ তাহার জীবনের সহিত আমার জীবন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত। বাল্যকালের কোনো বন্ধুর সহিত এখন আর দেখা হয় না। অনেককেই ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু কমলাকে এখনও ভুলিতে পারি নাই। সেও আমাকে হয়ত ভুলে নাই। আজ এই আত্মচরিত লিখিবার সময়ে তাহার কথা প্রতিমুহূর্তে আমার মনে হয়—অতীত জীবনের সুখদুঃখের কত কথা মনে হইতেছে।

কমলা পরমা সুন্দরী ছিল—ছিল কেন, এখনও বোধ হয় আছে। নারীর সৌন্দর্য সম্বন্ধে

পুরুষেরা বলিয়া থাকে, 'স্ত্রীলোক কুড়ি পার হইলেই বুড়ি।' একথা সকলের সম্বন্ধে খাটে না। কুড়িব পর আরও কুড়ি বৎসর চলিয়া গিয়াছে, তবু এমন নারী হিন্দুসমাজে যথেষ্ট আছে, যাহাদের সৌন্দর্য ভাদ্রেব ভরানদীর মত ঢল ঢল, শরতের জ্যোৎস্নার ন্যায় অনাবিল, তাহাতে মলিনতার লেশ মাত্র নাই। আমি নিজে নারী হইয়া নারীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছি, শুনিয়া হয়ত আপনারা হাসিবেন।

শুধু রূপে নহে, গুণেও কমলা আমার চিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাহার ভালবাসা ও সহানুভূতি আমি চিরদিন সমভাবে পাইয়াছি। আমোদ প্রমোদ, গানবাজনায়, হাস্যপরিহাসে, খেলাধূলায়, লেখাপড়ায় সকল বিষয়ে তাহার সমান অধিকার ছিল। স্কুলের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউসন (পুরস্কার বিতরণ) অথবা অন্য কোন উৎসবের আয়োজনে কমলার সাহায্য না লইলে চলিত না। সে মেয়েদের গান ও অভিনয় শিখাইত।

একবার কোনো বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ চেষ্টায় ইউনিভার্‌সিটি ইন্‌স্টিটিউটে নানাবিধ আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা হয়। আমার রমেশদা তাহাতে একজন প্রধান উদ্যোগী ছি,লেন। সেই উপলক্ষে বোধ হয় বেথুন, ডায়োসিসান প্রভৃতি বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা মিলিয়া নবীন সেনের 'কুরুক্ষেত্র' কাব্য হইতে নির্বাচিত দৃশ্যের অভিনয় করে। তাহাতে আমি 'শৈলজা'র অংশ লইয়াছিলাম, কমলা নিজে 'জরুৎতকারু' সাজিয়াছিল। আমাদের অভিনয় দেখিয়া দর্শকগণ চমৎকৃত হইয়াছিলেন। শৈলজার দুটি গান আমার মাস্টার মহাশয় রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। কমলা তাহাতে সুর যোজনা করিয়া আমাকে শিখাইয়াছিল। অর্জুনের প্রেম লাভে নিরাশ শৈলজার অন্তরের ব্যথা সেই গানে ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল। সেই গান এখনও মাঝে মাঝে গাহিয়া আমি শান্তি পাই।

কমলা বৈদ্যবংশের মেয়ে। কলিকাতায় বাগবাজারে একখানা সাধারণ দোতলা বাড়িতে তাহার মাতার সহিত বাস করিত। কমলার পিতা কার্যোপলক্ষে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। মাঝে মাঝে দুই এক-মাস বা দশ-পনেরদিন কলিকাতায় আসিয়া থাকিতেন। কমলার একটি ছোট ভাই স্কুলে পড়িত। সে কমলার অপেক্ষা ছয় বৎসরের ছোট ছিল।

বাড়িখানা কমলাদের নিজের। সুতরাং তাহার পিতা মাসিক যে দুইশত টাকা পাঠাইতেন, তাহাতে তাহাদের জীবিকানির্বাহ স্বচ্ছন্দে হইয়া যাইত।

আমি কমলাদের বাড়ি অনেকবার গিয়াছি। তাহার মাতা অতি শান্তস্বভাব ও স্নেহশীলা। তিনি আমাকে আদরের সহিত কত সুমিষ্ট খাদ্য আহার করাইতেন। আমি মাতৃস্নেহে বঞ্চিত ছিলাম বলিয়া সহজেই কমলার মায়ের বিশেষ অনুগত হইয়া পড়িলাম। তিনি সর্বদাই আমাকে বলিতেন, 'তুমি আমার কমলার ছোট বোন।' কমলা বয়সে আমার দুই বৎসরের বড় ছিল।

কাশীতে কমলার পিতার এক বন্ধু বাস করিতেন। তাঁহার চেষ্টায় এক যুবকের সহিত কমলার বিবাহ হয়। উহা দুই বৎসর পূর্বের কথা। কমলা তখন আমাদের সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। যুবকটি কাশীতেই চাকুরি করিত, তাহার পিতামাতাও সেখানে থাকিতেন।

গ্রীষ্মের পূজার ছুটিতে কমলা কাশীতে স্বামীর কাছে যাইত। কমলা ও তাহার স্বামীর মধ্যে যে সকল চিঠিপত্র চলিয়াছে, তাহা সমস্তই আমি দেখিয়াছি। আমরা দুইজনে গোপনে বসিয়া তাহাদের কত অর্থ বিশ্লেষণ করিতাম।

আমাদের সহপাঠী বন্ধুদের মধ্যে এই সব চিঠি লইয়া কত হাস্য পরিহাস চলিত। আমার আরও দুই-তিনটি বিবাহিত বন্ধু ছিলেন। তাঁহাদের স্বামীপ্রেমের ভিতরের রহস্যও আমি জানিতাম। প্রথম প্রণয়সম্ভাষণ, বাসররজনী যাপন, মান-অভিমানের অভিনয়, পুরুষের ব্যবহার প্রভৃতি বিষয় লইয়া মেয়েমহলে নিত্য আলোচনা হইত। এই সকলের মধ্যে আমি আমার ছোটগল্পের প্লট ও কবিতার উপাদান পাইতাম। তাই মুকুলদা বলিতেন, 'মানু, তোমার গল্পে ও কবিতায় আমি রিয়্যালিস্টিক আর্টের গন্ধ পাচ্ছি।'

প্রায় আট-নয় মাস হইল, কমলার সহিত তাহার স্বামীর বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। ইহার কারণ বড় ভয়ানক। কমলার শ্বশুর কিরূপে শুনিয়াছেন, কমলার মাতা কমলার পিতার বিবাহিত পত্নী নহে—রক্ষিতা মাত্র। সুতরাং জানিয়া শুনিয়া পতিতা নারীর কন্যাকে তিনি পুত্রবধূরূপে গৃহে রাখিতে পারেন না। তিনি লিখিয়া জানাইয়াছেন কমলাকে তিনি আর গ্রহণ করিবেন না, পুত্রের পুনর্বার বিবাহ দিবেন। তিনি আরও ভয় দেখাইয়াছেন, যদি কমলা ভরণপোষণের দাবি করে, পরে আদালতে তিনি সমস্ত কলঙ্কের কথা প্রকাশ করিয়া দিবেন এবং প্রতারণার অভিযোগ করিয়া কমলার পিতার বিরুদ্ধে পালটা মোকদ্দমা আনিবেন।

এই ব্যাপার উপলক্ষ্যে কমলার স্বামী যে কয়েকখানা পত্র তাহার নিকট লিখিয়াছিলেন তাহা বড়ই করুণ। তিনি কমলাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। কমলাও তাহার স্বামীর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিল। কে যেন দারুণ খড়গাঘাতে প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিল। কমলার স্বামী লিখিয়াছেন, 'কি করব, তোমার কোনো অপরাধ নেই জানি, কিন্তু আমি পিতার অবাধ্য হতে পারি নে। আমায় ক্ষমা কর কমলা। ধর্মসাক্ষী করে তোমায় পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম, আবার ধর্মের মুখ চেয়েই তোমায় পরিত্যাগ করছি। অগ্নিপরীক্ষার পরও রামচন্দ্র কলঙ্কিত পত্নীকে নিয়ে গৃহধর্ম পালন করতে পারেন নি, সীতার মত পত্নীকে বিসর্জন করতে হয়েছিল। এখন বিদায়, 'আমার ভালবাসা তুমি চিরদিন পাবে, কিন্তু পত্নীরূপে নহে'।

এই পত্রের উত্তর আমিই কমলাকে লিখিয়া দিয়াছিলাম। পত্রের উত্তর দিবার কমলার ইচ্ছা ছিল না। তার প্রাণে বড় আঘাত লাগিয়াছিল। বাহিরের আমোদ প্রমোদে সে তাহা ভুলিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু আমি তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখিতাম। আমার অনুরোধ ও উপদেশে কমলা শেষে এইরূপ লিখিল, 'তুমি যাহা সিদ্ধান্ত করেছ, তাহা অটল থাকুক। তোমার পিতৃভক্তি যেন বিচলিত না হয়। তুমি ভারতের আদর্শ গৌরব দেখিয়ে যে দৃষ্টান্ত দিয়েছ, তাঁহার শেষ চিত্র তোমার চোখে পড়ে নি। পরশুরামের প্রায়শ্চিত্ত, ভীষ্মের শরশয্যা, রামচন্দ্রের বিলাপ তুমি ভুলে গিয়েছ। পিতৃভক্ত মাতৃঘাতী কুঠার হস্তমুক্ত করবার জন্য পরশুরামকে দীর্ঘকাল তীর্থ ভ্রমণ করতে হয়েছিল, পিতৃভক্তি

তাকে রক্ষা করতে পারে নি। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত অম্বার তপস্যা ভীষ্মের ক্ষাত্রশক্তিকে নপুংসকের হস্তে পরাভূত করেছিল, পিতৃভক্তি তাকে রক্ষা করতে পারে নি। এ জগতে প্রত্যেক কর্মের ফল পৃথক ও স্বাধীন।'

'একের দ্বারা অন্যের প্রতিরোধ হয় না। তোমায় উপদেশ দেওয়া আমার কর্তব্য নহে। প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করো। তুমি মহৎ, তাই আমায় পরিত্যাগ করেও চিরদিন ভালবাসবে বলছ, কিন্তু আমি তোমার মত মহৎ নই—আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—স্রোতে ভাসিয়া চলিলাম, জানিনা না কোথায়।'

কমলার এই পত্রেরও উত্তর আসিয়াছিল। তাহাতে তাহার স্বামী লিখিয়াছিলেন, 'কমলা আমার অপরাধ বুঝেছি। প্রায়শ্চিত্তের দিন এলে মাথা পেতে শাস্তি গ্রহণ করব। তখন যেখানেই থাকো হতভাগ্যকে একবার মনে কোরো।' বুঝিলাম কমলার স্বামীর প্রাণ আছে। সে যথার্থ দরদী, কিন্তু অবস্থার দাস। সমাজের কৃত্রিমতার আঘাতে এমন কত হৃদয় স্বভাবের পথে পরিচালিত হইতে পারে না। সমাজবিধি এমন করিয়া মানবজীবনের পরিস্ফূর্তির পথে অন্তরায় হয়।

কমলার মায়ের সম্বন্ধে যে কলঙ্কের কথা রটিয়াছিল তাহা কতদূর সত্য আমি তাহার অনুসন্ধান করি নাই। পদ্মফুলের মূল থাকে কাদায়—সূর্য তাহার খোঁজ রাখে না। সে জলের উপরে ফুলটিকে ফুটাইয়া সুখী হয়—বাতাস তাহাকে দোলায়—ভ্রমর তার মধু পান করে।

কমলা আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসিত। আমার পিতাও তাহাকে স্নেহ করিতেন। মাস্টার মহাশয়, আমি, কমলা ও রমেশদাদা মাঝে মাঝে বেড়াইতে যাইতাম। কমলাদের বাড়িতে চা-পার্টির নিমন্ত্রণ হইত। কমলার মাতা ধনীর গৃহিণী না হইলেও আমাদের আদর যত্নের ত্রুটি হইত না। তিনি স্বহস্তে সমস্ত খাবার প্রস্তুত করিতেন।

আমি যে সকলের সঙ্গে এরূপ অবাধ মেলামেশা করিতাম, ইহাতে পিতার কোন আপত্তি ছিল না। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি সামাজিক ব্যাপারে উদার মত পোষণ করিতেন। আমাদের বাড়ির পশ্চাতে খানিকটা মাঠের মত জায়গা ছিল। আমি বাবাকে বলিয়া সেখানে একটি টেনিসকোর্ট তৈয়ারি করাইলাম। নন্দদাদা এ বিষয়ে উদ্যোগী হইল। রমেশদা, মুকুলদা, কমলা, আমি নন্দলাল এবং আরও কয়েকজন বন্ধু বৈকালে এই মাঠে টেনিস খেলিতাম। মুকুলদা খেলা কিছুই জানিতেন না—তাঁহাকে অনেক ধরিয়া বাঁধিয়া শিখাইয়া লইলাম। কমলা খেলায় খুব নিপুণ ছিল। সে সর্বদাই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিত। রমেশদা ও মুকুলদা কখনও আমার পক্ষে কখনও কমলার পক্ষে খেলা করিত।

বিমাতা আমাদের সংসারে আসিবার সময় পিত্রালয় হইতে একটি দাসী আনিয়াছিলেন। তাহার নাম ছিল হরিমতি। তাহাকে ঝিয়ের কাজকর্ম কিছুই করিতে হইত না। সে ছিল অনেকটা আমার বিমাতার পার্সন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট বা প্রাইভেট্ সেক্রেটারি। তাহার বয়স প্রায় ৪৫/৪৬ হইবে। বোধ হয় সে বিধবা—থান কাপড় পরিত, হাতে নোয়া ও সিঁথিতে

সিন্দুর দিত না, তাহার গলায় একছড়া সরু বিছাহার ও হাতে চারিগাছি সোনার চুড়ি ছিল। সে একাদশীর উপবাস করিত, মাথায় গন্ধ তেল মাখিত ও চব্বিশ ঘণ্টা দোক্তা পান চিবাইত। চাকর বেচারাদেব উপর যে তার কটাক্ষপাত না হইত এমন নহে।

বাড়ির এক নিভৃত কোণে হরিমতি তার শোয়ার ঘর ঠিক করিয়াছিল। উহা সে প্রয়োজনমত সাবধানে তালাচাবি দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিত। দুপুরবেলা সে ওই ঘরে যাইয়া ঘুমাইত। তার নিজের কোনো নির্দিষ্ট কাজ না থাকায় অপর সকলের কাজের উপর ওস্তাদি করিয়া বেড়াইত—আর খামকা কথা তুলিয়া কেবলই গোলযোগ পাকাইত।

আমার এইরকম চালচলন হরিমতি দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না। সে প্রথমে বিমাতাব নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল। কিন্তু বিমাতা আমার প্রায় সমবয়সি, বিশেষত মায়ের মত গাম্ভীর্য ও শাসন করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। তিনি রুক্ষভাষিণী ও কোপনস্বভাব নহেন। সুতরাং তিনি আমায় কিছুই বলিলেন না। বিফলমনোরথ হইয়া হরিমতি বাবার কাছে গেল ; কিন্তু সেখানেও কোন সুবিধা হইল না।

অবশেষে সে নিজেই আমাকে শাসন করিতে আরম্ভ করিল। একদিন হরিমতি আমাকে বলিল, 'আচ্ছা, খুকুমণি এসব কি বলত! পাড়াময় লোক ছি ছি কচ্ছে। জ্ঞাতি ভাই আছে, মাস্টার আছে—বেশ, তাদের সঙ্গে সভ্য ভব্য হয়ে কথা কও। হাসতে হাসতে পুরুষের গায়ে ঢলে পড়া—গলাগলি হয়ে বেড়ানো! তুমি সোমত্ত মেয়ে—বিয়ে হলে এদ্দিনে ছেলের মা হতে!'

হরিমতি যাহা বলিয়ছিল তাহা মিথ্যা নয়, এজন্য আমি কোনো উত্তর দিলাম না। মাথা নিচু করিয়া রহিলাম। ঝগড়া করা আমার স্বভাব নহে। বিশেষত এক্ষেত্রে বাদ-প্রতিবাদ আমার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে না, তাহা আমি জানিতাম। ঘটনা যে পাড়াময় হইয়াছে, একথা হরিমতি আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিয়াছিল। তবে ইহাও আমি জানিতাম, যদি আমার কখনও বদনাম রটে, তবে তাহা হরিমতির দ্বারাই হইবে।

কিছুদিনের মধ্যেই আমার ধারণা সত্যে পরিণত হইল। হরিমতি যখন দেখিল মুখের কথায় শাসাইয়া আমাকে জব্দ করিতে পারিল না, তখন সে পাড়াময় আমার বদনাম রটাইতে লাগিল। কথা ক্রমশ বাবার কানে উঠিল, তিনি বিশ্বাস করিলেন না। তিনি সংবাদদাতাকে বলিলেন, 'আমাদের দেশের মেয়েরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিলে অমনি সাধারণ লোক নানা মিথ্যা কলঙ্কের কথা রটায়। কারণ এদেশে স্ত্রী-স্বাধীনতা চলিত নহে।'

আমার জেদ বাড়িয়া উঠিল। মুকুলদা আমাকে একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 'প্রেমের পথে যতই বাধাবিঘ্ন আসে, ততই উহা প্রবল হয়।' ইহার প্রমাণ আমি হৃদয়ের মধ্যে পাইতে লাগিলাম।

আমার প্রথম যৌবনের উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা প্রাণের মধ্যে জাগিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখে দেখিলাম দুইটি যুবক—মুকুল ও রমেশ। প্রকৃতির নিয়মে ইহাদের দিকে প্রবৃত্তির প্রবাহ প্রবল বেগে ছুটিল। আমাকে টানিয়া রাখিবার জন্য শাসন মাতৃস্নেহ, আদরযত্ন ছিল

না। আজ মনে হয়, আমার মা বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত এপথে আসিতাম না। আমার বাবা যদি একদিনও একটু আদর করে আমার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতেন, অথবা শাসন করিতেন, তবে বোধ হয় এ জীবনের গতি ফিরিয়া যাইত।

মুকুলদা একটু ভীরু স্বভাব। রমেশদা ছিল সাহসী ও বেপরোয়া। একদিন দুপুরবেলা বাবা বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া পড়িতেছিলেন। আমাদের স্কুল ছুটি। অফিসও বন্ধ। রমেশদা আসিয়া বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাকাবাবু, মানি কোথায়?' বাবা বলিলেন, 'উপরে আছে—কেন?' রমেশদা বলিলেন, 'আজ আমরা বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে যাব, মানি যদি যায়, তবে কাকিমাকে সুদ্ধ নিয়ে যাব।' বাবা বলিলেন, 'যাও জিজ্ঞেস করে এস।'

রমেশদা একেবারে আমার শোবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি অর্ধ-শয়ান অবস্থায় গীতগোবিন্দের একটা কবিতা পড়িতেছিলাম। তিনি পালঙ্কের উপরে আমার পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মানি, আজ বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাবে?—চল।' আমি বলিলাম, 'না রমেশদা, আজ শরীরটা ভাল নয়।' রমেশদা আমার কপালে হাত দিয়া কহিলেন 'কই, কিছুই ত নয়। দেখি হাত।' তিনি আমার বাম হাতখানি টানিয়া নাড়ি টিপিয়া বলিলেন, 'কিছু না, তোমার সব চালাকি।' তিনি আমার আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে তাঁহার আঙুলগুলি প্রবেশ করাইয়া পাঞ্জা ধরার মত আমার হাত টিপিতে লাগিলেন। আমার সমস্ত দেহে বিদ্যুৎ তরঙ্গের মত এক অপূর্ব পুলকের সঞ্চার হইতেছিল।

আমি কাত হইয়া ফিরিয়া শুইলাম। একটু মুচকি হাসিয়া বলিলাম, 'নাড়ি টিপিয়া আর কপালে হাত দিয়াই বুঝি সব ব্যারাম ধরা যায়।' রমেশদা এই পরিহাসের অর্থ বুঝিয়া বলিলেন, 'তবে আমাকে বিনা স্টেথিস্‌কোপেই পরীক্ষা করতে হয়।'...

কিছুক্ষণ পরে রমেশদা বাহির হইয়া গেলেন। হিংস্র ব্যাঘ্র যেমন রক্তের স্বাদে উন্মুক্ত হয়, আমিও তেমনি হইলাম। আমার মনে কিছুমাত্র ভয় বা অনুতাপ আসিল না। বরং আশঙ্কা ও সংকোচ কাটিয়া গেল। বুঝিলাম ইচ্ছা থাকিলে সুযোগের অভাব হয় না।

ছয়-সাত মাস চলিয়া যায়। আমি প্রবৃত্তির অনলে ইন্ধন দিতেছি। রমেশদা তখনও বোর্ডিং-এ থাকেন। নানা অছিলা দেখাইয়া পরিবার আনেন নাই। মুকুলদা কমলার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মমতে কমলাকে বিবাহ করিতে সম্মত, এইরূপ ভাবও দেখাইয়াছেন। আমি তাহাতে সন্তুষ্ট হইলাম। কমলা কিন্তু তখনও দূরে দূরে—সে তার পূর্বের স্বামীকে এত শীঘ্র ভুলিতে পারে নাই।

একদিন রমেশদা আমার নিকট প্রস্তাব করিল, আর ত এ বাড়িতে হতে পারে না। এমন স্থানে চল, যেখানে নিত্য তোমায় দেখব—প্রতি মুহূর্তে তোমায় প্রাণের কাছে রাখতে পারব। পাথরের পাহাড় চুরমার করে যখন নদীপ্রবাহ একবার বেরিয়েছে, তখন চল একবারে মুক্ত প্রান্তরে যেয়ে পড়ি। আমি কোনো উত্তর না দিয়া রমেশদার গলা জড়াইয়া তাঁর বুকে মাথা লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম।

আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা নিকটবর্তী হইয়াছিল। বাড়িতে সকালবেলা অধিকক্ষণ পড়িবার জন্য আমি বাবাকে বলিয়াছিলাম যে এখন স্কুলের গাড়ি প্রথম ট্রিপেই নয়টার সময় আমাকে নিতে আসে ; অথচ ক্লাস বসে সাড়ে-দশটায়। বহু সময় আমার বৃথা নষ্ট হয়। বাবা বলিলেন, 'বাড়ির মোটর মেরামত করতে দেওয়া হয়েছে। যতদিন না আসে ততদিন ট্যাক্সি করে যেয়ো। নন্দলাল আর তুমি একসঙ্গে যাবে। আগে তোমাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে তারপর নন্দকে দিয়ে আসবে।' পরদিন হইতে আমি ও নন্দদা ট্যাক্সিতে স্কুলে যাইতাম। আসিবার সময় নন্দলাল আগে ট্যাক্সি করিয়া আসিত। আমি তাহার জন্য স্কুলে অপেক্ষা করিতাম।

দুই-তিন দিন যাবৎ আমার মাঝে মাঝে বমি হইতেছে। মুখ দিয়া কেবল থুতু উঠে। রমেশদা শুনিয়া একটু স্তব্ধ হইলেন। পরদিন তিনি আসিয়া বলিলেন, 'মানি, আমি চার মাসের ছুটি নিয়েছি। চল পশ্চিমে যাই। আর বেশি দেরি কোরো না। কাল স্কুলে যাবার সময় নন্দকে আগে নামিয়ে দিয়ে তুমি ট্যাক্সি নিয়ে একেবারে আমার বাসায় যেও। আমি সব জিনিসপত্র গুছিয়ে ঠিক করে রাখব, যা যা কেনবার প্রয়োজন, মুকুলকে টাকা দিয়েছি।' আমার প্রাণ আনন্দে অধীর হইল।

মুকুলদা নিয়মিত সময়ে পড়াইতে আসিতেন। আমার সহিত রমেশদার প্রণয়ের কথা মুকুলদার নিকট গোপন ছিল না। এই উপলক্ষ্যে তাঁর নূতন কবিতা রচিত হইয়া গেল—'মাধুরী' নামে আর-একখানি কাব্যগ্রন্থ লেখা হইল।

পরদিন যথাসময়ে আমি ও নন্দদা ট্যাক্সি চড়িয়া স্কুলে রওয়ানা হইলাম। আমি পুস্তক অথবা খাতা কিছুই নিলাম না। নন্দদাকে বুঝাইলাম, 'এখন পরীক্ষার জন্য আমাদের পুরানো পড়া রিভাইজ্ হচ্ছে, বই নিয়ে কি হবে!' গাড়িতে উঠিয়া নন্দদা তাহার রিস্টওয়াচের দিকে চাহিয়া বলিল, 'ওঃ মানু, আমার বড্ড দেরি হয়ে গেছে।' আমি বলিলাম, 'তা হলে নন্দদা, তুমি আগে নেমে যাও, আমার একটু পরে গেলেও ক্ষতি নাই!' এমনি করিয়াই অপ্রত্যাশিত সুযোগ আসিয়া জোটে। আমি ভাবিতেছিলাম নন্দদাকে কি বলিয়া আগে নামাইবার ব্যবস্থা করি। সাধুর সৎকার্যের বুদ্ধি যিনি প্রেরণ করেন, চোরের মাথায় ফিকিরফন্দিও তিনিই যোগান।

নন্দদাকে তাহার স্কুলে নামাইয়া দিয়া আমি একেবারে সোজাসুজি রমেশদার বাসায় উপস্থিত। দেখিলাম, সেখানে মুকুলদাও রয়েছেন। রমেশদা একটা সুটকেশ লইয়া আমার সহিত অন্য এক ট্যাক্সিতে উঠিলেন। মুকুলদার নিকট এইখানেই বিদায় নিলাম। তাড়াতাড়িতে কমলাকে কিছুই জানানো হয় নাই। মুকুলদাকে বলিলাম তিনি যেন কমলাকে সকল বিষয় খুলিয়া বলেন। ট্যাক্সি হাওড়া স্টেশনের দিকে অগ্রসর হইল। পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম, মুকুলদা চক্ষুর জল মুছিতেছেন।

বাড়ি হইতে বাহির হইবার পূর্বে একবার মনে হইয়াছিল, যাইবার সময় মায়ের ছবিখানিকে প্রণাম করিয়া যাইব, কিন্তু মানসিক উদ্বেগে সেকথা ভুলিয়া গেলাম। ভালই

হইয়াছে। বলিতে হইবে, কারণ মায়ের ছবির প্রতি দৃষ্টি পড়িলে বোধ হয় এতবড় জঘন্য দুঃসাহসের কার্য করিতে পরিতাম না।

আমরা একটা লোকাল ট্রেনে বর্ধমান যাইয়া কিছুক্ষণ থামিলাম। তারপর সন্ধ্যায় লাহোর এক্সপ্রেসে একেবারে দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

চতুর্থ

ভুল ভাঙিল

আমি ঘর ছাড়িলাম কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুব স্পষ্টভাবেই দিব। প্রবৃত্তির উত্তেজনায় মোহাচ্ছন্ন ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া আমি গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছি। শরীরধর্মের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে যে বয়সে আমাদের যৌবনচাঞ্চল্য দেখা দেয়, তখন বিবাহ সংস্কারের দ্বারা তাহাকে সংযত করিবার ব্যবস্থা সমাজে আছে। বালকবালিকাদিগকে সুশিক্ষায় নিরত এবং সর্বদা সৎসঙ্গে রাখিলে এই যৌবনচাঞ্চল্য অল্পবয়সে আসিতে পারে না। কিন্তু আমাদের সমাজে বর্তমান সময়ে সুশিক্ষা ও সৎসঙ্গরই অভাব। তাহার ফলে তরুণ হৃদয়ে অকালে যৌবনসম্মেলনের উদ্দাম কামনা জাগ্রত হইয়া উঠে।

আমি সুশিক্ষা ও সৎসঙ্গ কিছুই পাই নাই। স্কুলে শিক্ষার ফলে কাব্য কবিতা-গল্প-উপন্যাস প্রভৃতি তরল সাহিত্যই পড়িতে শিখিয়াছি। তাহাতে আমার হৃদয়ে কল্পনার উত্তেজনায় দুষ্প্রবৃত্তিই সকলের আগে মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। সদ্‌গ্রন্থ কখনও পড়ি নাই—যাহাতে সংযম শিক্ষা হয়, যাহাতে ধর্মভাবের উদয় হয় এমন কোনো পুস্তক কেহ আমার হাতে দেয় নাই। আমোদপ্রমোদ যাহা ভোগ করিয়াছি, তাহা সমস্তই অতি নিম্নস্তরের। থিয়েটারে নাচগান, সিনেমার চিত্র কখনও হৃদয়ে সদ্ভাব জাগ্রত করে নাই। অল্পবয়স্কদের তাহা হইতে শিক্ষালাভের চেষ্টা বিপদ্‌জনক। দুই একটা দাঁত উঠিলেই যদি শিশুকে মাছ খাইতে দেওয়া যায়, তবে সে যেমন গলায় কাঁটা বিঁধিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, থিয়েটার দেখায় ও নভেল পাঠেও দেশের তরুণতরুণীদের সেই মরণদশা ঘটিতেছে। আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে এই কথা বলিতেছি। আমার মত যাহারা আছে তাহারাও ইহার সমর্থনে সাক্ষ্য দিবে।

বেথুন স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়িয়াই আমার মনে হইয়াছিল আমি খুব জানি। তরুণ সাহিত্যিকদের গল্প-উপন্যাস যথেষ্ট পড়িয়াছিলাম ; বিশেষত মুকুলদার অনুগ্রহে শেলি, বায়রন, শেক্সপীয়র, বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির পুস্তকও কিছু কিছু অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। সুতরাং অহংকার যে আমাকে ফুলাইয়া তুলিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি।

যাহারা কেবল কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করে, সংসারের কঠোর সত্য সম্বন্ধে তাহাদের কোনো জ্ঞান জন্মে না। কবি ও সাহিত্যিকেরা এই রকম ধরনের লোক। তাঁহারা শুধু চিন্তা

লইয়াই খেলা করেন, কর্মের ধারেও ঘেঁসেন না। মুকুলদার শিক্ষায় আমার এই দশা হইয়াছিল। কাব্য-কবিতা ও নাটক-নভেলের মধ্য দিয়া সংসারকে কল্পনার চক্ষে যেমন দেখিয়াছি, প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে আসিয়া দেখিলাম সে সমস্তই মিথ্যা।

আমি যখন গৃহত্যাগ কবি তখন আমার বয়স পনের বৎসর। এই বয়সে যদি আমি আমাকে নিঃসহায় ও বুদ্ধিহীনা মনে করিতাম, যদি ভাবিতাম যে আমি সংসারের কিছুই জানি না—যদি আমার পদে পদে ভয় হইত, তবে আমি কখনই এমনভাবে বাহির হইতাম না। কিন্তু একটা মিথ্যা গর্ব আমাকে দুঃসাহস ও দূরদৃষ্টিহীন করিয়া তুলিল। আজ মনে হয়, আমি যদি উপযুক্ত অভিভাবকের অধীন থাকিতাম, তবে আমার ভাল হইত। স্বাধীনতার মধ্যেও যে পরাধীনতার প্রয়োজন আছে, তাহা এখন বুঝিয়াছি।

ভাবিয়াছিলাম, ঘরের বাহির হইলেই বুঝি সকল বাধা দূর হইয়া যাইবে, প্রবৃত্তির ভোগ একেবারে পূর্ণমাত্রায় চালাইতে পারিব। কিন্তু দিল্লিতে পৌছিয়া দেখিলাম, ব্যাপার বড় গুরুতর। পুলিশের ভয়—আমাদিগকে লুকাইয়া থাকিতে হইবে। বিদেশে, লোকজন, সমস্তই অচেনা। আমরা বাঙালি, কোথায় যাই কোথায় থাকি কী খাই! রমেশদা বাহিবে গেলে কিরূপে একাকী ঘরে থাকিব! নানারকম সমস্যা—বহু প্রকারের অসুবিধা। বাড়িতে যে ইহা অপেক্ষা ছিল ভাল। সেখানে ত আরও স্বাধীন ছিলাম—এমন কি রমেশদার সহিত গুপ্ত প্রণয়ের সুযোগও ছিল বেশি।

অবশ্য টাকার জোরে সকল অসুবিধাই অতিক্রম করা যায়। কিন্তু রমেশদার কি এত টাকা আছে। আমি ত প্রায় একবস্ত্রে বাহির হইয়া আসিয়াছি। রমেশদা আড়াই হাজার টাকা সঙ্গে আনিয়াছেন। বসিয়া বসিয়া খাইলে ইহাতে কতদিন চলিবে? পশ্চিম ভারতের যে কোনো শহরেই থাকি, খুব উঁচু স্টাইলে ভাল হোটেলে থাকিতে হইবে। আমার কাপড়চোপড় ও কিছু গহনাপত্র চাই। একটা ছোকরা চাকরের দরকার। আমরা শাকভাত, ডালরুটি খাইয়া সন্ন্যাসীর মত গাছতলায় থাকিতে নিশ্চয়ই আসি নাই। আমাদের জীবন ভোগের পূজা, তাহার উপকরণ কাঞ্চন।

দিল্লিতে এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল ; মুকুলদার পত্রে জানিলাম বাবা আমার জন্য খুব অনুসন্ধান করিতেছেন ; কিন্তু পুলিশে এজেহার দেন নাই। রমেশদার উপর ঘোরতর সন্দেহ হইয়াছে। তাঁহার অফিসে ও বাড়িতে খবর লওয়া হইতেছে। কমলা অতিশয় দুঃখিত। দিল্লি হইতে লাহোরে গেলাম।

রমেশদা পুরা এক বৎসরও চাকুরি করেন নাই। এরই মধ্যে তিনি কিরূপে চারিমাসের ছুটি পাইলেন, একথা কখনও আমার মনে হয় নাই।

কতদিন কাজ করিলে কতদিন ছুটি মিলে—কোন্ অফিসের কী রকম দস্তুর, ইহার খোঁজখবর কাব্য-উপন্যাসে পাওয়া যায় না। আমি ভাবিয়াছিলাম অফিসের কেরানিরা চাহিলেই ছুটি পায়।

আমরা রেলপথে সেকেণ্ড ক্লাসে ভ্রমণ করি। বর্ধমানে গাড়িতে উঠিয়া রমেশদা সুটকেস

খুলিলেন। আমার সম্মুখে পাঁচ তাড়া নোট রাখিয়া বলিলেন, 'মানু, এই আমাদের সম্বল।' আমি গুনিয়া দেখিলাম প্রত্যেক তাড়ায় ১০০ খানি পাঁচ টাকার নোট। এই আড়াই হাজার টাকা রমেশদা কোথায় পাইলেন তখন ভাবি নাই। মাসিক ২০০ টাকা করে এক বৎসরের বেতনও আড়াই হাজার হয় না। রমেশদা বোধ হয় বড়লোকের ছেলে—বাপের টাকা উড়াইতেছেন। তাও ত নয়। আমার পিতার কাছে রমেশদা চাকুরিপ্রার্থী হইয়াছিলেন। অর্থাভাবে মাসাবধি তিনি আমাদের গৃহে অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এত কথা তখন আমার মনে হয় নাই। কারণ ভোগলালসা যার সৃষ্টি, সেই শয়তান সমস্ত ভুলাইয়া রাখে। সুখের স্বপ্নে বিভোর গন্ধর্ব দম্পতি অথবা কিন্নরমিথুনের মত আকাশের মধ্য দিয়া চলিয়াছি—মাটিতে আর পা পড়িতেছে না।

লাহোর হইতে আমরা অমৃতসরে যাই। সেখানে তিনদিন থাকিয়া কাশ্মীরে যাত্রা করি। শ্রীনগরে আমরা প্রায় একমাস থাকি। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতিশয় মনোরম তাহা সকলেই জানেন। আমাদের নূতন প্রেমের বন্যা এখানে খুব উছলিয়া উঠিল।

বোম্বাই আসিলাম। আমার ভয় ক্রমশ কাটিয়া গেল। প্রথমে যে সকল বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল, এখন তাহা দূর হইল। পুলিশের ভয় নাই। রমেশদা খুব চতুর ও হুঁশিয়ার লোক। যদিও মুকুলদার চিঠিতে জানিয়াছিলাম বাবা পুলিশে এজেহার দেন নাই, তথাপি তিনি যেখানেই যাইতেন, সেখানেই প্রথম থানার পুলিশ কর্মচারীদের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতেন। গ্রেপ্তারি পরওয়ানার কোনো গন্ধ পাইলে সময় থাকিতে সরিয়া পড়িবেন। এই তাঁহার মতলব ছিল।

স্কুলে নীচের ক্লাসে পড়িতেই আমি ইংরাজিতে বেশ কথা কহিতে পারিতাম। মুকুলদার শিক্ষায় ও রমেশদার সঙ্গে থাকিয়া এই বিষয়ে আমার আরও উন্নতি হইয়াছিল।

হোটেলে আমরা সাহেবি স্টাইলে থাকিতাম। আমি পার্শি মেয়েদের ধরনে কাপড় পরিতাম। সকলের সঙ্গে মেলামেশা করিতে আমার ইংরাজি কথা বিশেষ সহায় হইয়াছিল। বিদেশের খাওয়াদাওয়া, চালচলন আমি অল্প সময়ের মধ্যেই শিখিয়া লইলাম। প্রথম প্রথম আমি এসব লইয়া অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলাম। রমেশদা আমাকে বলেন, 'হাঁ, রে মানু, তোরা বাংলা দেশের মেয়ে যদি পাঞ্জাবে এসে মনে করিস, ও রে বাবা—এ কোথায় এলাম, বোম্বাই-এর লোক যদি বাংলায় যেয়ে খাওয়া দাওয়া চলাফেরা নিয়ে মুস্কিলে পড়ে, মাদ্রাজিরা যদি অযোধ্যাকে ভাবে বিদেশ তবে বল্ দেখি সমগ্র ভারতে জাতীয়তা গড়ে উঠবে কি করে?'

আমি বললাম, 'ভারতবর্ষ এক বৃহৎ দেশ, এর মধ্যে ভাষার, ধর্মের, সামাজিক রীতিনীতির এত বৈচিত্র্য ও বৈষম্য যে এখানে একজাতি গড়ে ওঠা অসম্ভব মনে হয়।' রমেশদা জোরের সহিত বলেন, 'এই অসম্ভবকেই সম্ভব করতে হবে।' রমেশদার এই একটা গুণ দেখিয়াছি, তিনি যেখানেই গিয়াছেন, তাহাকে নিতান্ত পরিচিত স্বদেশ বলিয়া মনে করিতেন—শুধু চিন্তায় নহে, কর্মেও। দিল্লি, লাহোর, শ্রীনগর, বোম্বাই এই সকল

শহরে থাকিবার সময় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ও তীর্থ স্থানসমূহ দর্শন করিয়াছিলাম। ইহাতে আমার মানসিক বিকৃতি কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইল। চঞ্চলতার পরিবর্তে হৃদয়ে শান্তভাব আসিল। রমেশদা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

শ্রীনগর হইতে বোম্বাই যাইবার পথে আমরা দ্বারকা ও রাজপুতানা হইয়া গিয়াছিলাম। পুষ্কর, ভরতপুর, জয়পুর, চিতোর প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া আমার প্রাণে এক অপূর্ব প্রশান্ত ভাবের উদয় হইল। আমি বাড়ির কথা, বাবার কথা, সমস্ত ভুলিয়া গেলাম। একবার বাবার সঙ্গে এদিকে বেড়াইতে আসিতে চাহিয়াছিলাম। তিনি বিমাতার পক্ষপাতী হইয়া আমাকে লইয়া আসেন নাই। আজ রমেশদার অনুগ্রহে আমার সেই সাধ পূর্ণ হইল। আমি হাঁটিবার সময় রমেশদার হাত ধরিয়া চলিতাম, মোটরে চড়িয়া যাইবার সময় রমেশদার গলা জড়াইয়া বসিতাম। পশ্চিম ভারতের সেই উঁচুনিচু রাস্তায় মোটরে চলিবার সময় স্প্রিং-এর মৃদু দোলায় নাচিয়া নাচিয়া আমাদের পরস্পর-আনন্দিত-বক্ষে কি পুলকের তরঙ্গ উঠিত। রমেশদার প্রতি শুধু প্রেমে নহে, কৃতজ্ঞতায়ও আমার হৃদয় ভরিয়া গেল।

হলদিঘাট দেখাইয়া রমেশদা বলিলেন, 'এই আমাদের ভারতের থার্মোপলি—যেখানে পনের হাজার রাজপুত দেশের জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন। এ বীরত্বগৌরব আজ আমরা ভুলে গেছি।' রমেশদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িলেন। আমি ডি. এল. রায়ের 'রাণা প্রতাপ' নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলাম। আমি বলিলাম, 'এমন কঠোর ব্রত, এমন তীব্র বৈরাগ্য—স্বদেশের দাসত্বমোচনের জন্য এমন অপূর্ব স্বার্থত্যাগ আর কে করতে পারে? এত বড় উচ্চ আদর্শ আমাদের কল্পনায়ও আসে না।'

পদ্মিনীর জহরব্রতের স্থান দেখিলাম। দর্শনার্থীরা সকলে প্রণাম করিতেছে। তাহাদের দেখাদেখি আমিও মাথা নোয়াইলাম, আমার বুক কাঁপিতেছিল। হাত দুখানি অবশ হইয়া আসিল, আমি পড়িয়া যাইতেছিলাম। পার্শ্বে দণ্ডায়মান রমেশদাকে ধরিয়া বলিলাম, 'চল, এখান থেকে যাই।'

সেই সতীরানী স্বর্গ হইতে আমায় কি আশীর্বাদ করিয়াছিলেন আমি জানি না। আজ মনে হয়, যদি ভারতে পদ্মিনীর মত সতীর আদর্শ না থাকিত, তবে মানবসমাজের পথপ্রদর্শক এক উজ্জ্বল ধ্রুবতারা খসিয়া পড়িত। পুরাণে শুনিয়াছি দক্ষযজ্ঞে এক সতীর অনলপ্রবেশ, আর এই দেখিলাম বহু সতীর আত্মত্যাগের মহিমাময় তীর্থক্ষেত্র। বুঝিলাম, জহরব্রতের তিমিরগহ্বরের অগ্নিশিখা পদ্মিনীর দেহ দগ্ধ করে নাই, পাপীর ভোগলালসাকেই পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিয়াছে।

একদিন সন্ধ্যায় আমরা বোম্বাই নগরীর অন্তর্গত মালাবার শৈল পল্লীতে বায়ুসেবনার্থ ভ্রমণ করিতেছিলাম। ট্যাক্সি বিদায় দিয়া আমরা ধীরে ধীরে পদব্রজে চলিতেছিলাম, সেদিন আমার মন বড় খারাপ ছিল। কেন, তাহা পরে বলিতেছি। দুপুরবেলা আমি ঘুমাইয়া কাটাইয়াছি। রমেশদা খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা হয় নাই। আমার বিমর্ষ ভাব লক্ষ করিয়া তিনি আমাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন।

চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিয়া আমার কিঞ্চিৎ প্রফুল্লতা আসিল। রমেশদা 'হাঁ রে মানু, তোর এই মলিনমুখ দেখবার জন্যই কি ঘরবাড়ি, পরিবার পরিজন ছেড়ে এসেছি? ব্যাপার কি বল্ দেখি?' এই বলিয়া তিনি আমাকে বাঁ হাতে জড়াইয়া ধরিয়া খুব ঝাঁকিয়া দিলেন। আমি তাঁর বুকে মাথা রাখিয়া মুখ নিচু করিয়া রহিলাম। আমার কান্না পাইল। তিনি আমার চিবুক ধরিয়া আমার দিকে চাহিলেন। অস্পষ্ট আলোকে আমার ছল ছল চক্ষুতে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া আমার চক্ষের জলবিন্দু মুছাইয়া দিলেন। এসেন্সের মৃদু সুবাস আমাকে পুলকিত করিয়া চারিধারে ছড়াইল। আমরা নিকটবর্তী একখানা বেঞ্চির উপরে বসিলাম।

তিনি বলিলেন, 'মানু, তোমার জন্য সমস্ত ছাড়িয়া আসিলাম। নিজের স্ত্রী, বিধবা মা, ছোট ভাইবোন সকলের কথা আজ তোমারই জন্য ভুলিয়াছি। শেষে তুমিও আমায় পরিত্যাগ করবে? তোমায় নিয়ে কী বিপদের সম্মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, তা দেখেই বুঝতে পার তোমায় কত ভালবাসি।' রমেশদা আবার আমাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। আজ আমার এ সকল আদর সোহাগ যেন ভাল লাগিতেছিল না। সম্মুখে অস্পষ্ট অন্ধকারের দিকে আমি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। আমার হাতদুখানি কোলের উপরে অঞ্জলিবদ্ধ ছিল। রমেশদা আমার ডান হাতখানি তুলিয়া তাঁহার নিজের কাঁধের উপর নিয়া রাখিলেন। আমি রমেশদাকে অনাদর করিয়াছি ভাবিয়া লজ্জিত হইলাম।

চারিদিক নিস্তব্ধ। পার্শ্ববর্তী প্রশস্ত পথ দিয়া শৈলবিহারী শৌখিন লোকেদের দুই-একখানি মোটরগাড়ি মাঝে মাঝে মৃদুশব্দে চলিয়া যাইতেছে। রমেশদা বলিলেন, 'চুপ করে আছিস কেন, কি হয়েছে?' আমি বলিলাম, 'না কিছু হয় নি। আজ কমলার চিঠি এসেছে, তুমি ত দেখেছ।' আমি ডান হাত দিয়া ভাল করিয়া রমেশদার গলা জড়াইয়া ধরিলাম।

একটা সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে তিনি বলিলেন, 'ও, বাড়ির কথা মনে পড়েছে বুঝি। আরে তুই একেবারেই কচি খুকিটি!' একগাল ধোঁয়া ছাড়িয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, 'আচ্ছা মানু, বাড়িতে তোমার কি আকর্ষণ আছে বল দেখি। মনে কিছু কোরো না ; আমি স্বরূপ কথাই বলছি। তোমার মা নাই, ভাইবোন নাই। পিতা দ্বিতীয়পক্ষের ষোড়শী পত্নীকে নিয়ে আমোদ করে বেড়াচ্ছেন—মেয়ের দিকে ফিরেও চান না, শোবার ঘর থেকে কৌশল করে তোমায় সরিয়েছেন—তোমার মায়ের ছবিখানাকেও দূর করে দিয়েছেন। সেখানে তোমার কি সুখ আছে বল।'

আজ রমেশদা অমন কথা বলিলে তার উত্তর আমি অন্যরূপ দিতাম। কিন্তু তখন আমি ভাবিয়াছিলাম সত্যই : 'রমেশদা, আমি মরুভূমি থেকে ছুটে এসে শীতল জলধারার সন্ধান পেয়েছি, আমায় ক্ষমা কর। তুমি আমার জন্য কী ছেড়ে এসেছ তা দেখবার আমার প্রয়োজন নাই, আমার সম্মুখে তুমি যে প্রেমের নৈবেদ্য সাজিয়ে এনেছ, আমি শুধু তাই দেখছি।'

সেখান হইতে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া আমরা সিনেমায় গেলাম। আমার হৃদয়ের

প্রফুল্লতা ফিরিয়া আসিল। আমি মনে করিলাম, কেন বৃথা দুশ্চিন্তার ভার বৃদ্ধি করিতেছি। যখন সুধার পাত্র সম্মুখে রহিয়াছে, তখন কোন্ মূর্খ তাহা গ্রহণ না করিয়া মুখ ফিরিয়া চলিয়া যায়?

কমলার যে পত্রের কথা পূর্বে বলিয়াছি তাহাতে সে আমাকে লিখিয়াছিল যে সে আমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে। তিনি আমার জন্য খুব মনোকষ্ট পাইতেছেন। পুলিশকে তিনি জানাইবেন না অথবা কোনো মামলা-মোকদ্দমাও করিবেন না। বিমাতা আমার কথা মনে করিয়া কাঁদেন। হরিমতি তাহার ভবিষ্যৎ-বাক্য সুফল হওয়াতে খুব আনন্দিত। সে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বলেছে, 'সে আমি আগেই জানি।' নন্দদাদা স্কুল ছাড়িয়া দিয়াছে। সে নাকি বলিতেছে, 'আমি যেরূপে পারি মানুকে খুঁজে আনব।' মুকুলদার সহিত কমলার বিবাহের প্রস্তাবে কমলার মা সম্মতি দিয়াছেন। রমেশদার বাড়ির খবর কিছুই পাওয়া যায় নাই।'

এই পত্র পড়িয়া আমার প্রাণে বড় দুঃখ হইয়াছিল। বিমাতা বেচারি বড় ভাল ছিলেন। তিনি আমাকে ভালবাসিতেন, কিন্তু কখনও তাহা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তিনি চতুরা নারীর মত স্বামীর মন ভুলাইতে কপটতার আশ্রয় লইতেন না। তাঁহার সরল প্রাণ পিতার ইচ্ছা অনুসারেই চলিত। তাঁহার জন্য আমার কষ্ট হইল। আর কষ্ট হইল, নন্দদাদার কথা ভাবিয়া, তাহার অসাবধানতার জন্যই আমি পলায়ন করিতে পারিয়াছি। বোধ হয় এজন্য সে হতভাগ্য বাবার কাছে বকুনি খাইয়াছে। তাই বুঝি সে লেখাপড়া ছাড়িয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে। এক-একবার মনে হইত, ধরা দিয়া এমন সাহসী বীরের মর্যাদা রাখি।

বোম্বাই হইতে নাগপুর হইয়া আমরা মাদ্রাজে আসিলাম। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া বিশাখাপত্তনম ও তৎপরে ওয়ালটেয়ারে উপস্থিত হইলাম। এখানকার সমুদ্রতীর আমার বিশেষ প্রীতিজনক বোধ হওয়ায় প্রায় দুই মাস তথায় অবস্থান করি। তারপর পুরী হইয়া কাশী যাই। কাশীতে বাঙালির সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। বেড়াইতে বাহির হইলে প্রায়ই বাঙালির সহিত সাক্ষাৎ হইত। আমার কেবলি ভয় হয়, কখন পরিচিত ব্যক্তির সহিত দেখা হয়, আর ধরা পড়িয়া যাই।

আমি একদিন রমেশদাকে বলিলাম, 'চল এখান থেকে যাই। চারিদিকে বাঙালি—ফস্ করে কবে চেনা-পরিচিত কেউ দেখে ফেলবে, তখনই মুস্কিল।' রমেশদা ইজিচেয়ারে লম্বা হাতলের উপর পা তুলিয়া নিশ্চিন্ত মনে চুরুট টানিতে টানিতে বলিলেন : 'মেয়েলি বুদ্ধি নিয়ে কি এহ শর্মারাম কাজ করে? জানিস এই কাশীতে যত বাঙালি আছে তার অধিকাংশই তোর রমেশদার দলের। কেহ বা কারো ঘরের বউ বের করে এনেছেন, কেউ বা বিধবা পোয়াতি খালাস করতে এসেছেন, কেহ আপন রক্ষিতা নারীর হাওয়া বদলাচ্ছেন—আবার এমন কেহ আছেন যাঁহারা নিজের আত্মীয়া দ্বারা পাপ ব্যবসায় করাচ্ছেন। বাংলার কলঙ্কের এই তিনটি স্থান—নবদ্বীপ, কাশী ও বৃন্দাবন। ভয় কচ্ছিস কাকে? কে কাকে নিন্দা করবে?

এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। পথের জনসঙ্ঘ কর্তৃক লাঞ্ছিত এক পতিতা নাবী প্রভু যীশুখৃষ্টের আশ্রয় নিয়েছিল। যীশুখৃষ্ট সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমাদের মধ্যে যে নিষ্পাপ সে প্রথমে এই নারীর প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ কর। তখন কেহই অগ্রসর হইল না। বাইবেলে এই কথা আছে—মনে আছে?' আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ, আছে। তুমি যেমন লোক, কাশী-বৃন্দাবন-নবদ্বীপকে সেই ভাবেই দেখছ। পুণ্যের দিক তোমার চোখে পড়বে কেন? তা যাই হউক, তবু চল। এখানে বেশিদিন থেকে কাজ নেই।'

আমরা এলাহাবাদ ও আগরা হইয়া মথুরায় গেলাম। প্রয়াগে গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে স্নান করিলাম। তাজমহল, আগরা ফোর্ট ও সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি দেখিবার জন্য পাঁচদিন আগরায় বিলম্ব হইল। প্রায় পাঁচ মাস ঘুরিয়া আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগে আমরা মথুরায় পৌঁছিলাম। এখানে কিছু বেশিদিন থাকিবার ইচ্ছা। এত শহর থাকিতে মথুরার উপর রমেশদার এত মন পড়িল কেন, তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই।

স্বামীঘাটের নিকটে যমুনার ধারে অল্প ভাড়ায় একটি ভাল বাড়ি পাওয়া গেল।

ক্যাণ্টন্‌মেণ্টের দিকে ইউরোপীয় ধরনের হোটেল একটি আছে বটে, কিন্তু সেখানে থাকা রমেশদার মত হইল না। টাকা ফুরাইয়া আসিয়াছিল, সাহেবি স্টাইল আর ত চলে না। রমেশদা বলিলেন, 'মথুরায় দেশীয়ভাবে থাকাই সুবিধাজনক।' তিনি কোট-প্যাণ্টুলন-টাই-টুপি ছাড়িলেন। আমার পোশাকে বিদেশিভাব তেমন কিছু ছিলনা। গোড়ালি-উঁচু জুতার বদলে আমি নাগরাই জুতা পরিলাম। রান্না করিবার জন্য বামুন ঠাকুর রাখা হইল। একটি চাকরও পাওয়া গেল—সে বাজার করিত, জল তুলিত, থালা-বাসন মাজিত।

একদিন দেখিলাম রমেশদা গোঁফ কামাইয়া ফেলিয়াছেন। আমি বলিলাম, 'ও কি রমেশদা, তোমায় ভাল দেখাচ্ছে না।' রমেশদা বলিলেন, 'ভাবনা কি—আবার গজাবে।'

কথাটা পরিহাসের বাতাসে উড়িয়া গেল। কিন্তু ব্যাপার এইখানে শেষ হইল না। আর একদিন দেখিলাম, রমেশদা এক নাপিত ডাকাইয়া মস্তক মুণ্ডিত করিলেন, মধ্যস্থলে একগোছা চুল শিখার মত রাখিলেন। আমার সন্দেহ হইল—ইহার মধ্যে কোনো মতলব আছে। তারপর যখন ললাটে, নাসিকায় চন্দনের তিলক-ছাপ দিয়া, কাছা-শূন্য কাপড় ও মাদ্রাজি জুতা পরিয়া রমেশদা একেবারে দ্রাবিড়ি পণ্ডিত সাজিলেন, তখন আমার আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে রমেশদা আত্মগোপনের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আমি মুখ ফুটিয়া কিছু বলিলাম না। সমস্ত ঘটনাটি হাসি-ঠাট্টার উপর দিয়াই শেষ হইল।

রমেশদা এক সময়ে রেঙ্গুনে থাকিতে মাদ্রাজি কথা শিখিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে রঙ্গজীর মন্দিরে যাইয়া তিনি যখন স্বামীজী মহারাজের সঙ্গে আলাপ করিলেন, আমি আশ্চর্য হইয়া গেলাম। রামস্বরূপ আয়ার এই নামে রমেশদার চিঠি আসিত। অবশ্য অন্য শহরেও আমরা এযাবৎ ছদ্মনামে বাস করিয়াছি। কিন্তু এবারে রমেশদা যেন একটু বেশি সাবধান হইতেছেন। আমাকে এ সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই।

কলিকাতায় থাকিতেই রমেশদা বন্ধুদের সহিত মিশিয়া মদ্যপান অভ্যাস করিয়াছিলেন। আমি তাহা জানিতাম না। বাহিরে আসিয়া হোটেলে ইউরোপীয়ান স্টাইলে থাকার সময় মদ্যপানের মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইল। আমাকেও একটু-আধটু খাইতে তিনি অনুরোধ করিয়াছিলেন। আপত্তি করিয়া বলিলাম, 'না, বিশেষত দেহের এই অবস্থায়।' রমেশদা বলিলেন, 'সে এখনও ছয়মাস দেরি, তা বলে কি স্ফূর্তি মাটি করতে হয়?—আর তোমাদের আঁতুড় ঘরে যা খাওয়ানো হয়, সে 'ভাইনাম গ্যালিসিয়া'টা কি? সে ত খাঁটি এক্স নম্বর ওয়ান।' রমেশদার রোজই দু-এক গ্লাস চলিত। গন্ধটা আমার সহিয়া গিয়াছিল। কখনও কখনও বোতল হইতে আমিও ঢালিয়া দিতে বাধ্য হইতাম।

ইউরোপে তখন মহাযুদ্ধ। মথুরার ক্যান্টন্‌মেন্টে অনেক গোরা পল্টন আসিয়াছে। চারিদিক হইতে সৈন্য সংগ্রহ ও রসদ যোগাইবার ব্যবস্থা। রমেশদা বলিলেন, 'মানু, আমি একটু ক্যান্টন্‌মেন্টের দিকে যাচ্ছি, দেখি, যদি ভাল এক বোতল যোগাড় করতে পারি। এই শহরে কিছু পাওয়ার যো নাই। এরা কেবল সিদ্ধি ভাং নিয়েই ব্যস্ত।' রমেশদা বাহির হইয়া গেলেন। আমি বাড়িতে একাকী।

চাকর একখানি চিঠি দিয়া গেল। খুলিয়া দেখিলাম, কমলা লিখিয়াছে। চিঠিখানা পড়িয়া বজ্রাহত হইলাম। রমেশদা যে অফিসে চাকুরি করিত, তাহার তহবিল হইতে তিন হাজার টাকা চুরি করিয়াছে। চারি মাসের ছুটি লওয়ার কথা মিথ্যা। রমেশদার বিরুদ্ধে সেই কোম্পানি পুলিশের নিকট অভিযোগ করিয়াছে। গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির হইয়াছে। আমাকে অপহরণ করার অভিযোগ আমার পিতা না করিলেও আমার মামা (নন্দদার পিতা) জানাইয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে পুলিশ আমাদের বাড়ি, মুকুলদার বাসা, কমলাদের বাড়ি, রমেশদার বোর্ডিং এবং রমেশদার বাড়ি অনুসন্ধান করিয়াছে। কমলার এবং মুকুলদার নিকট হইতে পুলিশ রমেশদার বোম্বাই ও কাশীর ঠিকানা পাইয়াছে। গোয়েন্দা পুলিশ রমেশদার পিছু লইয়াছে।

আমার শরীর ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। তারপর রমেশদার উপর আমার অমানুষিক ক্রোধ ও ঘৃণার উদয় হইল। আমি কিছু বুঝি না বলিয়া আমার সহিত এত প্রতারণা। আমি প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি, বিশ্বাস করিয়াছি, তার প্রতিদান বুঝি এই জঘন্য ব্যবহার। আমি স্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

সন্ধ্যার পরে রমেশদা আসিলেন। অতিরিক্ত মদ্যপানে তিনি মত্ত হইয়াছেন—চোখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম। আমি কঠোর স্বরে কহিলাম, 'রমেশদা তুমি যে চার মাসের ছুটি নিয়াছিলে, তার উপর আরও এক মাস হ'য়ে গেল, অথচ...'—আমার কথা শেষ না হইতেই রমেশদা জড়িত কণ্ঠে কহিল, 'সে কৈফিয়ত কি তোর কাছে দিতে হবে না কি? তুই কি আমার মনিব?' আমি বলিলাম, 'কৈফিয়ত চাহি না, কারণ ত আমায় বলতে পার।'

রমেশ। 'আমি আরও তিন মাসেব ছুটির দরখাস্ত করেছি। এইবার সন্দেহ মিটেছে।'

আমি। 'সন্দেহ নয় রমেশদা, তুমি জানো, হাতের টাকা সব ফুরিয়ে গেছে। আর এক সপ্তাহও চলবে না। যদি তুমি এখন কলকাতায় ফিরে না যাও, তবে অন্তত ছুটির মাসের বেতনটাও আনাতে পার। সেও তো আটশত টাকা হবে।'

রমেশ—'সে ভাবনা তোমায় করতে হবে না। সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাইটা দাও তো।'

আমি হুকুম তামিল করিয়া বলিলাম, 'রমেশদা, দেখছ তো আমার দেহের গতিক। এমন অবস্থায় কোন ভাল শহরে—যেখানে ভাল ডাক্তার অথবা প্রসূতি-হাসপাতাল আছে, এমন স্থানে না থাকিলে ভয় হয়। তাতেও অনেক টাকা খরচ হবে।'

রমেশদা টলিতে টলিতে খাটিয়ার উপর শুইয়া পড়িলেন। সিগারেট টানিতে টানিতে বলিলেন, 'টাকার আর ভাবনা কি মানু। দেখছিস ত এক থোকে আড়াই হাজার টাকা।' রমেশদা কাশিতে কাশিতে 'ওয়াক ওয়াক' করিতে লাগিলেন। আমি একটা বাটি সম্মুখে রাখিয়া বলিলাম, 'আড়াই হাজার কেন, তিন হাজার বল।' রমেশদা চক্ষু বিস্ফারিত করিলেন। তাঁহার বমির ভাব চলিয়া গেল।

আমি বলিলাম, 'রমেশদা, তুমি তিন হাজার যেভাবে পেয়েছ তা আমি জানি। সেই রকম রোজগারের আর এক কানাকড়িও আমি চাহি না। যদি ক্ষমতা থাকে, সৎপথে থেকে উপার্জন করে আমায় রাখ—চুরি-জোচ্চুরির পথে গিয়ে নিজে মজো না, আমায়ও মজিও না।'

রমেশদা নেশার ঘোরে বলিতে লাগিলেন, 'মানু, তোকে নিয়ে আমি সর্বত্যাগী হলুম, আর তুই আমায় চোর বলছিস? আমি কার জন্যে চুরি করেছি—কার জন্য স্ত্রীকে ছেড়েছি, মাকে ছেড়েছি, কার জন্য জেলে পা বাড়িয়েছি? যাঃচ্চলে, এই দুনিয়ায় দরদী কেউ নেই,প্রেমের মর্যাদা কেউ বুঝলে না। ও রে, চোর না হলে কেউ প্রেমিক হয় না। এই মথুরা তার সাক্ষ্য দিবে। বেশ, তুমি সাধুসজ্জন নিয়ে থাক, আমি এই মুহূর্তে চল্লুম।'

রমেশদা উঠিয়া টলিতে টলিতে জুতা পরিলেন, জামা গায়ে দিলেন। এ কি, সত্যই তিনি চলিলেন। আমি ছুটিয়া যাইয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিলাম, 'রমেশদা আমায় ছেড়ে যেওনা, আমার অপরাধ হয়েছে, ক্ষমা কর—আমায় অকূল সমুদ্রে ভাসিও না।'

রমেশদা এক লাথি মারিয়া আমাকে দূরে ফেলিয়া ক্রোধোন্মত্ত স্বরে চিৎকার করিয়া কহিলেন, 'চুপ রও শয়তানি, আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না। তোমার ধর্মজ্ঞান নিয়ে তুমি থাক।' নেশার ঘোরে তিনিও পড়িয়া যাইতেছিলেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁহাকে বিছানায় শোয়াইয়া মাথায় জল দিয়া বাতাস করিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁর খুব বমি হইতে লাগিল। বিছানা মেজে সব ভাসিয়া গেল। দুর্গন্ধে ঘর ভরিয়া উঠিল। বামুন ঠাকুর অথবা চাকর ইহারা কেহ কাছে আসিল না। আমি নিজেই বালতি করিয়া জল আনিয়া সমস্ত পরিষ্কার করিলাম। সে রাত্রিতে আমাদের কাহারও আহার হইল না। আমি তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলাম। শেষ রাত্রিতে তাঁর খুব ঘাম

হইয়া দেহ একেবারে হিম হইয়া গেল। আমার বড় ভয় হইল। মানসিক উদ্বেগে দুশ্চিন্তায় সারা রাত্রি আমার ঘুম হইল না।

পরদিন বেলা নয়টার সময় রমেশদার চৈতন্য হইল। তাঁহাকে স্নান করাইয়া একটু গরম দুধ দিয়া কোকো তৈয়ারি করিয়া খাইতে দিলাম। কমলার চিঠিখানি তিনি আদ্যন্ত পড়িলেন। বুঝিলেন, ব্যাপার গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের প্রণয়ের নির্মল আকাশে মেঘের সঞ্চার হইল। বিশ্বাসের স্থলে সন্দেহ আসিল। রমেশদাকে এক নূতন চক্ষে আমি দেখিতে লাগিলাম। তাঁহার চরিত্রের নানা দিক আমার সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল—লম্পট, চোর, বিশ্বাঘাতক, মিথ্যাবাদী, মাতাল।

পঞ্চম

পাপের পথে

তারপর হইতে নানা খুঁটিনাটি লইয়া রমেশদার সহিত আমার প্রায়ই ঝগড়া হইতে লাগিল। হাতে নগদ টাকা যাহা ছিল, সমস্ত খরচ হইয়া গিয়াছে, মুকুলদার কাছে চিঠি দেওয়ায় তিনি পঞ্চাশ টাকা পাঠাইয়াছিলেন—তাহাও অতি কষ্টে। তিনি অল্প বেতনে সামান্য মাস্টারি করেন। সেই পঞ্চাশ টাকার মধ্যে আটাশ টাকা রমেশদা মদ খাইয়া উড়াইয়াছেন। দুর্ভাগ্য যখন আসে তখন এমনই হয়। বেতন না পাইয়া বামুন ঠাকুরটি চলিয়া গিয়াছে। দুই বেলা আমি রান্না করি। আমি রন্ধনকার্য জানিতাম না, কখনও শিখি নাই। অসুস্থ দেহ লইয়া আগুনের তাপে ও ধোঁয়ায় আমার প্রাণ যায় যায় হইয়া উঠিত।

মথুরায় একটা কাজকর্মের চেষ্টা দেখিতে বলিলাম, কিন্তু সেকথা রমেশদা গ্রাহ্য করিলেন না। শীতের জন্য এক সুট দামি পোশাক ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ হইল। ক্রমে ক্রমে আমার গহনাগুলিও বিক্রয় করিলেন। আমার বিমাতা জন্মদিনের উপহার স্বরূপ আমাকে একছড়া সোনার হার দিয়াছিলেন, তাহা আমি বিক্রয় করিতে দিব না বলিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। এই অপরাধে আমার উপর খুব মার-ধর ও বকুনি হইল। আজকাল কথায় কথায় লাথি, চড়-থাপড় এসব আমার ভাগ্যে জুটিত। আমি কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহা সহ্য করিতাম।

রমেশদা আমাকে বলিলেন, 'কমলাকে কিছু পাঠাইতে চিঠি লেখ।' আমি বলিলাম, কমলা 'দরিদ্র ঘরের মেয়ে, সে টাকা পাইবে কোথায়?' ইহা লইয়া রমেশদা আমার উপর খুব রাগ করিলেন। আমি অগত্যা কমলাকে চিঠি লিখিলাম। সে কুড়ি টাকা পাঠাইল। তাহাও কয়েকদিনেই ফুরাইয়া গেল।

আমার দুই একখানা দামি কাপড় ও গহনা তখনও ছিল। রমেশদা নানা কৌশলে তাহা আমার নিকট হইতে নিয়া বিক্রয় করেন। কেবল সেই সোনার হারছড়া তখনও আমি দিই নাই। একদিন তিনি আসিয়া বলিলেন, 'মানু, বৃন্দাবনে প্রেম-মহাবিদ্যালয়ে একটা প্রফেসারি

কাজ পেয়েছি। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। লোকটা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ভয়ানক বিরোধী। আমারও সেই ভাব তুমি তা জানই। রাজা খুব খুশি হলেন। আমাকে এখন মাসিক একশত টাকা বেতন দিবেন।' আমি শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম।

রমেশদা চিন্তাকুল চিত্তে কহিলেন, 'একসুট পোশাক তৈয়ারি করা দরকার, কিন্তু টাকারই তো অভাব।' আমি বলিলাম, 'আমার সোনার হারছড়া বাঁধা রেখে কিছু টাকা ধার কর, তারপর এক মাসের বেতন পেলেই ছাড়িয়ে আনতে পারবে।' রমেশদা মুখ ফিরাইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'না, তাও কি হয়, তোমার সৎমার স্নেহের উপহার।' আমি বুঝিলাম, সেদিনের ব্যাপারে আমার উপর এ অভিমান ও শ্লেষ। আমি তখনি আমার হাতবাক্স খুলিয়া রমেশদার কোলের উপর হারটা ফেলিয়া দিলাম। সেই হার বন্ধকে পাওয়া দেড়শত টাকা রমেশদার হাতেই খরচ হইয়াছে। অথচ প্রফেসারি চাকুরির জন্য যে একসুট পোশাক তৈয়ারি করিবার কথা ছিল তাহা হয় নাই।

আমার সন্দেহ হইল, চাকুরির কথা মিথ্যা। আমার শেষ সম্বল হারছড়া হস্তগত করিয়া তাহা দ্বারা মদের মূল্য সংগ্রহ করাই রমেশদার উদ্দেশ্য ছিল। আমি একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কবে থেকে প্রফেসারি আরম্ভ করবে।' রমেশদা বেশ চতুরতার সহিত উত্তর করিলেন, 'রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ হঠাৎ বৃন্দাবন ছেড়ে চলে গেছেন। গভর্নমেণ্ট তাঁর গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির করেছে। এই ত হয়েছে এখন মুস্কিল।' পাছে আমার সন্দেহ হয় সেইজন্য 'হিন্দু' নামক সংবাদপত্র হইতে পড়িয়া আমাকে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ বিষয় শুনাইলেন।

মথুরায়, বৃন্দাবনে তখন ঝুলনের উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। আমি রমেশদাকে বলিলাম, 'চল, একবার দ্বারকাধীশের মন্দিরে যাই।' তিনি বলিলেন, 'না, আমার শরীরটা ভাল লাগছে না। তুমি লছমনকে সঙ্গে নিয়ে যাও।' লছমন আমাদের চাকরের নাম। আমি বাহির হইয়া গেলাম। রমেশ বাড়িতে রহিলেন।

ঝুলনের সময় মথুরার মন্দিরে খুব আমোদপ্রমোদ হয়। দ্বারকাধীশের মন্দিরেই সর্বাপেক্ষা বেশি। স্বর্ণরৌপ্য মণ্ডিত বৃহৎ সিংহাসনে ঠাকুরকে বসাইয়া দোলানো হয়। সমস্ত মন্দির আলোক, পুষ্পপত্র, পতাকায় সুসজ্জিত হইয়া এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করে। গায়কগণ সুললিত স্বরে ভজন গানে রত থাকেন। এই সকল দর্শন করিলে নানা দুঃখ ও বিপদের মধ্যেও শান্তির ভাব আসে।

আমরা বিশ্রামঘাটের আরতি এবং আরও দুই-তিনটি মন্দিরে ঝুলন দেখিয়া রাত্রি প্রায় ৯টার সময় বাড়িতে ফিরিলাম। ঘরে যাইয়া দেখি রমেশদা নাই। আলো জ্বলিতেছে। শোবার খাটিয়ার উপরে একখানি চিঠি রহিয়াছে। পড়িয়া দেখিলাম তাহাতে এরূপ ভাবের লেখা ছিল :

'মানু তোমার সঙ্গে আর থাকা যায় না। তুমি আমায় চোর, লম্পট, মাতাল বলে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছ। যেখানে ঘৃণা ও সন্দেহ, সেখানে ভালবাসার স্থান নাই। আজ আমি

তিন হাজার টাকা অফিসের ক্যাশে গুঁজে দিলেই আমার চোর অপবাদ ঘুচবে—আরও দু-চার-দশটা মেয়ে বের করলেও আমি সমাজে বুক ফুলিয়ে বেড়াব—আর মদ্যপান, সে তো বড়লোকের লক্ষণ। তুমি নিজের ভাল বুঝলে না। তোমার আর উদ্ধার নাই। দেখব তোমার নবজাগ্রত নীতিজ্ঞান তোমাকে কত দূর রক্ষা করে। আমি চললাম—আমায় খুঁজো না। পুলিশ আমার পিছু নিয়েছে। তুমি অবিলম্বে এই বাড়ি ছেড়ে যেও।'

আমার হঠাৎ মনে হইল, একটা পর্বতপ্রমাণ বোঝা যেন আমার মাথার উপর হইতে সরিয়া গেল। ডুবিতে ডুবিতে আমি যেন জলের উপরে নাক তুলিয়া একটু নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। রমেশদার ব্যবহার আমার এত অসহ্য হইয়াছিল। আমি স্বাধীনতা চাহিয়াছিলাম, ভগবান বুঝি তাহারই পথ খুলিয়া দিলেন।

রাত্রিতে রান্না-খাওয়া হইল না। গভীর রাত্রিতে আমার মনে নানা দুশ্চিন্তা আসিল। এখন কি করি, কোথায় যাই। ভাবিলাম, দুর্বলচিত্ত হইলে চলিবে না। অনিদ্রায় রাত্রি কাটিল। সকালে উঠিয়া চারিদিকে চাইতেই রমেশদার জন্য দুঃখ হইল। চা তৈয়ারি করিলাম না। লছমনকে ডাকিয়া বলিলাম, 'আমি বৃন্দাবনে যাব, একখানি এক্কা অথবা টাঙা ঠিক করে দাও।'

আমার গহনার মধ্যে হাতে দুগাছা সোনার চুড়ি ও কানে একজোড়া দুল মাত্র অবশিষ্ট ছিল। সে সমস্ত বিক্রয় করিয়া চাকরের তিন মাসের বেতন চুকাইয়া দিলাম। আমার হাতে কিছু টাকাও রহিল।সেই সময়ে কমলার একখানি চিঠি পাইলাম। সে লিখিয়াছে, 'রমেশবাবুর সঙ্গে পলায়ন করা তোমার ভুল হইয়াছে। এ প্রকার প্রেমেব মিলন যেমন হঠাৎ এসে পড়ে, বিচ্ছেদও তেমনি হঠাৎ হয়ে যায়। তোমাদের উভয়ের বিবাহে এমন বিশেষ-কিছু বাধা ছিল না। তোমার পিতারও বোধ হয় অমত হত না। এখনও তুমি ফিরে এসে ভ্রম সংশোধন করতে পার।'

কমলার উপদেশ আমার ভাল লাগিল না। তাহার পত্রের কোনো উত্তর দিলাম না। বৃন্দাবনে যাইয়া সেবাকুঞ্জের নিকটে একখানি ছোট ঘর ভাড়া লইলাম। তাহার আশেপাশে আরও অনেক বাঙালি বাস করিত, তাহাদের প্রায় সকলেই অধিক বয়সের বিধবা। আমি তাহাদিগকে বললাম, 'মথুরায় থাকিতে আমার স্বামী ও শাশুড়ির কলেরায় মৃত্যু হইয়াছে। দেশে আত্মীয়স্বজনের নিকট চিঠি লিখিয়াছি।' সকলেই আমার জন্য দুঃখপ্রকাশ করিল।

এক মাস পরে আমি এই ঘর ছাড়িয়া বংশীঘাটের নিকট যাইয়া বাস করিতে লাগিলাম। হাতের সামান্য টাকা ফুরাইয়া আসিয়াছিল। ইতিমধ্যে একবার জ্বর হইয়া প্রায় দশ দিন ভুগিয়াছিলাম। ভিক্ষা করিতে পারিলে আহারের অভাব হয় না, কিন্তু আমার শরীর এত দুর্বল হইয়াছিল যে চলিতে পারিতাম না।

দুই দিন কিছু খাই নাই। ভিক্ষা চাহিতে জানি না। বংশীঘাটের নিকট রাস্তার ধারে শুইয়া আছি। ভাবিতেছি, এখন মরণ আসিলেই বাঁচি। একজন বাঙালি ভদ্রলোক যাইতেছিলেন, তিনি আমার দুরবস্থা দেখিয়া দয়ার্দ্র হৃদয়ে আমাকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। ইনি এক সাধু

মোহান্তের শিষ্য। মোহান্তজীর বৃহৎ আশ্রম—তাহাতে দেববিগ্রহ ও বহু শিষ্যসেবকাদি রহিয়াছে। মোহান্তজী বাঙালি। তাঁহার বয়স প্রায় ৬৫, মস্তকে জটা, আবক্ষলম্বিত দীর্ঘ শ্মশ্রু, অঙ্গে চন্দনবিভূতি। তিনি আসনে বসিয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়া শিষ্যকে বলিলেন, 'একে নিয়ে এসেছ কেন? এ যে অন্তঃসত্ত্বা। কোনো দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় পালিয়ে এসেছে, এখন সেই লোকটি সরে পড়েছে। এর অনেক কষ্টভোগ আছে। আচ্ছা, কিঞ্চিৎ ঠাকুরের প্রসাদ একে দাও।'

আমি একটু সুস্থ হইলে তিনি আমাকে বলিলেন, 'মা, আমার এই আশ্রমে তো স্ত্রীলোক রাখবার নিয়ম নাই। বিশেষত তুমি গর্ভবতী, সম্মুখে অনেক বিপদ। তুমি এখন কি করবে বল।' আমি কাঁদিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া বলিলাম, 'বাবা, আমি মহাপাপী, আমায় উদ্ধার করুন। আপনি তো মনের কথা সবই জানেন।' মোহান্তজী বলিলেন, 'হাঁ, আমি সব জানি। তোমার মনের কথা তুমি যাহা না জান আমি তাহাও জানি। এই অনুতাপ ক্ষণস্থায়ী ও অপ্রকৃত। কামপ্রবৃত্তি একবার হৃদয়ের মধ্যে শিকড় গজাইয়া উঠিলে আর রক্ষা নাই। দুঃখ-দারিদ্র্য, রোগশোকে, সাময়িক বিচারবুদ্ধিতে সেই পাপবৃক্ষকে মাঝে মাঝে ছেদন করিয়া দেয় ; কিন্তু আবার অনুকূল অবস্থায় নূতন অঙ্কুর জন্মে। একমাত্র ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত এই প্রলোভনকে স্থায়ীরূপে জয় করা যায় না। ইহার জন্য কঠোর সাধনার প্রয়োজন।

আমি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলাম, 'আমায় ক্ষমা করুন, আমায় আশ্রয় দিন।' মোহান্তজী স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন 'মা, অন্নবস্ত্র দেওয়ার দয়া তুমি অনেক পাবে। সেই দয়ার অভাব সংসারে নাই। তোমাকে এখন যে আক্রমণ করেছে সে দারিদ্র্য নহে, সে, তোমার দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি। সেই আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার আশ্রয় তো তুমি চাও না, তোমার প্রার্থনা অন্নবস্ত্র ও বাসগৃহ। আচ্ছা, তুমি ঘরে ফিরে যাবে?'

আমি সম্মতি জানাইলে তিনি আমার পিতার নাম-ঠিকানা লিখিয়া লইলেন। পরে শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন, 'কলিকাতায় চিঠি লেখ। আশ্রমের পাশের বাগানে রামকিষণ তাহার স্ত্রী ও দুটি ছেলে নিয়ে আছে। তাদের সঙ্গে এ স্ত্রীলোকটিও থাকবে। সব ঠিক করে দাও।' শিষ্য চলিয়া গেলে তিনি আমাকে বলিলেন, 'তোমার পিতা পুনরায় গ্রহণ করবেন বলে আমার মনে হয় না। তাঁকে তো সমাজ মেনে চলতে হচ্ছে। পাপ-প্রলোভনের বশীভূত হওয়া একটা আধ্যাত্মিক ব্যাধি। প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা খণ্ড [ন] না হলে চিত্ত কিছুতেই ঈশ্বরাভিমুখী হতে পারে না।'

রামকিষণের পরিবারের সহিত আমি আশ্রমের বাগানে বাস করিতেছি। রামকিষণ বাগানের তত্ত্বাবধান করে। প্রত্যহ গোয়ালঘর পরিষ্কার করা, তিনটি গাভী ও কয়েকটি বাছুরকে খৈল-ভূষি খাওয়ানো, দশ-বারো কলসি জল ইন্দারা হইতে তুলিয়া বাগানে দেওয়া, ঠাকুরের ভোগ রান্না করিবার পাত্রাদি মাজা, সাধুদের ভোজন হইয়া গেলে সেই স্থান পরিষ্কার করা, আমার নিজের আহারের জন্য গম পিষিয়া লওয়া আমার নিত্য

কর্তব্যরূপে নির্ধারিত হইয়াছিল। আমি সন্তুষ্টচিত্তে এই সকল কার্য করিতাম। কিন্তু আমার বড় পরিশ্রম বোধ হইত। মোহান্তজীর নির্দেশ অনুসারে আমার মাথায় চুল ছোট করিয়া কাটিয়া ফেলা হইয়াছিল। কেবলমাত্র প্রভাতে মঙ্গল-আরতির সময় আমি মন্দিরপ্রাঙ্গণে যাইবার অনুমতি পাইয়াছিলাম। মোহান্তজী বাগানে আসিলে প্রয়োজনমত আমার সহিত কথাবার্তা বলিতেন।

একমাস পর আমার পিতার চিঠি আসিল। তিনি মোহান্তজীকে জানাইয়াছিলেন যে তিনি আমাকে গ্রহণ করিতে পারিবেন না। এমন কন্যাকে তিনি মৃতার ন্যায় জ্ঞান করেন। তখন তর্ক করিবার বুদ্ধি আমার ছিল না। আমার শরীর ও মন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু আজ আমি পিতার কথার উত্তর দিতে পারি। আমার এই আত্মচরিত লেখা আরম্ভ করিবার কিছুদিন পূর্বে গত ঝুলনের সময় আমি বৃন্দাবনে গিয়াছিলাম। সেখানে মোহান্তজীর সঙ্গে আমি পুনরায় সাক্ষাৎ করি। তাহার বিবরণ যথাস্থানে লিখিব। তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, 'বাবাজী, আমি মহাপাপী, সমাজে আমার স্থান নাই, পিতা আমায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার মত পাপরতা, পতিতা নারীর পদতলে যে সকল পুরুষ তাহাদের মানমর্যাদা-অর্থসম্পত্তি-দেহমন বিক্রয় করেছে, ওই দেখুন, তাদের সমাজ মাথায় তুলে রেখেছে—তারা কবি ও সাহিত্যিক বলিয়া প্রশংসিত, রাজনীতিক ও দেশসেবক বলিয়া বিখ্যাত, ধনী প্রতিপত্তিশালী বলিয়া সম্মানিত। এমন কি অনেক ঋষি-মোহান্তও গুরুগিরি ফলাইয়া সমাজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত আছেন, তাহা সমাজ জানিয়া-শুনিয়া নীরব। কোর্টে, কাউন্সিলে, করপোরেশনে, গুরুগিরিতে কোথাও তাদের কোনো বাধা নাই। আর আমরা কবে বালিকা বয়সের নির্বুদ্ধিতার জন্য এক ভুল করেছিলাম তার ফলে এই বারো বৎসর ধরে জ্বলে-পুড়ে মরছি। এই ত আপনাদের সমাজের বিচার।'

তিন মাস অতীত হইয়া গেল। একদিন মোহান্তজী বাগানে আসিলে রামকিষণ তাঁহাকে বলিল, 'বাবা, এ যে পোয়াতী মেয়ে, এত খাটুনিতে পেটের ছেলেটার কোনো কিছু না হয়।' আমি তখন নিকটেই বসিয়া গোবরের ঘুঁটে তৈয়ার করিতেছিলাম। মোহান্তজী বলিলেন, 'পেটের ছেলে কি আর বেঁচে আছে! এখন কোনোরূপে প্রসব হয়ে গেলে ভাল। এইটুকু পরিশ্রম না করলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে যে।' রামকিষণ আশ্চর্য হইল। মোহান্তজী বলিলেন 'মেয়েটার দেহে কুৎসিত ব্যাধি প্রবেশ করেছে। প্রবৃত্তির উত্তেজনায় মানুষ স্বাস্থ্যবিধিও ভুলে যায়।'

যথাসময়ে আমি একটি মৃত পুত্র প্রসব করিলাম। রামকিষণের স্ত্রী আমার সেবাশুশ্রূষায় রত হইল। এই সরলপ্রকৃতি অশিক্ষিতা কৃষকরমণীর মাতৃসম স্নেহের কথা আমার চিরদিন মনে থাকিবে। কিছুদিন পরে যখন পুনরায় বৃন্দাবনে গিয়াছিলাম তখন রামকিষণের স্ত্রীর খোঁজ করিয়াছিলাম। কিন্তু শুনিলাম, আমি যাইবার আট মাস পূর্বে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

সন্তানপ্রসবের পর আমার নানা রোগ দেখা দিল। কিছু খাইতে পারিতাম না। সন্ধ্যার

সময় অল্প জ্বর হইত। সঙ্গে সঙ্গে পেটের অসুখ। আমি একেবারেই শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলাম। মোহান্তজী যথাসম্ভব আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রায় চারি মাস ভুগিয়া আমি কিঞ্চিৎ সুস্থ হই। এই সময়ে একদিন রাত্রিশেষে আমি বিছানায় পড়িয়া মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিলাম। আমার মনে হইল আমি যেন আমাদের কলিকাতার বাড়িতে আছি। মা আমার কাছে বসিয়া আমার মাথায় হাত বুলাইতেছেন। আমি ঘুমের ঘোরে বলিলাম, 'মা তোমরা যে থিয়েটারে যাবে, আমায় সঙ্গে নিয়ে চল।' মা বলিলেন, 'না তুই এখন ছেলে মানুষ।' তারপর কে আসিয়া মাকে ডাকিল, মা উঠিয়া গেলেন। আমি চিৎকার করিয়া বলিলাম, 'মা গো আমায় নিয়ে যাও'—রামকিষণের স্ত্রী পাশের ঘর হইতে ছুটিয়া আসিল। আমি তখন কাঁদিয়া বলিতেছি, 'মা গো, আমায় নিয়ে যাও গো।' এই স্বপ্নের কথা আমি মোহান্তজীকে বলিয়াছিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন, 'তোমাকে আরও অনেক ভুগতে হবে।' আমি দীক্ষা গ্রহণ করিতে চাহিলাম। তিনি বলিলেন, 'মা, আমি দৈবকে অতিক্রম করিতে পারি না। দীক্ষা নেবার তোমার এখনও সময় হয় নাই।'

আরও ছয়-সাত মাস গেল। আমার আশ্রমবাস প্রায় এক বৎসর হইল। শরীর একটু ভাল হইয়াছে, এখন শ্রমের কার্যও নিয়মিত করিতে পারি। মোহান্তজীর শিষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ নির্দিষ্ট সময়ে বাগানে যাইয়া ঠাকুরের ভোগের জন্য তরিতরকারি ফলমূল শাকসবজি লইয়া আসিতেন। ইঁহাদের একজনের সহিত কোনো কথা প্রসঙ্গে আমার কুদৃষ্টি দূর হইতে মোহান্তজী লক্ষ করেন। আমি যদিও তাঁহার প্রতি কুভাবে আসক্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু তিনি ছিলেন নির্মলচরিত্র। তবু তদবধি তাঁহাকে আর বাগানে পাঠানো হইত না।

আমি এক দীর্ঘ প্রেমপত্র লিখিয়া তাঁহাকে দিবার জন্য এক দিন বেলা প্রায় দুইটার সময়ে আশ্রমে প্রবেশ করি। জানিতাম তখন মোহান্তজী তাঁহার আসনে ধ্যানস্থ থাকেন। আশ্রমপ্রাঙ্গণে একটি বৃহৎ বৃক্ষের তলায় আমি দাঁড়াইয়াছিলাম। হঠাৎ দেখিলাম, মোহান্তজী আমার দিকে আসিতেছেন। আমি ভীত হইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ সময়ে তুমি আশ্রমে এসেছ কেন? এখন তোমার আসিবার কথা নয়।' আমি ইতস্তত না করিয়া তখনই উত্তর দিলাম, 'শ্যামলী বাছুরটা এইদিকে ছুটে এসেছে।' মোহান্তজী গম্ভীর স্বরে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, 'বাহিরে যাও, বাছুর এখানে আসে নি। এলেও সে রামকিষণের কাজ, তোমার নয়—'।

পরদিনই মোহান্তজী আমাকে ডাকিলেন। আমি সভয়ে তাঁহার সম্মুখীন হইলাম। তাঁহার নিকটে আর-একজন প্রৌঢ় বাঙালি ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। মোহান্তজী আমাকে বলিলেন, 'তোমাকে আজই এই ভদ্রলোকটির সঙ্গে কলিকাতায় যেতে হবে। সেখানে ইনি তোমার সকল ব্যবস্থা করে দিবেন।' আমি মনে মনে সুখী হইলাম।

মোহান্তজী সাংসারিক জীবনে একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ছিলেন। সেই সূত্রে তাঁহার অনেক বন্ধু বৃন্দাবনে যাইয়া তাঁহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ ও ধর্মালোচনা করিতেন। যে

ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমি কলিকাতায় আসিলাম, তিনি মোহান্তজীর বন্ধু। তাঁহার গৃহে আমি প্রায় দশ দিন অবস্থান করি।

কলিকাতা নগরের উপকণ্ঠে কোনো স্থানে শ্রীযুক্ত....দাস একটি নারী উদ্ধার আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি একজন আইন ব্যবসায়ী। দেশকর্মী বলিয়া প্রসিদ্ধ। মোহান্তজীর বন্ধু সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি আমাকে নারী উদ্ধার আশ্রমে রাখিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দাসের সহিত ইহার বিশেষ পরিচয় ছিল।

আমার জীবনের ইতিহাসের এক অধ্যায় শেষ হইল। পিতার অনাদর, কুশিক্ষা ও কুসংসর্গ আমাকে পাপের পথে আনিয়াছে। আমি কখনও সংযম শিখি নাই। প্রবৃত্তির অনলে কেবল ইন্ধন যোগাইয়াছি। গল্প-উপন্যাস পাঠ করিবার ফলে সমাজশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাবই কেবল আমার মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছে। উত্তেজনার বশে কার্যের পরিণামের দিকে দৃষ্টি যায় নাই।

পতিতা নারীদের মধ্যে যাহারা এইরূপে পরপুরুষের অবৈধ প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া কুপথে আসে, তহাদের সকলের ভাগ্যেই এই দশা ঘটে। সেই পুরুষটি অবোধ বালিকার সর্বনাশ করিয়া অল্পসময়ের মধ্যেই তাহাকে ছাড়িয়া যায়। এমন কোনো পতিতা নারী নাই, যে আমরণ তাহার প্রথম প্রণয়ীর সহিত বাস করিতেছে।[২] অভিজ্ঞতা হইতে ইহাব যুক্তিসঙ্গত কারণ আমি দেখাইয়া দিতেছি।

অবৈধ প্রেম উত্তেজনার বশেই জন্মে।[৩] উত্তেজনামাত্রই ক্ষণস্থায়ী ও তাহা কদাচ বিচারবুদ্ধি প্রসূত নহে। সুতরাং যে প্রেম অল্পতেই জন্মে, তাহা অল্পেতেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার অবৈধ প্রেমে মিলিত নারী পুরুষের বিচ্ছেদের কারণ একের বা উভয়ের দোষ, অথবা অবস্থার পীড়ন। অর্থাভাব, গর্ভসঞ্চার, রূপ-বিকৃতি—এই সব হইল অবস্থার পীড়ন। মদ্যপানের অভ্যাস, অপরের প্রতি আসক্তি এই সব হইল নারী- পুরুষের দোষ।

আমাদের ব্যাপারে দুই ঘটিয়াছিল। রমেশদার মদ্যপান ও আমার অসময়ে সন্তান সম্ভাবনা আমাদের বিচ্ছেদের কারণ। যদি রমেশদা হিন্দুর সামাজিক রীতি অনুসারে আমাকে বিবাহ করিয়া আমার স্বামী হইতেন, তবে তিনি কখনই আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। আর কিছু না হউক, শেষকালে একটা আইনের ভয়ও থাকিত—লোকলজ্জা ও সমাজ শাসন না হয় ছাড়িয়াই দিলাম।[৪] অবৈধ প্রেমে যেমন মিলনের স্বাধীনতা আছে, তেমনি বিচ্ছেদের স্বাধীনতাও আছে। তাই রমেশদা অনায়াসে আমাকে ছাড়িয়া গেলেন। সমাজ আজ রমেশদাকে প্রশংসাই করিবে। আমিই হইয়াছি নিন্দার ভাগী। রমেশদা আমাকে শেষ কথা সত্যই বলিয়া গিয়াছেন।

তারপর এত দুঃখ ভোগ করিয়াও আমার শিক্ষা হয় নাই। মোহান্তজীর আশ্রমে এমন পুণ্যের বাতাসের মধ্যে থাকিতেও দুষ্প্রবৃত্তির অঙ্কুর আবার আমার হৃদয়ে দেখা দিয়াছে। শয়তানের প্রলোভন সুখস্বর্গের ছবি লইয়া সম্মুখে আসিল। আমি তাহাতে মুগ্ধ হইলাম।

ষষ্ঠ

দেহ বিক্রয়

যে সকল স্ত্রীলোক পাপ পথ ছাড়িয়া সদ্ভাবে জীবন যাপন করিতে ইচ্ছুক, তাহারা এই উদ্ধার আশ্রমে স্থান পাইত। কোনো প্রকার শিল্পকার্যাদির দ্বারা জীবিকা অর্জনের উপায় তাহারা অবলম্বন করিত। আবার এমন স্ত্রীলোকও সেখানে ছিল, যাহারা নিতান্ত দায়ে পড়িয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। উহারা আমার মত এইরূপ ঘটনাচক্রে জড়িত, সমাজ অথবা পরিবারে তাহারা যাইতে পারে না। তাহাদের জীবনের গতি অস্থির। উদ্ধার আশ্রমে খাওয়া-পরা পাইয়াই যে তাহারা সুখী, আমার তাহা বোধ হইল না। ইহাদের সকলেই কিশোরী বা যুবতী। আমি যখন সেখানে গিয়াছিলাম, তখন প্রায় ১৩।১৪ জন স্ত্রীলোক ছিল, তন্মধ্যে জন-পাঁচেক প্রৌঢ়া বিধবা ব্যতীত আর সকলেই এই শ্রেণির।

আমি ক্রমশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম, যে সকল স্ত্রীলোক স্বেচ্ছায় বা কুলোকের প্ররোচনায় ঘরের বাহির হইয়া আসে, অন্নবস্ত্রের অভাবই তাহাদের প্রধান বিপদ নহে। 'কী খাইব' এই চিন্তা অপেক্ষা 'কিরূপে থাকিব' এই ভাবনাই তাহাদের বেশি করিতে হয়। কলিকাতা শহরে স্ত্রীলোকেরা নানাপ্রকার ব্যবসায় ও চাকুরিতে নিযুক্ত হইতে পারে। তাহাতে গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত অর্থ উপার্জন করা যায়। কিন্তু আমি দেখিয়াছি, ওই সকল ব্যবসায় ও চাকুরি যে সকল স্ত্রীলোক অবলম্বন করিয়াছে তাহাদের মধ্যেও অনেকে প্রায় পতিতা নারীর পথে চলিতেছে। ইহার কারণ, তাহারা কখনও বিবাহিত জীবনের সংযমের মধ্য দিয়া আসে নাই। পানওয়ালি, মেস-বেডিং-হোটেলের বা গৃহস্থ বাড়ির ঝি-চাকরানি, বাজারের মাছ-তরকারি-ফলমূল-প্রভৃতি বিক্রয়কারিণী, রাঁধুনি, কারখানার মজুরানি, মশলা-ঝাড়াইওয়ালি, থিয়েটারের অভিনেত্রী, কীর্তনওয়ালি, শুশ্রূষাকারিণী, সংগীত-শিক্ষয়ত্রী, প্রসবকারিণী দাই, মেয়ে ডাক্তার, রেলের টিকিট-অফিসে ও টেলিফোনের মেয়ে কেরানি—ইহারা সকলেই স্বীয় জীবিকানির্বাহের উপযুক্ত অর্থ উপার্জন করিতে পারে এবং ইচ্ছা করিলে পবিত্র জীবন যাপন করিতে পারে ; কিন্তু তাহা সকল সময়ে হয় না। বহুদিনের অভিজ্ঞতায় আমি একথা বলিতেছি।

উদ্ধার আশ্রমের কর্তৃপক্ষদের নিকট আমি পিতার পরিচয় ও ঠিকানা সমস্তই গোপন করিয়াছিলাম। তাঁহারা শুধু জানিলেন, আমি উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণের মেয়ে। কুমারী অবস্থায় কোন দুষ্ট লোক আমাকে ঘরের বাহির করিয়া আনিয়াছিল। সে গর্ভাবস্থায় আমাকে ছাড়িয়া পলাইয়াছে। রমেশদার নামও আমি প্রকাশ করিলাম না। আমি লেখাপড়া কিছু জানি, ইহা প্রকাশ হইল।

বৃন্দাবন হইতে কলিকাতায় আসিতে আমার খুব আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাহার কারণ, আমি আশা করিয়াছিলাম, আর যাহাই হউক অন্তত মুকুলদা ও কমলাকে দেখিতে পাইব।

অকূল সমুদ্রে এই দুইটি বন্ধু আমার তৃণস্বরূপ। কিন্তু উদ্ধার আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তাহাদের খবর পাওয়া সহজ ব্যাপার নহে।

শীঘ্রই কয়েকটি সমবয়সি মেয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। ইহাদের মধ্যে রাজবালা ও হরিদাসী এই দুইজন ছিল প্রধান। ইহাদের কথা এই পুস্তকের স্থানে স্থানে আরও কয়েকবার উল্লেখ করা হইবে। সুতরাং ইহাদের একটি পরিচয় দিতেছি। রাজবালা সোনারবেণের মেয়ে। বাপের বাড়ি কলিকাতায়, অল্প বয়সে তার বিবাহ হইয়াছিল। পিতা ও শ্বশুর উভয় পরিবারই সঙ্গতিপন্ন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিবাহের এক বৎসর পরেই হতভাগিনী বিধবা হয়। তৎপরে পিতার প্রতিবেশী এক পূর্ববঙ্গবাসী কায়স্থ যুবকের সহিত তাহার গুপ্ত প্রণয় জন্মে। রাজবালার এক জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ এই ব্যাপারে তাহাকে গোপনে সাহায্য করিত। যুবকটি স্বদেশি আন্দোলনের সময় খুব 'বন্দে মাতরম্' করিয়া বেড়াইত। তিন বৎসর ধরিয়া এই গুপ্ত প্রেমলীলা চলিতে থাকে। অবশেষে রাজবালার সন্তানসম্ভাবনা হওয়ায় প্রেমিক যুবক পলায়ন করে। রাজবালা ঝিয়ের সহিত গঙ্গাস্নানের অছিলায় বাড়ির বাহির হইয়া আসে, আর সে ফিরিয়া যায় নাই। তারপর নানা দুঃখদুর্দশার আবর্তে ঘুরপাক খাইতে খাইতে এই উদ্ধার আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছে।

কালিদাসী সধবা, কামারের মেয়ে। সে রূপসী ছিল। বর্ধমান জেলার কোনো পল্লীগ্রামে তাহার শ্বশুরঘর। স্বামীর নিকট হইতে দুর্বৃত্তেরা তাহাকে বলপূর্বক অপহরণ করে। তাহারা এক বৎসর ধরিয়া তাহাকে নানা স্থানে ঘুরাইয়া বেড়ায়। ইহা লইয়া মামলা-মোকদ্দমা হইয়াছিল। কিন্তু মোকদ্দমার পরে কালিদাসীর স্বামী তাহাকে গ্রহণ করিল না। তাহার এক আত্মীয়ের পরামর্শে সে পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করিতে যাইতেছিল। বর্ধমান শহরের কোনো উকিল জানিতে পারিয়া তাহাকে এইখানে পাঠাইয়া দেন।

ক্রমশ বুঝিতে পারিলাম, উদ্ধার আশ্রমটি আমাদের পক্ষে নিরাপদ স্থান নহে। অন্নবস্ত্রের কোনো ক্লেশ নাই। আমাদের মধ্যে যাহারা রূপযৌবনসম্পন্না, তাহাদের প্রতি কর্তৃপক্ষের মধ্যে কাহারও কাহারও একটু বিশেষ দৃষ্টি। আমার উপর তাঁহাদের শীঘ্রই অনুগ্রহ পড়িল। আমাকে কাজকর্ম করিতে হইত না। আমার থাকিবার ঘর বিবিধ আসবাবপত্রে সজ্জিত হইল। আমি অতিশয় প্রীত হইলাম। আমার ভাল কাপড়চোপড়, দামি জামাসেমিজ, পরিপাটি বিছানা। অন্যান্য মেয়েরা কেহ কেহ আমাকে এজন্য ঈর্ষা করিত। রাজবালা ও কালিদাসী আমাকে দেখিলেই মুচকি হাসিয়া বলিত, 'এবার তোর ভালই কপাল ফিরেছে।'

কর্তৃপক্ষদের মধ্যে একজন আমার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন। আমিও ধরা দিলাম। তিনি আমার ঘরে মাঝে মাঝে রাত্রি যাপন করিতেন। জানিলাম, আমার মেয়েবন্ধুদের গৃহেও কর্তৃপক্ষদের অপর কেহ কেহ গোপনে যাতায়াত করিয়া থাকেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইল।[৫]

একদিন আমি আমার গুপ্ত প্রণয়ীর নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলাম। কিন্তু তিনি সম্মত

হইলেন না। আমার সমবয়সি মেয়েরা মিলিয়া মাঝে মাঝে আমাদের গুপ্ত প্রণয়ের কথা তুলিয়া হাস্যপরিহাস করিত। রাজবালা ও কালিদাসীর সহিত প্রাণের কথা হইত। আমার পরামর্শে তারা দুজনেও বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিল। কিন্তু কোনো ফল হইল না। আমি বলিলাম, 'ভাই, যদি রূপ যৌবন বেচতে হয়, তবে লুকিয়ে চোরের মত কেন, একেবারে বাজারে নেমে দর যাচাই করে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করব।' রাজবালা ও কালিদাসী সেইদিন হইতে তাহাদের প্রণয়ীদিগকে আর ঘরে প্রবেশ করিতে দিল না। আমিও তাহাই করিলাম। আমাদের উপর নানা উৎপীড়ন আর অত্যাচার আরম্ভ হইল। আমরা স্থির করিলাম, উদ্ধার আশ্রমে আর থাকিব না, কিন্তু আমরা নিরাশ্রয়, নিঃসহায়, কোথায় যাই।

তখন ইউরোপে মহাযুদ্ধ ভীষণভাবে চলিতেছে। ভারতবর্ষ হইতে বহু সংখ্যক শুশ্রূষাকারিণী নারী আহত সৈন্যদের সেবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছে। সেইজন্য কলিকাতা বোম্বাই—প্রভৃতি বড় বড় শহরের হাসপাতালগুলিতে নার্সের কাজ করিবার লোকের অভাব ঘটিয়াছে। আমাদের আশ্রমে সংবাদপত্র আসিত। আমি বাংলা খবরের কাগজ হইতে পড়িয়া অন্যান্য মেয়েদের শুনাইতাম।

রাজবালার মাথায় কী এক মতলব আসিল। সে একদিন আমাকে বলিল, 'আয় ভাই, আমরা নার্সের কাজ শিখি।' আমি বলিলাম, 'আশ্রমের কর্তৃপক্ষ সে ব্যবস্থা না করিলে তো হয় না।' শ্রীযুক্ত....দাস মহাশয় একদিন আশ্রম পরিদর্শন করিতে আসিলে রাজবালা তাঁহাকে এইসকল বিষয়ে কথা বলিল। তিনি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং আমাদিগকে প্রাথমিক কিছু শিক্ষা দিবার নিমিত্ত একজন ডাক্তার নিযুক্ত করিলেন। কালিদাসী লেখাপড়া জানিত না। তাহাকে শিখাইয়া লইবার ভার আমার উপর পড়িল। তিন মাসের মধ্যেই সে খুব উন্নতি দেখাইল। মাঝে মাঝে আমাদিগকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইত। সেখানে আমরা নানাবিধ যন্ত্র ও ঔষধাদির নাম শিখিতাম।

গুপ্ত প্রণয়ীরা আমাদিগকে তখনও ছাড়ে নাই। তাহাদের অত্যাচারে একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম। একটা মেয়ের উপর একদিন পাশবিক অত্যাচারের উপক্রম করায় সে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য পাশের বাড়িতে লাফাইয়া পড়ায় তাহার পা ভাঙিয়া যায়, এজন্য মোকদ্দমাও হইয়াছিল। কিন্তু তাহার ফলাফল শুনি নাই। একদিন সন্ধ্যার পরে আমি, রাজবালা, কালিদাসী ও আর একটি মেয়ে (তাহার নাম এখন মনে নাই—বোধ হয় খেঁদি বা এমন কিছু হইবে) এই চারিজন একখানি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিয়া টালিগঞ্জে আসিলাম। সেখান হইতে ট্রামে আমরা কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে [বর্তমানে বিধান সরণী] সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দিরে উপস্থিত হইলাম।

এই স্থানটি আমার পরিচিত ছিল। বাল্যকালে পিতার সহিত এই উপাসনামন্দিরে অনেকবার আসিয়াছি। আজ সেই কথা মনে পড়িয়া চক্ষে জল আসিল। উপাসনা শেষ হইয়াছে। সমবেত উপাসকগণ প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছেন। কেবল কয়েকজন বিশিষ্ট

লোক অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমাদের ব্রাহ্ম মহিলার মত কাপড় পরা ছিল। পায়ে জুতাও ছিল, আমরা অগ্রসর হইয়া গেলাম।

ব্রাহ্মসমাজে আসিবার ষড়যন্ত্র আমরা অনেকদিন হইতেই করিতেছিলাম। রাজবালাই ইহার মূল কারণ। সে বলিয়াছিল ব্রাহ্মসমাজ সকলকেই গ্রহণ করে, ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করিলে বিবাহ করা সহজ হইবে। কিন্তু শেষে আমরা দেখিলাম, সেখানেও বাধা আছে।

সম্মুখে একজন পক্ককেশশ্মশ্রুবিশিষ্ট দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠদেহ বৃদ্ধকে দেখিয়া রাজবালা আমার কানে কানে বলিল, 'এই বুঝি কৃষ্ণকুমার মিত্র[৬]—প্রণাম কর।' আমরা চারিজনেই পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি স্নেহপূর্ণ স্বরে আমাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমরা তাঁহাকে একপাশে ডাকিয়া নিয়া সকল কথা বলিলাম এবং আমাদের রক্ষার উপায় করিতে অনুরোধ করিলাম। উদ্ধার আশ্রমের কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহার ও আমাদের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের অভিলাষ তাঁহাকে জানাইলাম।

তিনি বলিলেন, 'আপনাদের রক্ষার উপায় একাকী আমার দ্বারা সম্ভবপর হয় না। সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিগণকে জিজ্ঞাসা করাও প্রয়োজন।' তৎপরে তিনি একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোককে নিকটে ডাকিলেন। তাঁহার নিকট সমস্ত ঘটনা বলা হইলে তিনি বিশেষ ঘৃণার সহিত আপত্তি জানাইয়া কহিলেন, 'না, তা কিরূপে হয়? ইহাদের পূর্ব জীবন কলুষিত। ব্রাহ্মসমাজে কি পাপ প্রবেশ করিবে?' আমরা নিরাশ হইয়া চলিয়া আসিলাম। বিদায় লইবার সময় পুনঃপ্রণাম করিতে গেলে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় আমাদের প্রণাম গ্রহণ করিলেন ; কিন্তু অপর লোকটি, পরে শুনিয়াছিলাম তাঁহার নাম হেরম্ববাবু[৭]— 'না—না—' বলিয়া সরিয়া গেলেন। এই ভদ্রলোকটির সহিত পরে আমার আর-একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহা বলিলে তিনি দুঃখিত হইতে পারেন মনে করিয়া বলিলাম না।

আমরা ভাবিতে লাগিলাম, এখন কোথায় যাই। উদ্ধার আশ্রমে আর আমাদিগকে নেবে না। সেখানে ফিরিয়া যাওয়াও আমাদের ইচ্ছা ছিল না। হঠাৎ আমার কমলার কথা মনে হইল। তাহার বাড়ির ঠিকানা আমি জানিতাম। অন্তত দুই-একদিন সেখানে থাকিতে পারিব, এইরূপ ভরসা হইল। একখানা ঘোড়া গাড়ি ভাড়া করিয়া আমরা চারিজনেই বাগবাজারে কমলার বাড়ির দিকে রওনা হইলাম।

কিন্তু সেখানে যাইয়া দেখি, কমলা তাহার মাতার সহিত কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তাহারা সে বাড়িতে নাই। অন্য লোক ভাড়াটে রহিয়াছে। তাহারা কমলাদের কোনো সন্ধান দিতে পারিল না ; আমি যেন একেবারে বজ্রাহত হইলাম। দীর্ঘকাল পরে নানা দুঃখ ভোগের পর বাল্যকালের প্রিয়বন্ধু কমলাকে দেখিব বলিয়া মনে বড়ই আনন্দ হইয়াছিল—কিন্তু সে আশা যে এরূপভাবে বিনষ্ট হইবে, তাহা কখনও মনে করি নাই। আমি মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

মুকুলদার ঠিকানা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কমলার সন্ধান তাঁহার কাছে পাওয়া সম্ভব ছিল।

আর কি উপায় আছে? রাজবালা বলিল, 'ভাই আজ রাত্রির মত আমি তোমাদিগকে একটা পরিচিত জায়গায় রাখিতে পারি। তারপর কাল সকালে যাহা হয় করা যাইবে।' আমরা অগত্যা সম্মত হইলাম। তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে।

সেই ঘোড়ার গাড়িতে আরও বেশি ভাড়া দিয়া আমরা চাঁপাতলায় হাড়কাটা গলিতে এক পতিতা নারীর গৃহে আশ্রয় লইলাম। এই স্ত্রীলোকটি রাজবালার পূর্বজীবনের পরিচিতা। সে সমস্ত বাড়িটা ভাড়া লইয়া তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে বেশ্যা ভাড়াটে বসাইয়াছিল। তাহাতে তাহার কিছু লাভ হইত। এতদ্ভিন্ন পাপ ব্যবসায়ে উপার্জন ছিল। এই প্রকার স্ত্রীলোককে পতিতা নারী সমাজে 'বাড়িওয়ালি' [বা মাসি] নামে অভিহিত করা হয়। ইহাকে সকলে রানি-বাড়িওয়ালি বলিয়া ডাকিত।

বাজবালাকে অনেকদিন পরে পাইয়া, বিশেষত তাহার সঙ্গে আমাদের তিনজনকে দেখিয়া বাড়িওয়ালি অতিশয় আনন্দিত হইল। সে পরম যত্নের সহিত আমাদের সকলকে একটি ঘরে থাকিতে দিল, তাহাতে বিছানাপত্রেরও অভাব ছিল না। আমাদের কিছু খাবার ব্যবস্থাও হইল। রাজবালার সহিত বাড়িওয়ালি নানা কথাবার্তা বলিতে আরম্ভ করিল। দুশ্চিন্তায় আমাব মনে শান্তি নাই। জীবনে এই প্রথম আমি ব্যবসাদার খাঁটি বেশ্যার ঘরে প্রবেশ করি। আমার কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। নীচের তলায় এক কোণে ঘর, আলো, বাতাস নাই। চারদিকে একটা নতুন রকমের দুর্গন্ধ। কোথাও মাতালের বমি, কোথাও গান-বাজনা, কোথাও হৈ হৈ চিৎকার, কোথাও গালাগালি-ঝগড়া—এই সব দেখিয়া-শুনিয়া আমার হৃদয় দমিয়া গেল। অথচ এখান হইতে পলাইয়া কোথায় যাইব তাহাও জানি না।

পরদিন সকালে খেঁদি বলিল, বেলিয়াঘাটায় তার এক মাসির বাড়ি আছে, সে সেখানে যাইবে। আমরা আপত্তি করিলাম না। সে চলিয়া গেল। আমরা আরও তিন-চারিদিন সেই বাড়িতে রহিলাম। ইতিমধ্যে বাড়িওয়ালি আমাকে ও কালিদাসীকে নানাপ্রকারে বুঝাইয়া বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে মত লওয়াইল। সেই চতুরা নারীর সঙ্গে আমি তর্কে পারিলাম না। সে যে সকল যুক্তি দেখাইল তার সারমর্ম এই—বেশ্যারা স্বাধীন ; ভগবান তাহাদিগকে রূপ দিয়াছেন, পুরুষকে ভুলাইবার কৌশল দিয়াছেন কিসের জন্য?—তাহা দ্বারা জীবিকা উপার্জন করিতে। উকিল তাহার বুদ্ধি বিক্রয় করে, পণ্ডিত তাহার বিদ্যা বিক্রয় করে, এমন কি দীক্ষাগুরুও মন্ত্র বিক্রয় করেন ; তবে রূপবতী কেন দেহ বিক্রয় করিবে না? বিপদ ভয় সকল ব্যবসায়েরই আছে। দেশের বড় বড় লোক সমস্ত বেশ্যাদের পায়ে বাঁধা। ধনী লোকদের টাকা বেশ্যাদের ঘরে উড়িয়া আসিয়া পড়ে। তাহাদের এক কটাক্ষের মূল্য সহস্র টাকা।

আমি ভুলিলাম। বাড়িওয়ালি আমার জন্য ঘর দেখিতে লাগিল, কালিদাসী সেই বাড়িতেই ঘর নিল। আমহার্স্ট স্ট্রীটের উপর যেখানে এখন সিটি কলেজের বাড়ি তৈয়ারি হইয়াছে,' তাহার নিকটে এক বস্তিতে আমি ও রাজবালা দুইখানি খোলার ঘর ভাড়া

লইলাম। রানিবাড়িওয়ালি আমাদের দুইজনকেই কিছু টাকা ধার দিয়া জিনিসপত্র ও কাপড়চোপড় সমস্ত জোগাড় করিয়া দিল।

কুসঙ্গে কিরূপ অধঃপতন হয়, আর-এক দিক দিয়া তাহা দেখিতে পাইলাম। আমার স্কুলে পড়া বিদ্যা সমস্ত ভুলিয়া যাইবার গতিক হইল। মুকুলদার কাছে কত নূতন বিষয় শিখিয়াছিলাম—সাহিত্য, ইতিহাস, প্রভৃতি এখন সব চাপা পড়িয়া গেল।[৯] আমি যাহাদের সঙ্গে ছিলাম তাহারা কেহ লেখাপড়ার চর্চা করিত না। কেবল কার কয়টা লোক জুটিয়াছে—কার প্রণয়ীর সঙ্গে কী আলাপ হইল—আর যত সব অশ্লীল ব্যাপার, ইহাই ছিল প্রধান আলোচনার বিষয়। তারপর নিজেদের রান্না ও ঘরের কাজ সমস্ত করিতে হইত। আমরা লজ্জায় বাজারে যাইতাম না। অন্য কাহাকেও দিয়া বাজার করাইতাম।

লম্পট প্রণয়ীকে পতিতা সমাজে 'বাবু' বলা হয়।[১০] এখন হইতে আমি এই শব্দটি মাঝে মাঝে ব্যবহার করিব। এই 'বাবু' লইয়া খুব গোলযোগ হইত। কোনো পতিতার প্রণয়ী অন্য নারীর ঘরে প্রবেশ করিলে তাহা লইয়া তুমুল ঝগড়া বাধিয়া উঠিত। সকলেই তাহাতে যোগ দিত। আমিও বাদ যাইতাম না। আর যতরকমের অশ্লীল অশ্রাব্য কথা, শুনিতে শুনিতে আমার সহিয়া গিয়াছিল। বুঝিলাম স্কুলের পড়া হইতে যে অল্পবিদ্যা পাইয়াছি তাহা আমার অহংকার বাড়াইয়া সর্বনাশ করিয়াছে, কিন্তু আমাকে পাপের আক্রমণ হইতে বাঁচাইতে পারে নাই।

আমরা সন্ধ্যার পরে সাজিয়াগুজিয়া আরতি দেখিবার ছলে নিকটবর্তী ঠন্‌ঠনিয়া কালীবাড়িতে যাইতাম। সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া যখন দেখিতাম আমরা কোনো ভদ্রবেশধারীর নজরে পড়িয়াছি, তখন বাড়ির দিকে যাত্রা করিতাম। সেই ভদ্রবেশধারী ব্যক্তিও আমাদের সঙ্গ লইত। এই রূপে শিকার-কৌশল রানিবাড়িওয়ালি আমাদিগকে শিখাইয়াছিল।

আমি প্রথমে যাইতে আপত্তি করিতাম। আমার ভয় ছিল যদি বাপের বাড়ির কাহারও সঙ্গে দেখা হয়। যদি নন্দদাদা, সেই হরিমতি-ঝি, অথবা বাবার মোটর-ড্রাইভার, এমন কি বাবা নিজেই যদি দেখিয়া ফেলেন। রাজবালা আমাকে সাহস দিয়া বলিল, 'তোমাদের বাড়ি এ পাড়ায় নয়—সে ত এখান হইতে অনকে দূরে ; কলিকাতার মত শহরে কে কার খবর নেয়। এ পাড়ার লোক ও পাড়ায় যায় না।' আমিও বুঝিলাম তাহাই ; অবশেষে আমি সাবধানে রাজবালার সহিত বাহিরে যাইতাম। আমার আর-একটা আশা ছিল, যদি মুকুলদাকে কখনও রাস্তায় দেখি। কারণ আমার মনে পড়ে তাঁহার বাড়ি এ পাড়াতেই ছিল।

একদিন শীতের রাত্রিতে ঠন্‌ঠনিয়া কালীবাড়ি হইতে ফিরিবার সময় দেখিলাম একজন ভদ্রলোক মাথায় র‍্যাপার জড়াইয়া আমাদের পিছু পিছু আসিতেছেন। আমার বাড়ি পর্যন্ত আসিয়া তিনি রাজবালার ঘরে গেলেন। রাজবালা আমাকে ডাকিয়া বলিল, 'কাল রাত্রিতে যে লোকটি আমার ঘরে এসেছিল তিনি কে জানিস?—বৈঠকখানার বাজারের কাছে কি একটা কলেজ আছে[১১] সেই কলেজের তিনি বড় প্রফেসার, তাঁহার নাম শ্রী....। তিনি

আরও দুই-তিন দিন আমার ঘরে এসেছিলেন।' আমি তো নাম শুনিয়া অবাক। এঁর কথা মুকুলদার মুখে কতবার শুনিয়াছি। ইনি খুব ভাল পড়ান। আমি ভাবিলাম এই প্রফেসারের নিকট হইতে মুকুলদার কোনো খবর পাওয়া যায় কি না দেখিব।

রানিবাড়িওয়ালি আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে আসিত ; আমরা তাহাকে রানিমাসি বলিয়া ডাকিতাম। ক্রমে আমার ভয় দূরে গেল। আমি দেখিলাম অন্য সকল স্ত্রীলোক আমোদপ্রমোদে মত্ত থাকে, নিঃসংকোচে চলাফেরা করে—গঙ্গাস্নান, কালীঘাটে, যেখানে-সেখানে নির্ভয়ে যায়। তাহারা আমাকে বুঝাইল, এখন আর ভয় করিস কাকে? গভর্নমেণ্টের কাছে যখন একবার বলেছিস যে স্বেচ্ছায় এই বৃত্তি নিয়েছি, তখন আর কে তোকে কী বলবে? নাচতে নেমে লজ্জা করলে চলবে কেন?

রানিমাসি বলিল, 'তোমার পিতা যখন মনে করেন তুমি মরিয়াছ, তিনি যখন তোমায় আর ঘরে নিবেন না, তুমিও তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কচ্ছ না, তবে আর পিতাকেই বা ভয় কিসের?' আমি বলিলাম, 'তবু পিতা যদি দেখেন তাঁর কন্যা তাঁর সম্মুখে পাপ ব্যবসা করছে, তাঁর মনে দুঃখ হয় না?' রানিমাসি কহিল, 'তিনি কন্যাকে ঘরে নিয়া অনায়াসে সেই দুঃখ থেকে রক্ষা পেতে পারেন। মা, এ পথে যখন এসেছ, তখন অনেক নূতন চিত্র তোমার চোখে পড়বে। দেখবে সত্যই পিতার সম্মুখে কন্যা বেশ্যাবৃত্তি করছে—দেখবে সত্যই গর্ভধারিণী মাতা আপন কন্যাকে বেশ্যাবৃত্তি করবার জন্য নিত্য সাজিয়েগুজিয়ে দিচ্ছে—দেখবে সত্যই ভ্রাতা-ভগ্নী, আত্মীয়স্বজন বেশ্যা উপার্জিত অর্থে আত্মপোষণ করছে। পতিতা শুধু আমরা নই—প্রায় সমস্ত সমাজই অধঃপতিত হয়েছে।'

আমি ও রাজবালা কোনো উত্তর না দিয়া নীরবে শুনিতেছিলাম। রানিমাসি পুনরায় বলিতে লাগিল, 'মানি, কোন দিন হয়ত দেখবে তোমার নন্দদাদাই তোমার ঘরে উপস্থিত হয়েছে। তোমার মুকুলদাও আসতে পারে। মনে কিছু কোরো না মা, আমি স্বরূপ কথা বলছি। কোনো দিন হয়ত আমার ঘরেই তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব নহে।'

আমি লজ্জায় জিভ কাটিলাম। রাজবালা মাথা নিচু করিল, রানিমাসি বলিতে লাগিল, 'আর কি বলব মা, সেদিন যে একটি স্ত্রীলোক রামবাগান থেকে আমার বাড়িতে এসেছিল, তাকে তো তোমরা দেখেছ। তার ইতিহাস শুনবে? তার পিতা.....ভট্টাচার্য ; কলিকাতার কোনো কলেজের খুব বড় অধ্যাপকের কাজ করতেন। বেশি বয়সে কাজ ছেড়ে দিয়ে এখন রামবাগানে আপন রক্ষিতার গর্ভজাত কন্যার সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হয়ে শেষকালটা কাটাচ্ছেন—এই তো অবস্থা। আমি অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি ; তোমরাও দেখবে।'

আমরা যে বাড়িতে ছিলাম, সেই বাড়িতে একটি স্ত্রীলোকের ঘরে একদিন দেখি সে একটা ছবিকে ফুলের মালা দিয়া সাজাইতেছে। স্ত্রীলোকটির বয়স কিছু বেশি, সৌন্দর্য তখনও রহিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ছবিখানি কার? সেই স্ত্রীলোকটি বলিল, উহা

শিবনাথ শাস্ত্রীর ছবি। তিনি ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রধান আচার্য ছিলেন। আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, 'ও হো—সেই শিবনাথ শাস্ত্রী, যাঁর 'নিমাইসন্ন্যাস' কবিতা আমরা স্কুলে কত মুখস্থ করেছি, না—

আজ শচীমতা কেন চমকিলে,
ঘুমাতে ঘুমাতে উঠিয়া বসিলে?
লুণ্ঠিত অঞ্চলে 'নিমু' 'নিমু' বলে
দ্বার খুলি মাতা কেন বাহিরিলে?

বাবার মুখেও এঁর নাম মাঝে মাঝে শুনতাম। তারপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'শিবনাথ শাস্ত্রীর ছবি তুমি তোমার ঘরে রেখেছ কেন?' সে বলিল, 'আমি যখন ১৭/১৮ বৎসরের মেয়ে তখন এক প্রৌঢ়া পতিতা নারী আমাকে আশ্রয় দেয়। তাহার ছোট দুইটি ছেলে ছিল। তাহার প্রণয়ী বাবু তাহাকে একখানি বাড়ি দান করেন। রূপযৌবনবিক্রয়লব্ধ অর্থে আত্মপরিপোষণ করবার জন্যই সেই স্ত্রীলোকটি আমায় এনেছিল। সে চাঁপাতলার কোনো ছুতারের মেয়ে, ৭ বৎসর বয়সে বিধবা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও শিবনাথ শাস্ত্রী তাহার পুনঃ বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন। নানা কারণে তাহা হয় নি। শিবনাথ শাস্ত্রীকে সে বাল্যকালে দাদা বলে ডাকত। অবশেষে ঘটনাচক্রে সে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করল। আমি তাহার আশ্রয়ে আসবার পর একদিন শিবনাথ শাস্ত্রী সেই বাড়িতে আসেন এবং তাহাকে বেশ্যাবৃত্তি পরিত্যাগ করবার জন্য অনেক উপদেশ দেন। কিন্তু তাহাতে ফল হয় নাই। মৃত্যুর কিছুকাল পুর্বে সেই স্ত্রীলোকটির হৃদয়ে অনুতাপ জন্মে। তখন আমি বাড়িতে ছিলাম। আমি তাহাকে মা বলে ডাকতাম। সে শিবনাথ শাস্ত্রীর এই ছবিখানা তখন কিনে আনে। প্রতিদিন সে ইহাকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে পূজা করত। মরবার সময়ে সে আমাকে ছবিখানা দিয়ে গেছে এবং যত দিন বাঁচি এমনি করে ফুল দিয়ে সাজাতে বলেছে। তার মৃত্যুর পর সেই দুই ছেলে বাড়ির দখল নিয়ে আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে। আমি এখন এইভাবে আছি।'[১২]

আমি বলিলাম, 'শিবনাথ শাস্ত্রী এত বড় উদার চরিত্র, পাপীকে উদ্ধার করবার জন্য বেশ্যালয়ে আসতে ঘৃণা বোধ করেন নি?' স্ত্রীলোকটি ছবিখানিকে প্রণাম করিয়া বলিল, 'তিনি অনেক পতিতাকে সৎপথে এনেছেন। ঢাকার এক পতিতা নারীর কন্যা লক্ষ্মীমণিকে তিনি উদ্ধার করে এক ব্রাহ্ম যুবকের সহিত বিবাহ দিয়েছিলেন, সে গল্প আমি শুনেছি।'[১৩] আমি বলিলাম, 'আর এখন ব্রাহ্মসমাজ কী হয়েছে। আমরা সেদিন স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে আশ্রয় নিতে গেলাম, তারা আমাদের নিলে না। হেরম্ববাবু নামে একজন, (পরে শুনেছি তিনি হেরম্বচন্দ্র মৈত্র) আমরা 'পাপী' বলে আমাদের প্রণাম পর্যন্ত গ্রহণ করলেন না। বোধ হয় আজ শিবনাথ শাস্ত্রী বেঁচে থাকলে আমাদের এ দশা হত না।'

এই অস্বাস্থ্যকর খোলার ঘরে থাকিবার ফলে আমার শরীর দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল। রানিমাসির পরামর্শে গর্ভসঞ্চার নিরোধ করিবার জন্য একটা ঔষধ খাইয়াছিলাম—

তারপর হইতে আমার নানা রোগ দেখা দিল। রাজবালাও সেই ঔষধ খাইয়াছিল, কিন্তু তার কোনো অসুখ হইল না। আমি অতিশয় ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া পড়িলাম। সমস্ত শরীরে বেদনা। হাতপায়ের তলায় বিশ্রী দাগ, মুখে ফুস্কুড়ির মত হইয়া ক্ষত উৎপন্ন হইল। রানিমাসি দেখিয়া বলিল, হাসপাতালে না গেলে আর রক্ষা নাই।

আমি জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। বিছানায় পড়িয়া দিবারাত্রি অবিরত কাঁদিতাম। চক্ষের জলে বালিশ ভিজিয়া যাইত। সেইবার রোগে ভুগিয়া বুঝিয়াছিলাম, মরণে বোধ হয় সুখ আছে। আত্মীয়বন্ধু কেহ নাই। বাড়ির অন্য স্ত্রীলোক সকলে নিজ নিজ কার্যে ব্যস্ত। সন্ধ্যার পর সকলকেই ব্যবসায়ের খাতিরে দরজায় দাঁড়াইতে হয়? তারপর সারারাত্রি অনিদ্রায় মদ্যপানে অথবা নানাপ্রকার উত্তেজনায় কাটাইয়া তাহারা বেলা ৮টা ৯টায় ঘুম হইতে উঠে। আমাকে কে দেখিবে? চারিদিকে একটা বীভৎস ব্যাপার আমার চোখে পড়িল। আমরা যেন শূকরীর দল, কাদায় গড়াগড়ি দিতেছি। বুঝিলাম এবার আমার মৃত্যু নিশ্চয়।

রানিমাসি ও রাজবালা দুজনে মিলিয়া আমাকে হাসপাতালে দিয়া আসিল। তিন মাস পরে সুস্থ হইয়া আমি বাড়ি ফিরিলাম। তখন আমার হাতে একটি পয়সাও নাই।

সপ্তম

সমাজচিত্র

বৃন্দাবনে সেই মোহান্তজী আমায় বলিয়াছেন, 'অন্নবস্ত্রের দয়া তুমি অনেক পাবে।' তাঁহার কথাটি যে সত্য এই প্রমাণ আমি জীবনে বার বার পাইয়াছি। দারিদ্র্য হইতে রক্ষা পাওয়া কঠিন নহে, কিন্তু প্রবৃত্তির আক্রমণ হইতে কেহ বাঁচাইতে পারে না। অধিকন্তু সেই রাক্ষসীর গ্রাসে ঠেলিয়া দিবার লোক অনেক আছে। রানিমাসি এবার আমাকে তাহার নিজের বাড়িতে লইয়া গেল। সেখানে দোতলায় একখানা ভাল ঘর খালি হইয়াছিল। আমি তখন বুঝি নাই এই প্রকার দয়ার কার্যই আমাদিগকে সর্বনাশের পথে টানিয়া নেয়।

আমার যে বিদ্যা ছিল, তাহাতে আমি কাহারও বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াইতে পারিতাম, টেলিফোন অফিসে কাজ করিতে পারিতাম—নার্সের কাজ করিতে, গান শিখাইতে পারিতাম, কিন্তু এই সকল সৎপথে অর্থ উপার্জন করিবার প্রবৃত্তি এবং সুযোগ কেহ আমাকে দেয় নাই। কেবল রূপযৌবনের পসরা লইয়া বাজারে ঘুরিবার দুর্মতি রানিমাসি আমার হৃদয়ে জাগাইয়া দিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, 'রানিমাসি, আমার দেহকান্তি মলিন হয়েছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষীণ, বিশুষ্ক। মাথার চুলের আর সে পূর্বের শোভা নাই। আমার দ্বারা এই পথে আর কি উপার্জন হবে?' রানিমাসি আমাকে বুঝাইল, 'পতিতার রূপই প্রধান সম্পত্তি নহে। লম্পটেরা রূপ দেখিয়া মোহিত হয় না। দেখবে অতি কুরূপা বেশ্যা, সুন্দরীদের অপেক্ষা অধিক অর্থ উপার্জন

কচ্ছে। এই জন্যে বলে, 'যার সঙ্গে যার মজে মন।' পুরুষগুলি যখন সন্ধেবেলা বেশ্যাপল্লীতে ঘুরে বেড়ায়, তখন কন্দর্পঠাকুর তাদের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেন।

রানিমাসি আমাকে কতকগুলো কৌশল শিখাইল। কাপড় পরিবার ফ্যাশান, দাঁড়াইবার ভঙ্গি, কথা বলিবার কায়দা, চলিবার রীতি, এসব কিরূপ হইলে লোক আকৃষ্ট হয় সে তাহা দেখাইয়া দিল। মনে দারুণ দুঃখ ও অপ্রীতির কারণ থাকিলেও আগন্তুক পুরুষের সঙ্গে হাসিয়া কথা কহিতে হইবে। এমন ভালবাসা দেখাইবে, তাহা যে কপট তাহা কেহ যেন ধরিতে না পারে। প্রণয়ী মদ্যপানাসক্ত হইলে মন রক্ষার জন্য কিরূপে মদের গ্লাস ঠোঁটের কাছে ধরিয়া মদ্যপানের ভাণ করিতে হয় তাহা দেখিয়া লইলাম। লম্পটদের মধ্যে যে ব্যক্তি যে প্রকারের আমোদ চায় তাহাকে তাহাই দিতে হয়। এইপ্রকার প্রতারণা শিক্ষা করিতে করিতে আমার বোধ হইল, যেন আমার হৃদয়ের মধ্যে একটা নূতন মানদার সৃষ্টি হইতেছে।

আমি ভাল গাহিতে পারিতাম। গলার সুরও আমার বেশ সুমিষ্ট ছিল, একথা পূর্বে বলিয়াছি। এ বিদ্যাটি পতিতার জীবনে খুব কাজে লাগে। রানিমাসি আমাকে গান শিখাইবার জন্য ওস্তাদ রাখিল। সে বলিল, 'তোমার ব্রহ্মসঙ্গীত স্বদেশি গান তো এখানে চলবে না। লপেটা, হিন্দি, গজল, অথবা উচ্চ-অঙ্গের খেয়াল-ঠুংরি, এসব হল বেশ্যামহলের রেওয়াজ।[১৪] কীর্তনও শিখিতে পার।' আমি তিন-চারি মাসের মধ্যেই সংগীতশিক্ষায় উন্নতি দেখাইলাম। কীর্তন শিখিতে কিছু দেরি হইল।

ছলনা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে লোক চিনিবার বিদ্যাও শিখিতে হইয়াছিল। কে চুরির মতলবে আসিয়াছে, কে কুৎসিত রোগাক্রান্ত, কে দুষ্ট প্রকৃতির লোক, কে ভালমানুষ ও সরলচিত্ত, এ সকল আমাদিগকে মুখ দেখিয়া ধরিতে হয়। অনেক সময় বিপদেও পড়িয়াছি। একদল লোক আছে তাহারা বেশ্যাবাড়িতে ডাকাতি করিয়া বেড়ায়। কখনও কখনও বেশ্যাকে হত্যাও করিয়া থাকে। এমনিভাবে প্রাণটি হাতে লইয়া পতিতা নারীকে ব্যবসা করিতে হয়। দু-পাঁচ টাকার জন্য কোনো নারী একেবারে অপরিচিত পুরুষকে গ্রহণ করে—হয়ত সেই বিশ্বাসঘাতক স্ত্রীলোকটির বুকে ছুরি বসাইয়া তাহার গহনাপত্র লইয়া পলায়ন করিল। হতভাগিনী আর চক্ষু মেলিল না। পতিতারা পাপের শাস্তি এইরূপেও হাতে হাতে পায়।

আমার ঘরে একটি ভদ্রলোক আসিতেন। তিনি কলিকাতার একজন ভাল চিকিৎসক। আজ পর্যন্ত তিনি নাকি বিবাহ করেন নাই। তাঁহার নিকট আমি অনেক উপকার পাইয়াছি। আমার শরীর যাহাতে শীঘ্র সারে, সেই জন্য তিনি খুব ভাল ভাল ঔষধ আমাকে দিয়াছিলেন। চিকিৎসাতেও তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। তাঁহার মত একজন চিকিৎসককে এত বেশি টাকা দর্শনী দিয়া আনানো আমার পক্ষে অসম্ভব। তিনি যেদিন দুইতিন ঘণ্টা আমার ঘরে বসিতেন, সেদিন আমাকে দশ-বিশ টাকা দিতেন। কখনও কখনও সন্ধ্যার পরে আমাকে মোটরে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন—গ্র্যাণ্ড হোটেল, গঙ্গার ধারে, অথবা

ইডেন গার্ডেনে বেড়াইয়া আমরা অধিক রাত্রিতে বাড়ি ফিরিতাম, সেদিন আমি ৫০ টাকা পাইতাম। তাঁহার অনুগ্রহে আমার মাসে প্রায় দুই শত টাকা উপার্জন হইত।

রানিমাসি আমাকে সাবধান করিয়া বলিল, 'মা, রোজগার যা পারো এইবেলা করে নাও। শেষবয়সের কথা মনে রেখো। এখন থেকে কিছু না জমাতে পারলে ভবিষ্যৎ জীবনে কষ্ট পাবে। দেখছ ত এ পথে বন্ধুবান্ধব কেহই নাই। একমাত্র টাকাই সব।' আমি এই চিকিৎসক মহাশয়ের অনুগ্রহ পাইয়া অন্য দিকে রোজগারে একটু ঢিলা দিয়াছিলাম। রানিমাসি বুঝিয়াছিল, এই বাবু চিরদিন থাকিবেন না। তার অনুমান মিথ্যা হয় নাই।

সেই বৎসর আশ্বিন মাসে পূর্ববঙ্গে ভীষণ ঝড়-তুফান হয় [১৯১৫ সালে]। তাহাতে বহু লোকের প্রাণনাশ ঘটে। লোকের ঘরবাড়ি, বাগান, শস্যক্ষেত্র সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। তাহাদের দুর্দশামোচনের জন্য কলিকাতায় এক সাহায্যভাণ্ডার খোলা হয়। বিখ্যাত ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী[১৫] ও চিত্তরঞ্জন দাশ (উভয়ই এখন পরলোকে) এই সৎকার্যে অগ্রণী হন। তাঁহাদের চেষ্টায় বহু-সহস্র টাকা সংগৃহীত হইতে থাকে। যুবকেরা রাস্তায় রাস্তায় গান গাহিয়া ভিক্ষা করিত। বেশ্যাপল্লীতেও তাহারা আসিল। আমরাও সেই সাহায্যভাণ্ডারে যথাসাধ্য অর্থ দিয়াছি।

একদিন আমার সেই চিকিৎসক বাবু আমাকে বলিলেন, 'মানী, তোমরা পতিতা নারীরা মিলে যদি কিছু চাঁদা তুলে ওই ইষ্টবেঙ্গল সাইক্লোন ফাণ্ডে পাঠাও, মিঃ সি. আর. দাশ তাহলে বিশেষ সন্তুষ্ট হবেন। তাঁর ইচ্ছা, এই সৎকার্যের জন্য সমাজের সকল স্তরেই সাড়া পড়ুক। কি বল, পারবে?'

আমি বলিলাম, 'দেখুন, আমি তো এ পথে নূতন। সকলের সঙ্গে চেনাশুনা নাই। আপনি ভরসা দিলে আমার যতদূর সাধ্য করব।' তিনি বলিলেন, 'রামবাগান, সোনাগাছি, ফুলবাগানে আমার জানাশুনা আরও কয়েকজন মেয়েমানুষ আছে, থিয়েটারের অভিনেত্রীদেরও এর মধ্যে আনা যায়।'

চিকিৎসক মহাশয়ের সঙ্গে নাকি মিঃ সি. আর. দাশের পরিচয় ছিল, তাঁহার ও কতিপয় বন্ধুর চেষ্টায় কলিকাতার বেশ্যাপল্লী হইতে কয়েক সহস্র টাকা চাঁদা উঠিল। জনসাধারণের কার্যে এই আমার প্রথম যোগদান। এই সুযোগে আমি মিঃ সি. আর. দাশকে প্রথম স্পর্শ করিয়াছিলাম। আমরা যখন প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ে টাকার তোড়া রাখিলাম, তখন আনন্দাশ্রুতে তাঁহার বক্ষ প্লাবিত হইল। তিনি আমাদের মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। বুঝিলাম তিনি সত্যই দেশবন্ধু।

রাজবালার সহিত একদিন দেখা করিতে গিয়া দেখি, তাহার ঘরে খুব ভাল দামি আসবাবপত্র আসিয়াছে। একখানা পালঙ্ক, দেওয়াল আয়না, বুক্‌কেস এই সব জিনিসে ঘর সাজানো রহিয়াছে। বিছানার জন্য গদি তৈয়ার হইয়াছে। তাহার গায়ে নতুন গহনাও দেখিলাম। রানিমাসির টাকা সে পরিশোধ করিয়াছে ; তাহার নিজের হাতে কিছু নগদ টাকাও জমিয়াছে। খোলার ঘরে থাকিয়া বেশ্যাদের এত অর্থ উপার্জন হয়, আমার পূর্বে

ধারণা ছিল না। আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাজবালা কহিল, 'নানাপ্রকার লোক বেশ্যালয়ে আসে। যাহারা ধনী জমিদারের ছেলে তাহারা বন্ধুবান্ধব লইয়া প্রকাশ্যে বেশ্যাদের নিকটে যায়। লোকলজ্জাভয় ইহাদের নাই। ইহারা মদ্যপান, গান-বাজনা প্রভৃতি আমোদপ্রমোদে লিপ্ত হয়। ছোটখাট খোলার ঘরে ইহাদের পদার্পণ হয় না। রামাবাগান—সোনাগাছিই তাহাদের প্রধান তীর্থক্ষেত্র। আর-এক দল লম্পট আছে, যাহারা সমাজের নিন্দার ভয় করে, যাহারা উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বলিয়া সম্মানিত, তাহারা একাকী গোপনে বেশ্যাগৃহে আসে। কেবলমাত্র তাড়নাই ইহাদের আসিবার কারণ। গান বাজনা বা অপর কোনো আমোদপ্রমোদ ইহারা চাহে না। লুকাইয়া লুকাইয়া ইহারা চলিয়া যায়, এদিকে লোকসমাজেও নিজেদের মানমর্যাদা ও সুনাম রক্ষা করে। কবি, সাহিত্যিক, সমাজসংস্কারক, নামজাদা উকিল, স্কুলের মাস্টার, কলেজের প্রফেসার, রাজনীতিক নেতা-উপনেতা, গভর্নমেণ্ট অফিসের বড় কর্মচারী, ব্রাহ্ম, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, বিদ্যাভূষণ, তর্কবাগীশ-প্রভৃতি উপাধিধারী অধ্যাপক, পুরোহিত, মোহান্ত, গুরুগিরি-ব্যবসায়ী এইসকল লোক এই শ্রেণির। আমার ঘরে একজন হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল আসেন। তিনি অতি উচ্চবংশীয় ভদ্রসন্তান।

তাঁহার নাম শ্রী...। বয়স একটু বেশি। তিনি আমাকে অনেক টাকা দেন। আমি সেই বাবুকে একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলাম, 'তুমি হাইকোর্টের উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে।' আমার সেই কথা ফলে গেছে। তিনি সত্যসত্যই হাইকোর্টে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি খুশি হয়ে আমায় এইসব জিনিসপত্র কিনে দিয়েছেন। আমার এই দামি আংটিটা তাঁহারই উপহার।'

রাজবালার সহিত কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা অতীত হইল। আমি চলিয়া আসিব বলিয়া উঠিয়াছি এমন সময় একজন লোক রাজবালার ঘরে প্রবেশ করিল।' রাজবালা সেই লোকটিকে আদর-অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। আমি বাহিরে আসিয়া অস্ফুট স্বরে রাজবালাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ইনি কে? এঁকে ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মত দেখাচ্ছে। রাজবালা বলিল, 'ইনি আমার এক বাবু। খুব বড় অধ্যাপক। ইনি মহামহোপাধ্যায় উপাধিধারী পণ্ডিত। ইনি আজকাল আমায় নিয়ে খুব মজেছেন। তবে শুনেছি এঁর একটা দোষ আছে—নিত্য নূতন চাই। বেশ্যামহলে ইনি সুপরিচিত। খোলার ঘরেই এঁর যাতায়াত বেশি। আমি যত দূর পারি কসে আদায় করে নিচ্ছি, কি জানি আবার কোন দিন সরে পড়বে।'

কিছুদিন পূর্বে কালিদাসী হাড়কাটা-গলির বাড়ি ছাড়িয়া রামবাগানে উঠিয়া গিয়াছে। সে একজন ধনবান ভাটিয়া সওদাগরের নজরে পড়িয়াছিল। একদিন কালিদাসীর নতুন বাড়িতে যাইয়া দেখি তার অতুল ঐশ্বর্য হইয়াছে। তেতলায় দুখানি বৃহৎ ঘর, একখানি বসবার একখানি শোবার। ইলেকট্রিক লাইট, পাখা, পালঙ্ক, বুক্‌কেস, বৃহৎ আয়না, ছবি, মার্বেল-পাথরের টেবিল, মেজেতে লিনোলিয়াম পাতা, শুভ্র ফরসা-বিছানা কোমল

তাকিয়ায় শোভিত, রুপার পানের থালা, অ্যাস্‌ট্রে। কৃষ্ণনগরের সুন্দর মাটির পুতুলে আলমারি সাজান। তিনসেট্ জড়োয়া গহনা—দুই সেট্ তোলা, এক সেট্ গায়ে। দামি বেনারসি শাড়ি ও ব্লাউজ তাহার বেড়াইবার পোশাক ; শান্তিপুর ফরাসডাঙ্গার দেশি শাড়ি তাহার আটপৌরে কাপড়। তাহার ভাটিয়া বাবু তাহাকে মাসিক ৩০০ টাকা নগদ দিত। এতদ্ব্যতীত ঘর ভাড়া ও খাওয়াপরার খরচ চালাইত।

কালিদাসীর এই সৌভাগ্য আলাদিনের প্রদীপের মত দুই-তিন মাসের মধ্যে হইয়াছে। আমি দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। কি উজ্জ্বল আশার আলোক আমি সম্মুখে দেখিতে পাইলাম। কোন শয়তান আমার অন্তরের মধ্যে বার বার জাগিয়া বলিতে লাগিল, 'এমন সৌভাগ্য তোমারও হতে পারে।' আমি সেই আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিলাম।

পূর্বেই বলিয়াছি কালিদাসী রূপসী ছিল। এখন ভালভাবে থাকিবার ফলে তাহার সৌন্দর্য আরও ফুটিয়া বাহির হইল। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে হলেও কালিদাসী গান জানিত। আমিও তাকে কিছু শিখাইয়াছিলাম। এ বাড়িতে তাহার এক মা জুটিয়াছে। কালিদাসী বলিল এই স্ত্রীলোকটিই তাহাকে এই ভাটিয়া বাবু যোগাড় করিয়া দিয়া হাড়কাটা গলি হইতে রামবাগানে আনিয়াছে। কালিদাসী আমাকেও ঐ পাড়ায় যাইতে পরামর্শ দিল। আমি সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম।

রানিমাসির পাওনা আমি প্রায় শোধ করিয়াছিলাম, আমার আর কোনো ঋণ ছিল না। ঘরের জিনিসপত্র চলনসই রকম হইয়াছে। এই সময়ে আমার সঙ্গে একজন ভদ্রলোকের পরিচয় হয়। তিনি ব্রাহ্মণ যুবক, কোনো ব্যাঙ্কের বিশিষ্ট কর্মচারী ছিলেন। তাঁহার নাম শ্রী.... পাধ্যায়। দুই-তিন দিন আমার ঘরে আসিয়া তিনি আমার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। আমার গানই তাঁহাকে বিশেষরূপে মুগ্ধ করিল।

তিনি আমাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। তিনি বলিলেন, 'আমি তোমাকে একটু উঁচু স্টাইলে রাখতে চাই। হাড়কাটা গলিটা অতি অভদ্রের জায়গা, এখানে যত ছোটলোকদের আমদানি।' আমি মনে মনে কহিলাম, 'হায় রে, বেশ্যার আবার ভদ্রাভদ্র বিচার। পতিতার উচ্চনীচ স্তরবিভাগ—এদেরও জাতিভেদ। এখনই অন্য স্থানে উঠিয়া গেলে আমার চিকিৎসক বাবুটিকে হারাইব এই ভাবিয়া আমি সম্মত হইলাম না। প্রকৃত কথা গোপন করিয়া বলিলাম, 'আমার দেনাপত্র আছে, বাড়িওয়ালিও কিছু টাকা পাবে, উঠতে হলে দু-চার মাস পরে উঠা যাবে।'

এই ব্যাঙ্কের কর্মচারী মাঝে মাঝে আমার গৃহে রাত্রিযাপন করিতেন। তাঁহার সঙ্গে দুই-একজন বন্ধুবান্ধবও আসিত। কেহ সামান্য পরিমাণে মদ খাইতেন। তবে নিতান্ত মাতাল কেহ ছিলেন না। আমি কখনও কখনও লুচি, পরোটা, মাছ, মাংস—প্রভৃতি সুখাদ্য প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইতাম। এইরূপে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইল। আমার এই বাবুটির খুব পান খাওয়া অভ্যাস ছিল। সোনালি-রুপালি তবক দেওয়া দামি পান সর্বদা তিনি খাইতেন। তিনি বড় শৌখিন পুরুষ ছিলেন। ব্যাঙ্কের বিশিষ্ট কর্মচারী বলিয়া তিনি

একখানি সুন্দর বৃহৎ মোটরগাড়ি পাইয়াছিলেন। তাহাতে চড়িয়া তিনি আমার গৃহে আসিতেন। আমরা তাঁহার মোটরে অনেকবার বেড়াইয়াছি।

আমি কিছু দিন দুই দিক রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাহা হইয়া উঠিল না। আমার চিকিৎসক বাবু বুঝিতে পারিলেন যে, আমি অন্য প্রণয়ীর হাতে পড়িয়াছি। তিনি ক্রমশ কম আসিতে লাগিলেন। শেষে আসা একদিন বন্ধ করিলেন। আমার...পাধ্যায় বাবু সর্বদাই আমাকে এ পাড়া ছাড়িয়া যাইতে বলিতেন। আমার দেনাপত্র শোধ করিবার নাম করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পাঁচশত টাকা নগদ আদায় করিলাম। আর নূতন বাড়িতে যাইয়া বসিতে আরও অতিরিক্ত দুই শত টাকা লাগিবে, বলিলাম। তিনি সেই টাকাও দিলেন। আমি রামবাগানে কালিদাসীর বাড়ির নিকটেই একটি বাড়িতে দুখানি ভাল ঘর ভাড়া লইলাম।

আমার সেই চিকিৎসক বাবুটি এক্ষণে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। পূর্বেই বলিয়াছি তিনি তখন পর্যন্ত বিবাহ করেন নাই। পতিতার ব্যবসায় প্রথম আরম্ভ করিয়া আমি অবিবাহিত যুবকদিগকেই একটু বেশি পছন্দ করিতাম। আমার বিশ্বাস ছিল, গৃহে তাহাদের পত্নী আকর্ষণ না থাকাতে তাহারা পতিতার প্রতি বেশি আসক্ত হইবে। কিন্তু এই দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় আমার সেই ভ্রান্তি দূর হইয়াছে। আমি দেখিয়াছি, যাহারা নিজের স্ত্রীকে ভালবাসে তাহারা নিজের রক্ষিতা নারীকেও ভালবাসে। অবিবাহিত যুবকেরা প্রায়ই চঞ্চলচিত্ত এবং তাহারা কাহারো উপর নিজের মনকে স্থিরভাবে বসাইতে পারে না।

আমার চিকিৎসক বাবুটি আমাকে ছাড়িয়া অনেক নারীর প্রতি আসক্ত হইয়াছেন, সে সংবাদও আমি শুনিয়াছি। এমন কি গৃহস্থের ঘরেও নাকি কেলেঙ্কারি ঘটাইয়াছেন। খবরের কাগজে সেই ইঙ্গিত দিয়াছে। সত্যমিথ্যা ভগবান জানেন।

রামবাগানে আসিয়া আমার সুখে-স্বচ্ছন্দে কাল কাটিতে লাগিল। কিন্তু আমার একটা দুঃখ মাঝে মাঝে প্রাণে জাগিয়া উঠিত। মুকুলদা অথবা কমলার কোনো সংবাদ পাইতাম না। পিতা, মাতুল বা নন্দদাদা—ইহাদের দেখা পাইতে আমার ভয় হইত, দেখা না হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু কমলা মুকুলদা এই দুইজন ত আমার পাপজীবনের গতির সূচনা জানে। সুতরাং তাহাদের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইত। পতিতার জীবন কিরূপ বিপদগ্রস্ত তাহা এই অল্পসময়েই আমি বুঝিয়াছি। আর সকলে আমায় ঘৃণা করে করুক, পায়ে ঠেলিয়া ফেলে ফেলুক—মুকুলদা ও কমলা কখনও আমায় পরিত্যাগ করিতে পারিবে না, এ বিশ্বাস আমার দৃঢ় ছিল।

রামবাগানে আসিয়া আমি পড়াশুনায় মন দিলাম, বাবুকে বলিয়া পুস্তক রাখিবার জন্য একটা আলমারি কিনিলাম। বাংলা-ইংরাজি সাহিত্যগ্রন্থাদি তাহাতে সাজাইলাম। বাবু আমার জ্ঞানপিপাসা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। মাসিক সংবাদপত্র 'প্রবাসী' ও 'ভারতবর্ষ' তিনি আমায় কিনিয়া দিতেন। দৈনিক খবরের কাগজ তিনি অফিস হইতেই লইয়া

আসিতেন। আমি তাহা পড়িতাম। গানে, পড়াশুনায়, বাবুর ভালবাসায় আমার মন একপ্রকার সাময়িক স্থিরতা লাভ করিল।

এই সময়ে সাহিত্যক্ষেত্রে একটা যুগান্তর আসিয়াছে—তাহার সহিত আমাদের পতিতাজীবনে নিকটসম্বন্ধ আছে বলিয়া এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। কুলটার চরিত্র লইয়া বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার সমসাময়িক সাহিত্যিকগণ যে চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কুলটার প্রতি ঘৃণার ভাবই বদ্ধমূল হয়। 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'চন্দ্রশেখর' প্রভৃতি উপন্যাসে কুলটার পরিণাম, ভীষণ শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্তই দেখিতে পাই।[১৬] এতাবৎকাল পতিতা নারীর জীবনের এমন দিক দেখানো হইয়াছিল, যাহা দেখিয়া লোক পতিতা নারীর সংস্পর্শে যাইতে ঘৃণা বোধ করে—লজ্জিত হয় ও ভয় পায়। অমৃতলাল বসুর 'তরুবালা' নাটকেও তাহাই দেখানো হইয়াছে। তারপর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কয়েকখানি কুলটার [?] চরিত্রের অপর-এক দিক দেখাইয়াছেন, যাহাতে তাহার প্রতি সহানুভূতি জন্মে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যাহা অস্পষ্ট রাখিয়াছেন, শরৎ [চন্দ্র] চট্টোপাধ্যায় ও নরেশ [চন্দ্র] সেনগুপ্ত[১৭] এবং বহু তরুণ সাহিত্যিক তাহা খুলিয়া দিয়াছেন, যাহাতে লোক তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁহারা বলেন, 'বেশ্যারা অসতী হইতে পারে, কিন্তু তাহারা মনুষ্যত্বের আদর্শহীন নহে। পতিতা নারীও যখন সরলচিত্ত, ধর্মপ্রাণ, ঈশ্বরভক্ত, দয়ার্দ্রহৃদয়, দানশীল হইয়া থাকে, তখন ঘৃণার পাত্র হইবে কেন? দোষ সমাজের, পতিতার নহে।'

এই সকল উপন্যাস ও কথাসাহিত্য তরুণ যুবকযুবতীদের প্রাণে এক অপূর্ব চঞ্চলতা জাগাইয়া তুলিল। তাহারা 'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী'[১৮] পড়িয়া রাজলক্ষ্মীর মত পতিতা নারীর খোঁজ করিতে লাগিল, 'শুভ'[১৯] পড়িয়া 'শুভ সঙ্গিনী'র মত অভিনেত্রীর সন্ধানে বাহির হইল। 'পর পারে'[২০] নাটকের সরযূকে তাহারা পাইতে পাগল হইল। আমার এই দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় বুঝিতে পারিয়াছি, বাংলার তরুণ যুবকের দল ক্রমশ অধিক সংখ্যায় কলুষ সংস্পর্শে আসিতেছে।

পতিতা নারীর জীবনের এই চিত্রকে নব্যসাহিত্যিকের দল রিয়্যালিস্টিক আর্টের অন্তর্গত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই আর্টের দোহাই দিয়া আজকাল সমাজের মধ্যে এক সর্বনাশী বিষ ছড়ানো হইতেছে। কলেজের উচ্চশিক্ষিত যুবকগণ নটের ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছেন, সম্ভ্রান্তবংশীয় জমিদারপুত্র আপন স্ত্রী-কন্যা লইয়া প্রকাশ্যে রঙ্গমঞ্চে সহস্র সহস্র দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে অভিনয় দেখাইতেছেন, পিতামাতা কন্যাদিগকে থিয়েটারের স্টেজে নাচিতে পাঠাইতেছেন, স্বামী স্বকর্ণে শুনিতেছেন তাঁহার স্ত্রী অভিনয়চ্ছলে অপরের সহিত প্রেম করিতেছেন, পিতা দেখিতেছেন কুমারী কন্যা রঙ্গমঞ্চে প্রেমের ছলাকলা শিখিতেছে। যিনি বিশ্বকবির উচ্চ আসন পাইয়াছেন, যাঁহার কাছে জগৎ আদর্শের প্রত্যাশা করে, তিনি থিয়েটারে যাইয়া নটীদের গানের মহলা দেখাইতেছেন।[২১] যে ব্রাহ্মসমাজের কাছে দেশ উচ্চ সুনীতির আদর্শ পাইতে চায়, তাহারাও আর্টের নেশায় মজিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়[২২], লেডী অবলা বসু[২৩], শ্রীযুক্তা কামিনী রায়[২৪], মিসেস বি. এল.

চৌধুরী, সরলা দেবী—ইঁহাদের মত লোকও ভদ্রঘরের যুবতীদের নৃত্যের সমর্থন করেন। ইহা লইয়া সাময়িক সংবাদপত্রাদিতে বহু বাদপ্রতিবাদ হইয়া গিয়াছে, আমি তাহা পাঠ করিয়াছি, আর জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়াছি।

আমার আত্মচরিত লিখিতে যাইয়া এত কথা বলিবার প্রয়োজন এই যে, আমাদের মত পতিতা নারীর জীবন যে অসংযম ও অসাবধানতার ফল, তাহা সমাজের প্রায় সকল স্তরে প্রবেশ করিতেছে। যাঁহারা সমাজের মঙ্গলচিন্তা করেন, তাঁহাদের দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট হউক, ইহা আমার অভিপ্রায় ও নিবেদন। যে অপরিণামদর্শী যুবকের কুহকে পড়িয়া আজ আমি পতিতা—এইপ্রকার রানি-চুনির প্রেমিকও এইসকল নাচগানের কর্ণধার রূপে আছেন, তাহা কি অভিভাবকগণ খবর রাখেন? নিজে মজিয়াছি বটে কিন্তু সমাজকে মজিতে দেখিলে দুঃখ হয়। আমাদের চুনির বাবু-শিল্পীটি...'সম্মিলনীর' একজন বিশেষ পৃষ্ঠপোষক। চুনির নিকটে এই সম্মিলনীর দুই-একটা অপবাদ শুনিয়াছি। সত্য-মিথ্যা ঠিক না জানায় উল্লেখ করিলাম না।

নব্যসাহিত্যের এই রিয়্যালিস্টিক আর্টের ফল আরও-এক দিকে দেখা দিল। পূর্বে পতিতা নারী সৎকার্যে অর্থদান করিতে চাহিলে অনেকস্থলে তাহা গৃহীত হইত না। এমন কি মফস্সলের ভূম্যধিকারী পতিতার নিকট হইতে ভূমির করও নাকি গ্রহণ করিতেন না। ক্রমশ এইভাব দূর হইতে লাগিল। এ বিষয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অতি উদারহৃদয় ছিলেন। জনসাধারণের হিতকর কার্যে তিনি শুধু পতিতার দান গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, পতিতাদিগকে তিনি দেশহিতকর কার্যে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু আমাদের মত নীচ দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য সাধিত হইল না। ১৯১৮ সালের পর হইতে তাঁহার হস্তে ক্রমশ দেশের নেতৃত্বভার আসিতে থাকে। এদিকে নব্যসাহিত্যও পতিতাদিগের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল। সুতরাং আমরা প্রকাশ্যে ভদ্রসমাজে মিশিবার একটা সুযোগ পাইলাম। ইহার ফল কি হইল, তাহা যথাস্থানে বিবৃত করিব।

জনসাধারণের হিতসাধন সম্বন্ধীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে প্রকাশ্যভাবে যোগদান করিবার বিষয় বলিবার পূর্বে আমার জীবনের আর দুই-একটা ঘটনা উল্লেখ করিয়া এ অধ্যায় শেষ করিতেছি।

আমাদের বাড়িতে একজন স্ত্রীলোক একখানি ঘর ভাড়া লইল। সে সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল। কিছুদিনের মধ্যে আমি তাহার অন্তরের সমস্ত কথা অবগত হইলাম। এই স্ত্রীলোকটি দরিদ্র কায়স্থ ঘরের বিধবা। তাহার গুরু শ্রী...বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহার সর্বনাশ করিয়াছেন। তিনি এখন আর কাছে ঘেঁসেন না। স্ত্রীলোকটি কলঙ্কের ভয়ে কোথাও আশ্রয় না পাইয়া বেশ্যাপল্লীতে আসিতে বাধ্য হইয়াছে। কারণ এই স্থান সকল কলঙ্ক ও পাপের ভাণ্ডার। আমি এই হতভাগিনীকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলাম।

আমার পরামর্শে স্ত্রীলোকটি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকটে চিঠি লিখিল। সৌভাগ্যক্রমে কিছুদিন পরে বিদ্যাভূষণ মহাশয় আসিলেন। আমি নানা ছলে তাঁহার সহিত পরিচয়

করিলাম। এ বিষয়ে আমার ব্যাঙ্কের বাবুটির নিকট প্রয়োজনমত উপদেশ লইয়াছি। একদিন আমি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট বিনয়ের সহিত অনুরোধ করিয়া বলিলাম, 'দেখুন, এ বেচারি এখন দুঃসময়ে পড়েছে, আপনি যদি পরিত্যাগ করেন এর উপায় কি হবে?' কিন্তু তিনি আমার কথা উপেক্ষা করিলেন। তখন আমি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলাম, 'মহাশয়, আমরা পতিতা নারী—আপনাদের ঘৃণিতা, আর আপনি সমাজের কর্তা, আজ আমার কাছ থেকে আপনি তিরস্কার শুনে যেতে চান কি? ছিঃ, ছিঃ, আপনার লজ্জা হয় না? গুরুগিরি করতে গিয়ে সরলহৃদয় বিধবা শিষ্যাণীর সতীত্ব নষ্ট করেছেন, দরিদ্রকে কলঙ্কে ডুবিয়েছেন। আপনি না স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, আপনি না অধ্যাপনা করে থাকেন? আপনার পাণ্ডিত্যে ধিক্—আপনার শাস্ত্রজ্ঞানে শত ধিক্। আমরা মহাপাপী বারবনিতা, আমরা নরকে যাব, ইহা সত্য—আপনারা নরকে যাবেন না কেন জানেন? আপনাদের জন্য এত বড় নরককুণ্ড এখনও তৈরি হয় নি।' আমার কথা শুনিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় চুপ করিয়া রহিলেন। আমি না থামিয়া, তাঁর মুখের কাছে তর্জনি হেলাইয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলাম, 'আপনি যেতে চান চলে যান। কিন্তু জানবেন আমি একে দিয়ে আদালতে নালিশ করে আপনার কাছ থেকে খোরপোশ আদায় করে ছাড়ব। জানি, আপনি অস্বীকার করতে পারেন। কিন্তু আমরা এ বাড়ির সকলে সাক্ষ্য দিব যে আপনি এর ঘরে আসতেন এবং আপনার দ্বারা এর গর্ভসঞ্চার হয়েছে। আমরা তো কতই মিথ্যা বলি—যাতে একজন নির্দোষ নারীর উপকার হয়, যাতে এক শঠ লম্পটের শাস্তি হয়, সেইরূপ মিথ্যা বলতে আমাদের জিহ্বায় আটকাবে না।'

বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিশেষ-কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন, বুঝিলাম তিনি ভয় পাইয়াছেন। কয়েকদিন পরে তিনি আসিয়া আমার হাতে একশত টাকা দিয়া বলিলেন, 'এর জন্য যা কিছু খরচ প্রয়োজন হয়, এই টাকা থেকে করবে'। আমি তাহা গ্রহণ করিলাম এবং স্ত্রীলোকটির প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যোগাড় করিয়া দিলাম। যথাসময়ে ইহার প্রসব হইল। বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রসূতি ও সন্তানকে আমাদের বাড়ি হইতে সরাইয়া নিলেন। তারপর খবর লইয়া জানিয়াছিলাম, তিনি বিধবাটিকে বিশেষ অর্থসাহায্য করেন নাই। এই লোকটির দুশ্চরিত্রের কথা অনেকেই জানিত। আরও কয়েকটি শিষ্যাণীর সর্বনাশ তিনি করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার চাকুরিস্থলে বেনামি চিঠিতে সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলাম। এমন সর্বনেশে লোকের শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। পরে শুনিয়াছিলাম, তাঁহার ভাল ভাল চাকুরি সব গিয়াছে। সংবাদ পাইলাম, তিনি নাকি বৃদ্ধ বয়সে [একটি] ষোড়শীবালার পানি গ্রহণ করিয়া তাঁহার অন্তরের যৌবনক্ষুধা মিটাইতেছেন। সমাজের যে অংশ ছাড়িয়া আসিয়াছি, তাহার এমন গলিত ক্ষত দেখিয়া পতিতাদেরও ঘৃণায় নাক সিঁটকাইতে হয়।

আমাদের বাড়ির নিকটে সুশীলা নাম্নী এক বারবনিতা বাস করিত। সে এক নবাবের রক্ষিতা। তার বিপুল সম্পত্তি, অতুল ঐশ্বর্য। উহা আর বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। নবাব বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া তাঁহার রাজধানীতে বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু

তাহাতে তিনি থাকেন না। রাজধানী ছাড়িয়া কলিকাতায় এই রক্ষিতা বারনারীর নিকটেই অবস্থান করেন। এদিকে তাঁর সোনার পুরী শিয়াল-কুকুরের আবাসস্থল হইতেছে, প্রজাগণের দুর্দশার একশেষ, সুব্যবস্থা ও শাসনের অভাবে ঋণের পরিমাণ দিন দিন বাড়িতেছে। গরিব্ প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া তাহা নটীর পূজায় ব্যয় করিতেছেন। নবাব-বাদশার মত লোক পতিতার প্রেমে মজিবে, ইহাতে নূতনত্ব নাই। তবে একথা এখানে উল্লেখ করিলাম কেন তাহার কারণ আছে ; সুশীলার ঘরে যাইয়া প্রায়ই দেখিতাম নবাবের রাজধানী হইতে বহুমূল্য আসবাবপত্র, ছবি, পর্দা, হিরা-জহরত, আয়না, গজদন্তের কারুকার্যখচিত দ্রব্য—এ সমস্ত আসিতেছে। ইহার কোনো-কোনোটি বিক্রয় করা হইত—কোনোটি বা সুশীলার ঘরেই শোভা পাইত। এই সকল দ্রব্য নবাবের পূর্ব পুরুষগণের কীর্তিচিহ্নস্বরূপ, রাজধানীর পুরাতন প্রাসাদে সজ্জিত ছিল। ঐতিহাসিক কীর্তিদর্শনার্থীরা তাহা দেখিয়া অতীত গৌরবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত। একটা তুচ্ছ বেশ্যার মনস্তুষ্টির জন্য এই কীর্তিচিহ্নসমূহ কি মূর্খের মত ধ্বংস করা হইতেছে, তাহা ভাবিয়া আমি দুঃখ করিতাম। যাহারা পূর্বপুরুষের প্রতি এমন শ্রদ্ধাহীন, তাহারা পরাধীন হইবে না ত হইবে কে?

সুশীলার বেড়াইবার জন্য মোটর গাড়ি ক্রয় করা হইয়াছে। সুশীলা নবাবের প্রধানা বেগমের চেয়ে অধিক ঐশ্বর্য, অধিক আদরযত্নে আছে। নবাব ঋণ করিয়া, মণিমুক্তাদি বন্ধক রাখিয়া সুশীলার এক হাজার টাকা মাসোহারা জোগাইতেছেন। ঋণের দায়ে নবাব-বাহাদুর মামলাতে জড়িত হইয়া কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; শৈলশৃঙ্গে বজ্রাঘাত পড়িল।

আমি পতিতা নারী হইলেও রাজনৈতিক সংবাদ লইয়া থাকি। আজকাল যাঁহারা স্বাধীনতার কথা তুলিয়াছেন, তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, এদেশের নবাব-বাদশার বংশধরেরা যদি স্বাধীনতার প্রিয় স্মৃতিচিহ্নসমূহ এমনি নির্মম হৃদয়ে পতিতার কলুষিত প্রেমানলশিখায় আহুতি দেয়, যদি পূর্বপুরুষের হাতের জিনিসের চেয়ে বেশ্যার বিলোল কটাক্ষের মূল্য বেশি হয়, তবে স্বাধীনতার আশা কোথায়? অপবিত্র আবর্জনার স্তূপে স্বাধীনতার বিশাল বোধিদ্রুমের জন্ম হয় না।

অষ্টম

অগ্নিক্রীড়া

১৯২০ সালে সমগ্র ভারতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়। বাংলাদেশে উহার পরিচালনভার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন গ্রহণ করেন। ছাত্রগণ স্কুল-কলেজ ছাড়িবে, উকিল-ব্যারিস্টার আইনব্যবসায় পরিত্যাগ করিবেন, কেহ কাউন্সিলে যাইবে না—গভর্নমেণ্টের উপাধি বর্জন করা হইবে, বিদেশি দ্রব্য কেহ কিনিবে না ; এই পাঁচ

বকমের বয়কট সেই অসহযোগ-নীতির মূলমন্ত্র ছিল। ইহার প্রচারের জন্য সমস্ত দেশে, গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সভা-সমিতি-বক্তৃতা-পিকেটিং, অর্থাৎ বিরোধকারীদিগকে বাধা দেওয়া চলিতে লাগিল, যুবকেরা স্বেচ্ছাসেবাদল গঠন করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কর্মী চাই—কর্মী চাই—এই রব উঠিল।

ভদ্রমহিলাগণও পুরুষের সহিত কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহধর্মিণী পূজনীয়া শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী তাঁহাদেব নেত্রীর পদ গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সহধর্মী মহিলাদের মধ্যে উর্মিলা দেবী, সুনীতি দেবী, সন্তোষকুমারী দাশগুপ্তা, মোহিনী দেবী, হেমপ্রভা মজুমদার, বগলা সোম, উমা দেবী[২৫] ইহাঁদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পল্লীগ্রাম ও মফস্‌সল হইতেও বহু সংখ্যক মহিলাকর্মী আসিতে লাগিল। সে কি উৎসাহ, কি উদ্দীপনা, কি এক অপূর্ব কর্মচঞ্চলতা দেখিয়াছিলাম। এই সকল মহিলাকর্মীদিগকে সংঘবদ্ধ করিবার নিমিত্ত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন নারীকর্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন।[২৬] ইহার সম্বন্ধে পরে বলিব।

পুলিশ চারিদিকে খুব ধরপাকড় আরম্ভ করিল। মহিলাকর্মীরাও পুলিশের হাতে নিস্তার পান নাই। আমরা কয়েকজন পতিতা নারী মিলিয়া একটা ছোট দল গঠন করিলাম। আমাদের বাবুগণ পশ্চাতে থাকিয়া আমাদিগকে পরামর্শ ও উৎসাহ দিতেন। ইতিপূর্বে ইস্টবেঙ্গল সাইক্লোন ফাণ্ডের জন্য চাঁদা তুলিতে যাইয়া আমরা বাহিরের ভদ্র লোকদের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছি। তাহাতে আমাদের সাহস, চতুরতা ও দক্ষতা বাড়িয়াছিল। অনেক ছোট-বড় দেশনেতার সহিত পরিচয় হইয়াছিল। এবার যখন আমরা পুনরায় কার্যক্ষেত্রে নামিলাম, তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহকর্মীরা অতিশয় সুখী হইলেন এবং আমাদিগকে বিবিধপ্রকারে সাহায্য করিলেন।

এই অসহযোগ আন্দোলনের উত্তেজনা এত তীব্র ও প্রবল হইয়া উঠিল যে, একসঙ্গে সকলে কাজ করিবার সময় মনে থাকিত না যে আমরা অস্পৃশ্য ঘৃণিত বেশ্যা, আর ইহারা সম্মানিত ভদ্রগৃহস্থ যুবক। সেই কর্মী যুবকেরাও ভুলিয়া যাইত যে তাহারা বারবনিতার সহিত চলাফেরা করিতেছে। যে সকল পবিত্রচরিত্র ব্যক্তি কখনও বেশ্যালয়ে আসেন নাই বা আসিবার কল্পনাও করেন নাই, তাঁহাদের সঙ্গে আমরা এই অসহযোগ আন্দোলনের নেশায় মাতিয়া এক-মোটরগাড়িতে বেড়াইয়াছি, হাস্য পরিহাসের সহিত তাঁহাদের সঙ্গে কথাও বলিয়াছি। সকলে আমাদের স্বার্থত্যাগের প্রশংসা করিতেন, গর্বের আনন্দে আমাদের বুক ফুলিয়া উঠিত।

একদিন কর্মশেষে গৃহে ফিরিবার পূর্বে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নিকট বিদায় লইবার সময় তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি স্নেহভরে আমাদের আশীর্বাদ করিলেন। একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি সেই স্থানে বসিয়াছিলেন। আর কেহ ছিলেন না। আমরা যে বারবনিতার দল, তাহা তিনি বুঝিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'শেষকালে এরাও এসে কাজে নেমেছে—এটা কি ভাল হচ্ছে মিঃ দাশ?' চিত্তরঞ্জন শ্লেষের সহিত উত্তর করিলেন, 'আপনারা হলেন রুচিবাগীশের দল। আমার সঙ্গে আপনাদের মিলবে না। সঞ্জীবনী-সম্পাদক

কেষ্ট মিত্তিরের কাছে যান। তিনি আপনাদের মনের মত লোক। কেশব সেনের সংকীর্ণতা[২১] থেকে মুক্ত হয়ে উদার মত অবলম্বন করার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি হল ; কিন্তু শেষে উহারই মধ্যে ক্ষুদ্রতা দেখা দিল। কূপের মত এতটুকু হলে হবে না—সমুদ্রের মত প্রশস্ত বিশাল হয়ে সকলকে গ্রহণ করা চাই। পাশ্চাত্য দেশে কি দেখছেন? আমাদেরও তাই করতে হবে। যাদের ঘৃণায় দূরে ঠেলে রেখেছি, তারাই আজ এগিয়ে আসছে। এ শুভলক্ষণ, আমি আস্তাকুড়ের আবর্জনায় এক অপূর্ব শক্তির সন্ধান পেয়েছি।'

আমরা চলিয়া আসিলাম। তাঁহার [তাঁহাদের] তর্কবিতর্ক কতদূর চলিয়াছিল জানি না। কিন্তু আজ দেখিতেছি, আমরা দেশবন্ধুর আশা পূর্ণ করিতে পারি নাই। আমরা সেই মহাপুরুষের সুখের স্বপ্ন ভাঙিয়া দিয়াছি। তিনি মনে করিয়াছিলেন, দেশসেবার অনলে আমাদের সকল পাপ দগ্ধ হইয়া যাইবে। তাহা হইল না। দেশকর্মীদের সহিত বারবনিতাদের এইপ্রকার অবাধ মেলামেশার ফল ভাল হইল না।

আগুন লইয়া খেলা বড় বিপজ্জনক। সকলে তাহা পারে না। আমাদিগকে কর্মক্ষেত্রে আনিয়া দেশনায়কগণ ভুল করিয়াছিলেন। সৎকার্যের অনুষ্ঠানে একটা পবিত্রতার ভিত্তির প্রয়োজন। আমাদের তাহা ছিল না। আমরা শুদ্ধচিত্ত ও সংযত না হইয়াই একটি গুরুতর কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। মিথ্যাচার, প্রতারণা, ছলনা, ইন্দ্রিয়পরতা এই সব হইল বারবনিতাদের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ। দেশের কার্যে ব্রতী হইলেও আমাদের এই সকল দুষ্প্রবৃত্তিই আমাদিগকে পরিচালিত করিল। সুতরাং কথায় যে বলে 'শিব গড়িতে বানর'—আমাদেরও হইল তাহাই।

যে সকল কর্মী যুবকের চরিত্রবল এমন ছিল যে একটা সিগারেট পর্যন্ত কখনও খায় নাই, তাহারা কেহ কেহ এই অসহযোগ আন্দোলনের কর্মক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে মিশিয়া মদ্যপান পর্যন্ত শিখিয়াছে। যে সকল যুবকগণ এমন পবিত্রচিত্ত ছিল যে স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহিবার সময় মাথা তুলিত না—তাহারা আমাদের সংসর্গে আসিয়া এখন বেশ্যা দূরে থাক, কুলবধূর সহিত নির্লজ্জের মত কুৎসিত হাস্যপরিহাস করিতে অনেকে লজ্জিত হয় না। পতিতা নারীদের একটা প্রধান স্বভাব এই যে তাহারা সচ্চরিত্র ও সংযত চিত্ত পুরুষ দেখিলে তাহাকে হস্তগত করিতে বিশেষ চেষ্টা করে এবং তাহার সংযম ও পবিত্রতাকে বিনষ্ট করা একটা বীরত্বের কার্য বলিয়া মনে করে।

আমি জানি, আমরা যে কয়জন এই অসহযোগ আন্দোলনের কার্য করিতে গিয়াছিলাম, তাহারা প্রত্যেকে অনেক দেশকর্মী যুবকদিগকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। আমিও সেই অপরাধ হইতে মুক্ত নহি। এমন কি কেহ কেহ পিতৃতুল্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পারিষদদিগের প্রতিও কটাক্ষ হানিতে ছাড়ে নাই। বাড়িতে ফিরিয়া আমরা এই আলোচনাই করিতাম, কে কয়টা নূতন 'বাবু' জুটাইয়াছে, কার ঘরে কোন্ দেশকর্মী আসিলেন, পরের টাকায় কেমন পান-সিগারেট খাওয়া হইল, মোটর চড়া গেল, ট্যাক্সিভাড়ার টাকা হইতে কে কত টাকা আঁচলে বাঁধিয়াছে, ইত্যাদি।

আমরা যে শুধু যুবকদের অধঃপাতে লইয়া গিয়াছি, তাহা নহে। গৃহস্থ ঘরের কন্যা ও বধূরাও আন্দোলনে যোগ দিয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন। অবশ্য উঁহারা উদার, শিক্ষিত পরিবারেরই বৌ-ঝি। সাধারণত গোঁড়া হিন্দুরা তাঁহাদের অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদিগকে এ-ভাবে বাহিরে যাইতে দেন না। গৃহস্থঘরের যে সকল মহিলা আমাদের সহিত কার্য করিতেন তাঁহাদের কাহারও সহিত নানা কথা প্রসঙ্গে আমাদের আলাপ হইত। আমি জানি, কয়েকটি ভদ্র গৃহস্থের বধূ অসহযোগ আন্দোলন প্রচারের কার্য করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা আর তাঁহাদের স্বামীর নিকট ফিরিয়া যান নাই। কেহ কোনো কার্য আরম্ভ করিয়াছেন, কেহ বা কোনো দেশকর্মীর সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হইয়াছেন, কেহ কেহ স্বামী-স্ত্রী ভাবে বাস করিতেছেন। এই সকল দেশকর্মীর আচরণ সকল লোকই জানে, অথচ তাহারা ভোট দিয়া এইপ্রকার সাধুবেশী লম্পটস্বভাব ব্যক্তিদিগকেই করপোরেশন কাউন্সিলে প্রেরণ করে। সমাজের অন্ধতা এতদূর গভীর।

এই সম্পর্কে একটি কথা বলিতেছি। মফস্‌সলের এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থ যুবকের স্ত্রী অসহযোগ আন্দোলনে মহিলা কর্মীদের সহিত কার্য করিতে আসিয়াছিলেন, এই বধূটি পরমাসুন্দরী—আমি তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাঁহার সহিত আমার একদিন কথাবার্তাও হইয়াছে। এই পুস্তকখানি যদি কখনও তাঁহার হাতে পড়ে, তবে তিনি হয়ত আমাকে চিনিতে পারিবেন। তাঁহার সহিত আমার অল্প পরিচয়েই একটু বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। তাঁহার সম্পর্কিত ঘটনা এখানে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি বলিয়া আমি তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। তিনি যে অধঃপাতে গিয়াছেন, তার জন্য অংশত কে দায়ী, তাহা আমি জানি।

আমার মনে আছে, আমি ব্রাহ্মণ কুলবধূটির সহিত একটু অন্তরঙ্গভাবে নানা ভাবের আলাপ করিয়াছিলাম। তিনি এক দেশকর্মী কায়স্থ যুবকের সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হইয়াছেন। এই যুবকটি উচ্চশিক্ষিত, আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন। আমি প্রথমে একটু আশ্চর্য হইলাম। কারণ, আমার এমন সুন্দরী যুবতী বন্ধুটি যে শেষকালে একটা বাঙাল যুবকের প্রেমে মজিবে তাহা ভাবি নাই। একবার এই ব্রাহ্মণ বধূটি অপর কতিপয় মহিলাকর্মীর সহিত প্রচারকার্য করিবার নিমিত্ত পূর্ববঙ্গে গিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণ-বধূটি নারী-কর্ম-মন্দিরের এক নির্জন কক্ষে ঐ চিরকুমার কর্মীর নিকট গীতা পড়িতেন।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, মফস্‌সল হইতে যে সকল মহিলাকর্মী আসিয়াছিলেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কলিকাতায় তাঁহাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহা হইতেই নারী-কর্ম-মন্দিরের সৃষ্টি হয়। প্রথমে উহা ভবানীপুরে দেশবন্ধুর সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে ছিল। তাঁহার অন্যতম সহকারী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মজুমদার মহাশয়ের[২৮] পত্নী শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার[২৯] যখন কর্মক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা দেখাইলেন, তখন তাঁহার উপরেই নারী-কর্ম-মন্দিরের ভার অর্পিত হয় এবং উহা কলিকাতার সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয়।

সেই ব্রাহ্মণ বধূটি স্বামী ছাড়িয়া আসিবার পর আর গৃহে যান নাই, কলিকাতাতেই থাকেন। নব প্রণয়ীর সহিত অবৈধ সংসর্গের ফলে তাঁহার গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ দেখা যায়।

তখন দেশকর্মী যুবকটি সেই বধূটিকে লইয়া পলায়ন করিলেন। যাঁহারা এই অবৈধ প্রণয়ে বাধা দিয়াছিলেন, তাঁহারা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে এ বিষয়ে জানান। কারণ যুবকটি তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। কিন্তু তিনি ইহার কোনো প্রতিকার করিতে পারেন নাই।

কর্মীদের মধ্যে নারী-পুরুষের এই প্রকার কলুষিত সম্মিলনের অনেক ঘটনা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন জানিতেন। কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন, আর কিছুতেই তাহা প্রতিরোধ করিতে পারিতেছেন না, নীতিহীনতার জন্য চরিত্রবান কয়েকটি বিশিষ্ট কর্মী চলিয়া গেলেন, তখন দুশ্চিন্তায় তাঁহার হৃদয় দমিয়া গেল—দেহ ভাঙিয়া পড়িল—স্বাস্থ্য নষ্ট হইল। অর্থলোভী কর্মীগণ তাঁহার নিকট হইতে অতিরিক্ত অর্থশোষণ করিতে লাগিল, তদুপরি এই দারুণ আঘাত পাইয়া তিনি আর মাথা তুলিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর শবদেহ লইয়া যে বিরাট শোকযাত্রা হইয়াছিল তাহাতে যোগ দিবার জন্য আমাদের পল্লী হইতে পতিতাগণ গিয়াছিল। আমি যাই নাই। কোনো বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলাম, 'দেখুন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে আমরাই মেরেছি। তাঁর অকালমৃত্যুর জন্য আমরাও দায়ী। দেশসেবার ছল করে আমরা তাঁহার কর্মীর দলের স্তরে স্তরে পাপের বিষ ছড়িয়ে দিয়েছি। জীবিত অবস্থায় এইভাবে তাঁকে আমরা আঘাত করেছি। আজ মৃত্যুর স্পর্শে যখন তিনি বিশুদ্ধ হয়ে স্বর্গে চলেছেন, তখন আর আমার মত পতিতার পাপদৃষ্টি যেন তাঁহার পবিত্র মুখের উপরে না পড়ে।' এই ভাবিয়াই আমি দেশবন্ধুকে শেষ দেখা দেখি নাই।

এখন সেই ব্রাহ্মণ বধূটি তাহার প্রণয়ীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী ভাবে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের নাকি সন্তান জন্মিয়াছে। সমাজে তাঁহারা এক প্রকার নিঃসঙ্কোচে চলিতেছেন। ব্রহ্মচর্যব্রতাবলম্বী উচ্চশিক্ষিত (?) দেশকর্মী যুবক এইরূপে পরদার গ্রহণ করিয়া সমাজে মর্যাদা লাভ করিয়াছেন, এখন রাজদরবারেও তাঁহার উচ্চ আসন। হায় সমাজ, পুরুষের বেলায় তুমি অন্ধ!

পিকেটিং করিবার সময় পুলিশ মহিলাকর্মীদের গ্রেপ্তার করিত। একবার শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী ও শ্রীযুক্তা বগলা সোম-প্রভৃতিকে থানায় নিয়া সাবধান করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আমরা পুলিশকে ভয় করিতাম না। কারণ ঘাঁটির পাহারাওয়ালা হইতে পুলিশের উচ্চ কর্মচারী পর্যন্ত সকলের সহিত আমাদের বিশেষ পরিচয় থাকে। আমাদের কয়েকজনকেও পুলিশ ধরিয়া থানায় নিয়াছিল। সেখানে প্রধান কর্মচারী আমাকে দেখিয়াই একটু মুচকি হাসিলেন। দেখিলাম তিনি আমার পরিচিত। বিখ্যাত অভিনেত্রী নীরদাসুন্দরীর[৩০] গৃহে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয়। কলিকাতার মধ্যে সকলেই এই ব্রাহ্মণবংশীয় পুলিশ কর্মচারীকে ভালরূপ জানেন। বলা বাহুল্য, তিনি আমাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে উত্তরবঙ্গে জলপ্লাবন হয়। বন্যাবিধ্বস্ত লোকদের সাহায্যের জন্য কলিকাতায় নানাপ্রকার চাঁদা তোলা হইতে থাকে। ইহার জন্য এক কেন্দ্রীয় সমিতি গঠিত হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান অধিনায়ক হইয়াছিলেন। ছাত্র ও যুবকেরা রাস্তায় রাস্তায় গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, ধনী লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত

হইয়া বহু অর্থ দান করিলেন, থিয়েটার-বায়স্কোপ কোম্পানিব মালিকেরা বেনিফিট নাইট-এর বন্দোবস্ত কবিলেন ; ছোট ছোট ক্লাব ও নানাপ্রকার সমিতি আমোদপ্রমোদের দ্বারা অর্থসংগ্রহ করিলেন, গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতেও সাহায্যের জন্য সামান্য টাকা মঞ্জুর হইল।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় প্রকাশ্য কর্মক্ষেত্রে নামিয়া আমাদের সাহস বাড়িয়াছিল। সুতরাং এই ব্যাপারেও আমরা উদাসীন রহিলাম না। আমাদের দল পূর্ব হইতেই একপ্রকার গঠিত ছিল। তবে এবার উহাকে আরও বড় করিতে হইল। আমরা প্রস্তাব করিলাম, নিজেদের মধ্যে চাঁদা না তুলিয়া দল বাঁধিয়া গান গাহিয়া রাস্তায় ভিক্ষা করিতে হইবে। তদনুসারে হাড়কাটা গলি, রামবাগান, সোনাগাছি, ফুলবাগান, চাঁপাতলা, আহিরীটোলা, জোড়াসাঁকো, সিমলা, কেরানিবাগান—প্রভৃতি বিভিন্ন পল্লীর পতিতাগণ পৃথক পৃথক দল গঠন করিয়া রাস্তায় ভিক্ষা করিতে বাহির হইল।

সে এক অপূর্ব দৃশ্য। কলিকাতার অধিবাসীগণ স্তম্ভিত হইয়া গেল। এক-এক দলে প্রায় ৫০/৬০ জন পতিতা নারী—তাহাদের পরিধানে গেরুয়া রঙের লালপাড় শাড়ি—এ'লো চুল পিঠের উপর ছড়ানো, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, কণ্ঠে মধুর সংগীত, মনোহর চলনভঙ্গি, সঙ্গে কয়েকজন পুরুষ ক্লেরিয়নেট্ ও হারমোনিয়াম বাজাইতেছে। অগ্রে অগ্রে দুইটি নারী একখানি শালুর নিশান ধরিয়া যায়, তাহাতে কোন্ পাড়ার পতিতা নারী সমিতি, তাহা লিখিত আছে। তাহার পশ্চাতে অপর দুই নারী একখানি কাপড় ধরিয়াছে, তাহাতে দাতাগণ টাকা-পয়সা-নোট-প্রভৃতি ফেলিয়া দিতেছে। আর দুইজন স্ত্রীলোক পুরাতন বস্ত্র সংগ্রহ করিতেছে।

বেশ্যাদের মধ্যে অনেকেই যে খুব সুন্দরী তাহা নহে, তবে তাহারা সকলেই নিতান্ত কুৎসিত, একথাও সত্য নয়। যাহা হউক, সাজিয়া বাহির হইলে পতিতা নারীদের সকলকেই সুন্দরী দেখায়। কারণ, ইহার উপরেই তাহাদের ব্যবসার ভিত্তি। রূপ দেখাইয়া জনসাধারণকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য কলিকাতার রাজপথে বেশ্যাদের দাঁড়াইবার নিয়ম নাই। তাহা হইলে তাহাদিগকে পুলিশে বাঁধিয়া নেয়। প্রলুব্ধ করিবার জন্য তাহারা তাহাদের দরজার চৌকাঠের বাহিরে আসিতে পারে না।[৩১] সুতরাং, খাঁটি বেশ্যাপল্লীতেও তিন-চারটি স্ত্রীলোককে কদাচ রাস্তার উপরে এক সঙ্গে দেখা যায়। এমন অবস্থায় যদি বেশ্যারা দল বাঁধিয়া গান গাহিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া চলিতে থাকে, তবে তাহা সাধারণ লোকের চক্ষে কেমন লাগে তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, নিত্য অসংযম ও ভোগলালসার মধ্যে থাকাতে পতিতা নারীদের চরিত্রে কুভাবই প্রবল থাকে। অসহযোগ আন্দোলনে দেশপ্রীতির ভাব, অথবা বন্যাপীড়িতের সাহায্যে ভিক্ষা করার কার্যে দয়ার ভাব পতিতা নারীদের চিত্তকে বিশেষ অধিকার করে নাই। আমরা নিজেদের লোকের সম্মুখে জাহির করিবার একটা সুযোগ পাইয়া তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছি, এই মাত্র। সকলে না হউক, অন্তত অনেকে।

আমরা যখন ভিক্ষা করিতে বাহির হইতাম তখন শত শত লোক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিত।

বন্যাপীড়িত-দুর্দশাগ্রস্ত নরনারীদের দুঃখে কাতর হইয়া সকলেই আমাদের তহবিলে টাকা দিত না ; আমাদের রূপ দেখিয়া, আমাদের গান শুনিয়া, আমাদের কটাক্ষ খাইয়া, তাহারা মুগ্ধ হইয়া টাকা দিয়া যাইত। ছাত্র ও যুবকের দলে এত লোকের ভিড় হইত না।

সকালে ও সন্ধ্যায় দুই বেলাই পতিতা নারীর দল অর্থ সংগ্রহ করিতে বাহির হইত। আমরা বহু সহস্র টাকা পাইয়াছিলাম, কিন্তু নানা অপব্যয় করিবার পর তাহার অংশবিশেষ মাত্র কেন্দ্রীয় সমিতির তহবিলে পৌঁছিয়াছিল। আমরা যাহা কিছু দিয়াছি, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাহাই সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের টাকা লইতে সুনীতিবাদী ব্যক্তিদের আপত্তি ছিল ; কিন্তু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া মত করিলেন।

ক্রমশ আমরা ভদ্র গৃহস্থ পরিবারের যুবক ও কুলবধূদের সহিত মেলামেশা করিবার অধিক সুযোগ পাইতে লাগিলাম। অবশ্য পূর্বে যে তাহা ছিল না এমন নয়। দ্বাদশ গোপাল, তারকেশ্বর, কালীঘাট-প্রভৃতি তীর্থস্থানে ও মেলায় আমাদের অবাধ গতিবিধি ছিল, এখনও আছে। তাহাতেও সমাজের কিছু অবনতি ঘটিতেছে। তবে সে সকল স্থলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্মানুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকে, পতিতা নারীদের সহিত আলাপ-পরিচয় করিবার বিশেষ প্রলোভন অথবা অবসর কাহারও ঘটেনা। কিন্তু এবার অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষ্য করিয়া আমরা যে ভাবে বাহির হইলাম, তাহাতে ভদ্র পুরুষ ও মহিলাদের সহিত আমাদের কথাবার্তা প্রয়োজনবশত অনিবার্যই ছিল। মেলায় অথবা তীর্থস্থলে জনতার মধ্যে পতিতা নারীগণ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে, তাহারা সাধারণের চক্ষে অমন জাজ্বল্যমান হয় না। কিন্তু আমরা ভিক্ষার ছলে অথবা পিকেটিং করিবার জন্য যেমন দলবদ্ধ হইয়া বাহির হইতাম, তাহাতে সর্বসাধারণের মুগ্ধদৃষ্টি আমাদের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া যাইত না।

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের অন্তর্গত আরও কয়েকটি প্রধান বিষয় ছিল—অস্পৃশ্যতা-দূর, চরকা ও খদ্দর। আমাদের পতিতা নারীসমাজে ইহার ফল কিরূপ হইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। অস্পৃশ্যতা-দূর বলিতে মহাত্মা গান্ধী বোধ হয় এই বুঝিয়াছিলেন যে, হাড়ি, মুচি, ডোম, চণ্ডাল, দুলে-বাগদি, সাঁওতাল, দোসাদ প্রভৃতি নিম্নশ্রেণির লোক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে তাহাদের পরিবেশিত অন্নজল উচ্চবর্ণের লোক গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং এই সকল অন্ত্যজ জাতির লোক শুদ্ধ দেহে ও পবিত্র পরিচ্ছদে দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিবে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর কোনো কোনো ভক্ত বেশ্যাদিগকেও অস্পৃশ্যসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মনে করিয়া তাহাদিগকে ভদ্রসমাজে 'চল' করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একথা বোধ হয় সকলেই জানেন, পতিতার গৃহে যে সকল ভদ্রলোক গমন করেন, তাঁহারা গোপনে সেই নারীর স্পৃষ্ট সর্বপ্রকার খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করেন—শুধু গ্রহণ করেন বলিলে কথাটা অসম্পূর্ণ থাকে, গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হন। যে কার্যটি গোপনে হইয়া থাকে, তাহা প্রকাশ্যে করাই এই গান্ধীভক্তদের উদ্দেশ্য ছিল।

দেবমন্দিরে প্রবেশ বেশ্যাদের পক্ষে কখনও নিষিদ্ধ হয় নাই। তাহাদের সাজপোশাক দেখিয়া পুরোহিত ঠাকুরের চমক লাগিয়া যায়—প্রচুর দক্ষিণার লোভে, তিনি না বলিতেই দ্বার উন্মুক্ত করিতে আদেশ দেন।

পতিতাদের প্রতি এই অপূর্ব সহানুভূতির ফলে নানাস্থানে পতিতা নারীসঙ্ঘ স্থাপিত হইল। তন্মধ্যে বরিশালের বেশ্যাসমিতিই অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সেই সময়ে আমার বন্ধু কলিদাসীর বাড়িতে বরিশাল হইতে একটি বারবনিতা আসে। তাহার নাম এখন ঠিক মনে হইতেছে না, বোধ হয় বসন্তকুমারী হইবে। যাহা হউক, এই বসন্তকুমারীকে লইয়া এক তরুণ ছাত্র-যুবক কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যুবকটি কোনো ধনী ব্যবসায়ীর পুত্র। বাপের লোহার সিন্দুক ভাঙিয়া আট শত টাকা লইয়া পতিতা-প্রণয়িনীকে কলিকাতায় আনিলেন। বসন্তকুমারীর মুখে শুনিলাম, বরিশালের এক বিখ্যাত দেশকর্মী দার্শনিক ব্যক্তি তরুণ যুবকদের দ্বারা পতিতালয়ে অসহযোগ মন্ত্র প্রচার করিতেছেন। তথাকার দার্শনিকগণ চরকায় সূতা কাটিতেছে ও খদ্দর পরিধান আরম্ভ করিয়াছে। আমি এত উৎসাহিত হইলাম যে আমিও একটা চরকা কিনিয়া ফেলিলাম, খদ্দরের শাড়ি-ব্লাউজ পরিতে লাগিলাম।

আমার চেষ্টায় রামবাগানে দশ-বারো জন পতিতা নারী চরকায় সূতা কাটিতে লাগিল। কেহ কেহ খদ্দর পরিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু দুই মাসের মধ্যে সব শেষ। চরকা খদ্দর বন্ধ হইয়া গেল। তা হইবার কথা, কারণ সংযম ও পবিত্রতার ভিত্তি ব্যতীত উহা দাঁড়াইতে পারে না।

একদিন দেখিলাম কোনো খবরের কাগজে লেখা হইয়াছে—'কি দুঃখের বিষয়! অশ্বিনীকুমারের[৩২] বরিশালে আজ যুবকেরা পতিতার সংস্পর্শে যাইতে কিছুমাত্র লজ্জিত হয় না।' আমি বসন্তকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ভাই, তোমাদের বরিশালে অশ্বিনীকুমার কে?' বসন্ত বলিল, 'আমি তিন মাস পূর্বে ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে বরিশালে আসি। অশ্বিনীকুমারের পরিচয় আমি জানি না, উনি বোধ হয় জানিতে পারেন।' বসন্ত তাহার বাবুকে লক্ষ করিয়া বলিল। যুবকটি পার্শ্ববর্তী পালঙ্কের উপর শুইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বিকৃতস্বরে গাহিতেছিলেন।

'এখনও তারে চোখে দেখি নি,
শুধু বাঁশি শুনেছি।
মন প্রাণ যা ছিল তা দিয়ে ফেলেছি—'।

বসন্তের কথায় আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'অশ্বিনীবাবুর নাম শুনেন নি। স্বনামধন্য পুরুষ অশ্বিনীকুমার দত্ত। আপনি এত পড়াশুনা করেছেন, তাঁর 'ভক্তিযোগ' পড়েন নি? একবার পড়ে দেখবেন। পবিত্র চরিত্রের এমন উচ্চ আদর্শ আর কোথাও নাই। অশ্বিনীবাবুর হাতে গড়া বরিশাল।' আমি বলিলাম, 'সেই অশ্বিনীকুমার দত্ত! হাঁ, তাঁর নাম আমি জানি।'

আমি তাঁর মুখের উপর জবাব দিলাম, 'আপনিও সেই বরিশালেরই যুবক না? যুবকটি নির্লজ্জের মত পুনরায় গাহিতে লাগিল—

'শুধু স্বপনে এসেছিল যে,
নয়নকোণে হেসেছিল সে...'

আমি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া আসিলাম। আমার মনে হইল, মানুষ এত বড় ভণ্ড হইতে পারে—একটা মহান আদর্শকে প্রশংসা করবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কার্য দ্বারা অম্লানবদনে তাহাকে পদদলিত করিয়া যায়। যাহা হউক, বসন্তের প্রণয়ী এই যুবকটি আমাকে একদিন অশ্বিনীবাবুর 'ভক্তিযোগ' পুস্তকখানি আনিয়া দিলেন। বলিলেন, 'ইহা আমার উপহার স্বরূপ গ্রহণ করুন।' সেই অবধি আমি 'ভক্তিযোগ' মাঝে মাঝে পাঠ করিতাম।

এই পতিতা-নারী-সমিতির প্রভাব ক্রমশ এতদূর বিস্তৃত হইল যে এক দল সুনীতিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। সঞ্জীবনী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রথমাবধি ইহার বিরুদ্ধে ছিলেন। ওই সংবাদপত্রে তিনি চিরদিন এই সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। হিমাচলের মত দৃঢ়চিত্ত এই মহাপুরুষকে আমি জীবনে কয়েকবার মাত্র দেখিয়াছি ; তাহাতে তাঁহাকে দেবতাসদৃশ্য বলিয়া আমার মনে হইয়াছে। তাঁহার কথা আমি আরও দুইটি পতিতা নারীর মুখে শুনিয়াছি—তাহাদের নাম সুরুচি ও উমাবালা। যথাস্থানে ইহাদের কথা বলা হইবে।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের সম্বন্ধে এখানে আরও দুই-একটি কথা না বলিয়া পারিলাম না। তাঁহার সুনীতি ও পবিত্রতার আদর্শের তুলনায় আমরা অতি হীন, নরকের কীটানুকীট। তথাপি তাঁহার কথা এই জন্য বলিতেছি, তাহাতে আমার চরিত্র আরও পরিস্ফুট হইবে। কৃষ্ণবাবু দুর্নীতিকে কখনও কোনো মিথ্যা অজুহাতে ক্ষমা করেন নাই, কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহেন নাই। রবীন্দ্রনাথ থিয়েটারের অভিনেত্রীদের গান শিখাইতে যান বলিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছেন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র পতিতার দান গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার উপরও দোষারোপ করিয়াছেন, ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ[৩৩] 'সরযূ-সদনে'র সাহায্যার্থে বেশ্যার দ্বারা নাট্যাভিনয় করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার অজস্র নিন্দা করিয়াছেন, শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী[৩৪] মিনার্ভা থিয়েটার বেশ্যাদের সভায় মহিলা ভলান্টিয়ারদের নেত্রী হইয়াছিলেন বলিয়া তৎসম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মসমাজের এক একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। আমার সকল প্রণয়ীই ইঁহাকে ভয় করিত।

মহাত্মা গান্ধী যখন বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ করেন, তখন তিনি বরিশাল গমন করিলে সেখানকার পতিতা-নারী-সমিতি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী সেই সমিতিতে যান নাই। তিনি বলেন, 'পতিতারা যদি একত্রে মিলিত হইয়া সমিতি গঠন করে তবে দেশের চোর-ডাকাতরাও সমিতি গঠন করিবে।' [গুরু হরফ সংকলকের] সেই দার্শনিক দেশকর্মী মহাশয় মহাত্মাজীর তিরস্কার লাভ করিয়া এক্ষণে বরিশালের কর্মক্ষেত্র হতেই নাকি চলিয়া গিয়াছেন।

আমাব জীবনেও এদিকে দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিতেছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনে বাহির হইযা দেশকর্মী যুবকদের মধ্যে বিচরণ করিবার সময় আমি আত্মসংযম করিতে পারি নাই। আমাব কায়িক ও মানবিক অপরাধ হইয়াছে। যেখানে শিক্ষার অভাব, যেখানে শাসন নাই, যেখানে অহংকারই প্রবল, সেখানে এরূপ ত হইবেই। আমার সেই ব্যাঙ্কের কর্মচারী....পাধ্যায় বাবুটি আমার বে-চাল লক্ষ করিয়াছেন, আমার আচরণ সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছেন।

এদিকে তিনিও অপরাধী হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে থিয়েটারে একটু বেশী যাওয়া-আসা করিতে দেখিলাম। একদিন থিয়েটারে গ্রীন রুম বা সাজঘরে কোনো অভিনেত্রীর সহিত তাঁহার হাস্যপরিহাসের সময় আমার দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল। আমরা দুজনেই থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলাম। আমাকে বক্সে রাখিয়া তিনি ছল করিয়া বাহিরে গিয়াছিলেন ; গোপনে আমিও গিয়াছিলাম।

আমাদের দুজনেরই হৃদয় বর্ষার বিদ্যুৎপূর্ণ দুইখানি মেঘের মত পরস্পর নিকটে আসিতেছিল। আশঙ্কা করিতেছিলাম, একদিন দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত করিয়া দারুণ বজ্রপাত হইবে।

নবম

পঙ্কিল আবর্তে

মদ্যপান বন্ধ করা মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের আর-একটি কার্য ছিল। তদনুসারে যুবকের দল স্থানে স্থানে মদের দোকানে পিকেটিং করিতে আরম্ভ করে। আমাদের চাকর একদিন বাবুর জন্য মদ আনিতে যাইয়া বাধা পায়। যুবকেরা তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, 'কার জন্য মদ কিনেছিস্?' আমাদের চাকর আমার বাড়ির নম্বর বলিল। তাহারা নাম জানিতে চাহিল। চাকর বলিল, 'ফিরোজা বিবির ঘর।' আমি ফিরোজা রংয়ের জামা-কাপড় পরিতে ভালবাসিতাম বলিয়া রামবাগানে আমার ডাক নাম ছিল ফিরোজা বিবি। চাকরটি তখন কোনো প্রকারে ছাড়ান পাইয়া আসিল।

পরদিন দুপুরবেলায় খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় চাকর আসিয়া জানাইল, একজন ভদ্রলোক দেখা করিতে চাহেন। আমি তাঁহাকে ঘরে আনিতে বলিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। দেওয়ালের গায়ে ঝুলানো বৃহৎ আয়নার সম্মুখে যাইয়া চুল ও পরনের কাপড় ঠিক করিতেছিলাম। অকস্মাৎ এ কি—আয়নার মধ্যে কাহার প্রতিবিম্ব পড়িল? আমি চমকিত হইয়া দরজার দিকে ফিরিয়া দেখি নন্দদাদার এক বন্ধু।

তাঁহার পরিধানে খদ্দরের ধুতি, গায়ে খদ্দরের এক চাদর, পায়ে মাদ্রাজি স্যাণ্ডেল, হাতে একটা মোটা লাঠি। মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা। আমি কিছু মাত্র বিস্ময়ের ভাব না দেখাইয়া স্পষ্টস্বরে একটু তিরিক্ষি মেজাজে বলিলাম, 'আপনি কে? এ সময়ে আপনার কি প্রয়োজন?' কিন্তু আমার বুক কাঁপিতেছিল।

নন্দদাদার বন্ধু আমার আপাদমস্তক একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, 'মানী, তুমি এখানে?' আমি বলিলাম, 'আমার নাম ফিরোজা বিবি...'। নন্দদাদার বন্ধু ভিতরে আসিয়া বিছানায় বসিয়া লাঠিটা সম্মুখে শোয়াইয়া রাখিল। আমি দাঁড়াইয়াছিলাম। নন্দদাদার বন্ধু আমার ডান হাত ধরিয়া বলিল, 'বোসো না এইখানে।' আমি যন্ত্রচালিতের মত বসিয়া পড়িলাম। মাথা নিচু করিয়া বিছানার চাদর খুঁটিতে লাগিলাম। নন্দদার বন্ধুর নাম উপেন্দ্র।

নন্দদাদার বন্ধু আমাকে বলিল, 'মানী, তুমি শেষে এই করিলে? পড়াশুনার এই পরিণাম?' আমি নন্দদাদার বন্ধুর পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। সে বলিল, 'কাল রাত্রিতে মদের দোকানে পিকেটিং করতে এসে তোমার চাকরের মুখে ফিরোজা বিবির ঠিকানা পেয়েছি। আমরা মহাত্মা গান্ধীর মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মদ্যপান রহিত করিতে প্রতিজ্ঞা করেছি। বেশ্যাদের ঘরেও আমরা এই জন্যে যাই। আজ ফিরোজা বিবির ঘরে আসবার কাজ আমার উপর পড়েছিল। এখানে এসে দেখলাম সে আমারই পরিচিত, মানদা। তা হলে আজ থেকে তোমার ঘরে মদ আসা বন্ধ, মনে রেখো।'

উপেনবাবুর নিকট বাড়ির সমস্ত সংবাদ জানিলাম। বাবা মনোদুঃখে কলিকাতার সমস্ত বাড়ি বিক্রয় করিয়া পল্লীগ্রামে যাইয়া বাস করিতেছেন। আমার মামার (নন্দদাদার পিতার) মৃত্যু হইয়াছে। নন্দদাদা গান্ধীর আন্দোলনে মজিয়াছে। মুকুলদা বি. এল্ পাশ করিয়া...কোর্টে প্র্যাক্‌টিশ করিতেছেন। তাঁহার সাহিত্যচর্চার দিকে বেশি মন থাকায় অর্থোপার্জন কিছুই হয় না। কমলা ম্যাট্রিক পাশ করিয়া ডাক্তারি পড়িবার জন্য পশ্চিমে কোথায় গিয়াছে। তাহার মাতা কলিকাতার বাড়ি ছাড়িয়া এখন কমলার সহিতই সেখানে থাকেন। নন্দদাদা তখনও বিবাহ করেন নাই।

আমি তাহাকে মাঝে মাঝে আসিতে অনুরোধ করিলাম। উপেনবাবু বলিলেন, 'তোমার কাছে যে উদ্দেশ্যে আসা, তা হয়ে গেল। আর মদ কিনবে না, বাস্, আর তো কোনো প্রয়োজন নাই।' উপেনবাবু বিছানা হইতে উঠিলেন। আমি তাঁহাকে কিছু খাইবার জন্য কত মিনতি করিলাম, কিন্তু তিনি কিছু খাইলেন না—একটা পান পর্যন্ত না। এমন চরিত্রবান যুবক কর্মীও আমাদের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, যাঁহারা পাপীর সংস্পর্শে আসিয়াও পাপ হইতে দূরে থাকিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমার ঘরে আর মদ আসিত না। বাবুর বন্ধুগণ অসন্তুষ্ট হইলেন, বাবুও রাগ করিলেন। উপেনবাবুর কাছে আমি চিঠিপত্র লিখিতাম, সে তাহার সংক্ষিপ্ত উত্তর দিত। আমার বাবু উহা সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। সুতরাং আমাদের মধ্যে মনোমালিন্য দিন দিন বাড়িয়া উঠিল।

নন্দদাদার এই বন্ধুটি আমার পরিচিত। বাল্যকালে তাহাকে আমাদের বাড়িতে অনেকবার দেখিয়াছি। তিনি নন্দদাদার প্রতিবেশী এবং দূরসম্পর্কিত আত্মীয়। নন্দদাদাকে আসিবার জন্য অনেকবার বলিয়া দিয়াছি, কিন্তু তিনি আমার এই পরিণাম শুনিয়া আর আমার নিকট আসেন নাই।

দুই-তিন মাসের মধ্যেই আমার এই . পাধ্যায় বাবু আমাকে ছাড়িয়া দিলেন। যে অভিনেত্রীব সহিত তাঁহাকে হাস্যপরিহাস করিতে দেখিয়াছিলাম, তাহারই ঘরে তিনি যাতায়াত করিতে আরম্ভ কবিলেন। এখন ব্যাঙ্কের টাকায় নটীব পূজা আরম্ভ হইল। অপব্যয়ের ফলে কযেক বৎসরেব মধ্যেই ব্যাঙ্ক ফেল হইল। তিনি নিজেও গেলেন, দেশের লোকেরও সর্বনাশ। অনেক ব্যবসা-শিল্প-প্রতিষ্ঠান নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনেকের আজীবন-সঞ্চিত ধন, ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় তাঁহারা ভিখারি সাজিয়াছেন। আপনারা মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে তাহা জানিতে পারিবেন। কোনো পুরাতন বিখ্যাত মাসিক পত্রিকাও তাহার ম্যানেজারের বেশ্যাসক্তির ফলে বিলুপ্ত হইয়াছে।

আমি মনে করিলাম আর কাহারও নিকট বাঁধা থাকিব না। ভাল গায়িকা বলিয়া আমার সুনাম ছিল, আমি সোনাগাছিতে উঠিয়া গেলাম। এইখানে রাজসাহী জেলার কোনো জমিদার যুবক আমার গৃহে আসিতেন। তিনি অতিশয় মদ্যপায়ী ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে প্রায়ই থিয়েটারে যাইতাম। একদিন বক্সে বসিয়া আছি, জমিদারবাবুটি অতিরিক্ত মদ্যপানে একটু মাতলামি আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা জানিতাম না, বাবুর শাশুড়িটি নিকটবর্তী আর-এক বক্সে বসিয়াছিলেন। তিনি না কি পূর্ববঙ্গের কোনো বিশিষ্ট জমিদার গৃহিণী। জামাতার এইরূপ লজ্জাজনক আচরণ দেখিয়া তিনি আমাদের নিকট হইতে জামাতাকে তখনি নিজগৃহে লইয়া গেলেন। এখন সেই জমিদারবাবুটি সত্যবালা নাম্নী আমার পরিচিতা এক পতিতার ঘরে যান। সমাজে তাঁর মান মর্যাদা যথেষ্ট।

আমি মাঝে মাঝে বাগান অথবা মজলিসে গানের মুজ্‌রায় যাইতাম। ইহাতে অর্থোপার্জন হইত বটে, কিন্তু বিপদও ছিল। বড়লোকের খেয়াল মাফিক চলা যে কি বিরক্তিজনক, তাহা বুঝাইবার সাধ্য আমার নাই। সারারাত্রি জাগরণ, ভালবাসার ভান, মাতলামির ঝঞ্ঝাট—এই সব করিতে শরীর-মন একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িত। ভাবিতাম—আর না, সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলি। হৃদয়ে দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হইত। কিন্তু প্রলোভন কখনও জয় করিতে পারি নাই, বার বার ঘূর্ণিপাকে পড়িয়াছি।

১৯২৪ সালের বর্ষাকালে তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়। বর্তমানে মোহান্ত সতীশ গিরির বিরুদ্ধে পূর্বাবধি নানাবিধ অত্যাচারের অভিযোগ ছিল।[৫৫] তদনুসারে দেবোত্তর সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের জন্য গভর্নমেণ্ট রিসিভার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামী সচ্চিদানন্দ ও বিশ্বানন্দের নেতৃত্বে মহাবীরদল রিসিভারের মন্দির প্রবেশে বাধা দেন। এদিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে কংগ্রেসীদল প্রবেশাধিকার দাবি করেন। তাঁহারা বলেন, মোহান্তের কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকিতে পারে না। এই প্রাসাদের মধ্যে যে মূর্তি আছে, তাহা দর্শন ও পূজা করিবার অধিকার জনসাধারণের আছে। এই গোলযোগের মধ্যে মহাবীরদল, গভর্নমেণ্ট, মোহান্ত, কংগ্রেস সকলে জড়াইয়া পড়িল। মারামারি লুটপাট প্রভৃতি তুমুল কাণ্ড চলিতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে আমরা প্রায় দশ-বারো জন পতিতা নারী তারকেশ্বরে যাত্রা করি। সেখানে যাইয়া দেখিলাম হুগলী, শ্রীরামপুর, শেওড়াফুলি-প্রভৃতি স্থান হইতে আরও বেশ্যা আসিয়াছে। আমরা সকলে মিলিয়া মহিলা-ভল্যাণ্টিয়ারদল গঠন করিলাম। সত্যাগ্রহ পরিচালনা করিবার জন্য আমরা কিছু টাকা চাঁদাও তুলিয়াছিলাম।

মোহান্তের প্রাসাদের সম্মুখে সত্যাগ্রহ করিতে কংগ্রেসীদল আমাদিগকে দিল না। মন্দির রক্ষা করাই আমাদের প্রধান কার্য হইল। স্বামী সচ্চিদানন্দকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিতে আসিলে আমরা তাঁহার চারিদিকে ঘেরিয়া বসিলাম। পুলিশ বিফলমনোরথ হইয়া চলিয়া গেল। আমরা পালা করিয়া মন্দিরের দ্বারে প্রহরীর কার্য করিতে লাগিলাম।

ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়[৬৬] ও শ্রীযুক্তা সন্তোষকুমারী গুপ্তা ইঁহারাই তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহের প্রধান পরিচালক ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন একদিন যাইয়া আমাদের সকলকে উৎসাহিত করিয়া আসেন। আমাদের সুখ ও স্বচ্ছন্দতার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় হইয়াছে। সত্যাগ্রহ তহবিলে বহু সহস্র টাকা উঠিয়াছিল। যথাসময়ে তারকেশ্বর-সমস্যার একপ্রকার মীমাংসা হয়। কিন্তু সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় সেখানে যে বীভৎস ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা আজও ভুলিতে পারি নাই। মহিলা ভল্যাণ্টিয়ার নামধারী বেশ্যাদের সহিত বিভিন্ন দলের ভল্যাণ্টিয়ার নামধারী অনেক ভণ্ড লম্পটের অবাধ কলুষিত সংযোগ, যাঁহারা দেশকর্মী বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের কাহারও রাত্রিযাপন-সমস্যা, আমার নিকট কোনো সত্যাগ্রহী ব্যক্তির প্রস্তাব—এই সব দেখিয়া মনে হইয়াছে তারকেশ্বরে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তথায় পুণ্যের আলোক নিভিয়া গিয়াছে।

সেখানে দেবদর্শনার্থী সুকৃতি নাম্নী এক যুবতীর সহিত আমার পরিচয় হয়। সাবিত্রী নামে সুকৃতির এক ভগ্নী ছিল। ইহারা কলিকাতা জোড়াসাঁকো-পল্লীর বিখ্যাত উচ্চবংশের কন্যা। লোকে বলে এই বংশে লক্ষ্মী-সরস্বতীর বিবাদ নাই। সুকৃতি ও সাবিত্রী উভয়েই পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া শোভাবাজারে বাস করে।[৬৭] গভর্নমেণ্টের একজন উকিল সুকৃতির ঘরে যাতায়াত করিয়া থাকেন। কিছুকাল পূর্বে সাবিত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। একজন বড় দেশকর্মী তাহার কাছে যাইত। যে সকল পরিবার বাংলার গৌরব, তাহাদের আজ এ কি অধঃপতন। ইহার নিকট বাংলার বহু বিখ্যাত ব্যক্তির যে ইতিহাস শুনিয়াছি, তাহা লিখিলে হয়ত আইনের দায়ে পড়িতে [হইবে], এজন্য লিখিলাম না। এই পরিবারই অবাধ মেলামেশার পথপ্রদর্শক।

উপেনবাবুর নিকট শুনিয়াছি, নন্দদাদার সংযম অটুট রহিয়াছে। কোনো নারী তাহার সম্মুখে প্রলোভন লইয়া আসিতে পারে নাই। অসহযোগ আন্দোলনের ভাল দিকটা তাহার পূর্ব-গঠিত চরিত্রকে আরও সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছে। বিলাসশূন্যতা ও সৎকার্যে আসক্তি এই দুইটি তাহার ব্রহ্মচর্যের প্রধান সহায়। আমার মত সাহিত্যচর্চা না করা নন্দদার পক্ষে মঙ্গলজনক হইয়াছে। দারিদ্র্য তাহার বন্ধুর কার্য করিয়াছে। এমন নির্মল চরিত্রের কর্মীও আছে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অল্প।

আমার সম্বন্ধে নাকি এই কথা বলিত, 'মানদা, যদি তার পাপজীবনের সমস্ত ঐশ্বর্য ছেড়ে একবস্ত্রে আমার কাছে আসে, আমি তাকে আদরের সহিত মাথার মণি করে রাখব, বোন বলে তেমনি স্নেহ করব। কিন্তু সে পতিতাপল্লীতে পতিতাবৃত্তিতে থাকিলে আমি তাহার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখতে পারি না।'

আমি কখনও সিগারেট অথবা মদ খাই নাই। পতিতা নারীদের এই অভ্যাস অর্থোপার্জনের অনুকূল নহে। আমার বাবুগুলি আমাকে এই নেশা দুইটি ধরাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই সফলকাম হন নাই। উপেনবাবু মদ্যপান নিবারণের জন্য বেশ্যাদের গৃহে পিকেটিং অনেকদিন চালাইয়াছেন। আমি যথাসাধ্য তাঁহার সাহায্য করিয়াছি।

পূজার ছুটি, বড়দিনের অবকাশ—প্রভৃতি উপলক্ষ্যে মফস্‌সলের উকিল ও অফিসের কর্মচারীগণ কলিকাতায় আসিয়া থাকেন। তখন আমাদের গৃহে তাঁহাদের অনেকের শুভাগমন হয়। যাঁহারা জমিদার ও ব্যবসায়ী, তাঁহারা অন্য সময়েও আসিতে পারেন। অনেকে মফস্‌সল হইতে এখানে তাঁহাদের রক্ষিতাদিগকে মাসে-মাসে টাকা পাঠাইয়া থাকেন। নোয়াখালির এক রায়-বাহাদুর, বর্ধমানের এক জমিদার, ঢাকার এক বড় ঔষধ ব্যবসায়ী, রংপুরের এক উকিল—ইঁহাদের নিকট হইতে আমি কিছু টাকা পাইতাম। চীৎপুরে বিশিষ্ট সোনার বেনের মেয়ে প্রভা নামে আমার এক বন্ধু আছে। ময়মনসিংহের এক উকিল তাহার বাবু, ঢাকার সেই ব্যবসায়ীর সহিত ইহার নাকি পরিচয় ছিল। সেই সূত্রে ঢাকার লোকটি আমার ঘরে আসিত। প্রভার বাড়িতে কলিকাতার এক ব্যারিস্টারের কুমারী কন্যাও আছেন। এইরূপে নিত্য নূতন লোক লইয়া সোনাগাছিতে আমার দিন কাটিতে লাগিল। বিশিষ্ট ঘরের পতিতা মেয়েদের সঙ্গে আমি একটু বেশি মেলামেশা করিতাম। এই ব্যারিস্টার কন্যার মত নির্ভীক পতিতা আমি কম দেখিয়াছি।

এই সময়ে একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা আমার প্রত্যক্ষ হইল। আমি এস্থলে তাহার বর্ণনা করিতেছি। তাহাতে বুঝা যাইবে, কি ঘোরতর পাপ সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার প্রতিকার কিরূপে হইতে পারে তাহাও সমাজপতিদের ভাবিয়া দেখা কর্তব্য।

কলিকাতার মধ্যভাগে বাদুড়বাগান-পল্লীর নিকট এক জমিদার বাস করিতেন। তাঁহার পূর্বপুরুষ নাকি সুপরিচিত বিখ্যাত ব্যক্তি। সেই জমিদার অতিশয় দুশ্চরিত্র। প্রতিবেশী গৃহস্থদের কুলবধূর উপর তাঁহার কুদৃষ্টি। তাঁহার দুষ্কার্যের সহায় কতকগুলি বন্ধু ও অনুচর আছে। ইহারা নানা কৌশলে গৃহস্থের কুলবধূদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া প্রভুর কাম-লালসা তৃপ্তির জন্য লইয়া আসে। কখনও কলিকাতার প্রাসাদে, কখনও বা নিকটবর্তী বাগানবাড়িতে এই সকল পাপলীলার অনুষ্ঠান হয়।

গৃহস্থের কুলবধূরা কেহ প্রলোভনে স্বেচ্ছায়, কেহ বা অনিচ্ছায় বাধ্য হইয়া আসিয়া থাকে। তাহারা অনেকেই গান জানে না, মদ্যপানও করে না। এইপ্রকার আমোদের জন্য সোনাগাছি অথবা রামবাগান হইতে নারীদিগকে নেওয়া হইত। আমি জমিদারের বাগানবাড়িতে

দুই-একবার গিয়াছিলাম। প্রতিরাত্রিতে একশত টাকা লইতাম, গান গাওয়াই আমার কার্য ছিল। আমি মদ খাইতাম না। আরও দুই-তিনটি বেশ্যা যাইত। তাহারাই মদ্যপানের আমোদে যোগ দিত।

এক রাত্রিতে জমিদারের বাগানবাড়িতে আমার যাইবার ডাক পড়িল। আমি আমার পাওনা টাকাকড়ি অগ্রিম লইয়া রাত্রি আটটার সময় তথায় যাই। দেখিলাম, একটি সুন্দরী যুবতী কুলবধূকে আনয়ন করা হইয়াছে। তাহার বয়স ১৮/১৯ এইরূপ হইবে। গায়ের রং যেন কাঁচা সোনা—মুখখানি কোমল, লাবণ্য মাখা। আমার প্রাণে বড় ব্যথা বাজিল। এই দুর্বৃত্ত জমিদারের পাপ প্রবৃত্তির কবলে কত সতীর বলিদান দেখিয়াছি। আমরাও এই পাপের ভাগী। সে রাত্রিতে গানে আমার মন লাগিল না। আমি এই বধূটির সহিত কথাবার্তার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলাম।

আমোদপ্রমোদ আরম্ভ হইল। জমিদার ও তাঁহার বন্ধুগণ মদ্যপান করিতে লাগিলেন। আমি দুই-একটি গান গাহিলাম। অন্যান্য বেশ্যারাও তারপর নাচিতে-গাহিতে আরম্ভ করিল। আমি গরমের অছিলায় বাহিরে আসিবার সময় সেই বধূটিকে আস্তে আস্তে বলিলাম, 'চল, একবার বাগানে বেড়াইয়া আসি।' আমরা উভয়ে পুকুরের ঘাটে একটি বেদীর উপরে বসিলাম। তাহার সহিত আমার অনেক কথা হইল। তাহার সারমর্ম এই : বধূটির নাম অপরাজিতা দেবী। সে ব্রাহ্মণকন্যা। বর্ধমান জেলার কোনো গ্রামে তাহার পিত্রালয়। কলিকাতার কোনো মুখোপাধ্যায়-যুবকের সহিত নাকি বিবাহ হইয়াছে। তাহার স্বামী পিসিমার কাছে থাকেন। এই পিসিমায়ের কয়েক ভগ্নী, নিজ নিজ বাড়িতে বাস করেন। তাহার স্বামীর পিতামাতা বা অপর কোনো আত্মীয়স্বজন বোধ হয় নাই। তিনি অতি নিরীহ ও শান্ত স্বভাব। সর্বদা পিসিমার মন যোগাইয়া চলেন। পিসিমার মৃত্যুর পর বাড়ি ও নগদ টাকা নাকি পাইবেন, ইহা তাঁহার আশা ছিল।

অপরাজিতার পিসশাশুড়ি নাকি বিধবা অবস্থায়...অর্থ উপার্জন করিয়াছেন, এইরকম দুর্নাম আছে। এক্ষণে বার্ধক্যে নিজে অশক্ত হওয়ায় ভ্রাতুষ্পুত্রের বধূদের সতীত্বের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করেন। অপরাজিতার স্বামীর পূর্বে আরও দুইবার বিবাহ হইয়াছিল। পর-পর সেই দুইটি বধূর অগ্নিদাহে মৃত্যু হয়। পিসশাশুড়ি প্রকাশ করেন যে, বধূরা নিজের দেহে আগুন লাগাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। অপরাজিতা তাহার স্বামীর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী, তাহার একটি শিশুপুত্র আছে।

অপরাজিতাকেও তাহার পিসশাশুড়ি অর্থ উপার্জন করিতে নিযুক্ত করেন, অপরাজিতা তাহাতে সম্মত নহে। ইহাতে পিসশাশুড়ি তাহার উপর দিনরাত্রি উৎপীড়ন করিতেন। এক দুষ্ট ডাক্তার পিসশাশুড়ির প্রধান মন্ত্রদাতা ও দুষ্কার্যের সহায় ছিল ; অপরাজিতা এতদিন তাহার সতীত্ব রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

আমি অপরাজিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি এখন কি করবে? তুমিও কি আত্মহত্যা করতে চাও?' অপরাজিতা বলিল, 'আত্মহত্যা করব কেন? আমার বাবা আছেন, ভাই

আছেন, আমার ছেলে আছে—আমি আত্মহত্যা করব না।' আমি এই কিশোরী বধূর দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও অপূর্ব আত্মসংযম দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলাম। এই বালিকা কোনো শিক্ষা পান নাই, লেখাপড়া জানে না, সাহিত্যচর্চা করে নাই, অথচ ইহার মধ্যে এমন তেজ ও শক্তি কোথা হইতে আসিল?

আমি বলিলাম, 'তুমি যদি ইহাদের কুপ্রস্তাবে সম্মত না হও তবে কি হবে তা জান?' অপরাজিতা বলিল, 'হাঁ জানি, এরা আমাকে মেরে ফেলবে। আমার পিসশাশুড়ি আমার ওই দুই সতীনকেও মেরে ফেলেছেন, তারপর লোকের কাছে বলেছেন যে উহারা কাপড়ে কেরোসিন তেল দিয়ে আগুন লাগিয়ে মরেছে। কিন্তু মানুষ এত বোকা নয় যে, সে কথা আর বিশ্বাস করবে ; পর-পর দুইটি বৌ একই রকমে মারা যায়। আজ সারাদিন পিসশাশুড়ির সহিত আমার ঝগড়া হয়েছে। আমি বলেছিলাম যে, আমি সমস্ত কথা প্রকাশ করে দিব। শাশুড়ি আমাকে বলেন, তা হলে তোর গলায় পা দিয়ে একেবারে তোর জীবন শেষ করব। আমিও সেই থেকে প্রতিজ্ঞা করেছি, এরা জীবিত অবস্থায় যেন আমার অঙ্গ স্পর্শ করতে না পারে।'

অপরাজিতার কথা শুনিতে আমার মাথা লজ্জায় নুইয়া পড়িল। ভাবিলাম, অপরাজিতা কোন্ স্বর্গের দেবী—আর আমি কোন্ নরকের কীট। হিন্দুসমাজে কেবল আমার মত কলঙ্কিনীই জন্মগ্রহণ করে না, অপরাজিতার মত সতীও জন্মগ্রহণ করেন। আমার দেহের দুষিত বাতাসে অপরাজিতার পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যাইবে, এই ভাবিয়া তাহার সহিত আর অধিকক্ষণ কথা কহিলাম না। দেখিলাম, তাহার পিসশাশুড়ি ও আর-একজন লোক (অপরাজিতা বলিল, লোকটি নাকি...ডাক্তার) সেই দিকে আসিতেছেন। আমি অপরাজিতার পায়ের ধূলা নিয়ে তাহাকে প্রণাম করিলাম। সে অগ্রসর হইয়া গেল, আমি একটা লতাকুঞ্জের অন্তরালে দাঁড়া[ই]লাম।

সে রাত্রিতে আমি আর আমোদপ্রমোদে যোগ দিলাম না। শরীর অসুস্থ বলিয়া শীঘ্র চলিয়া আসিলাম। দুঃস্বপ্নে ভাল ঘুম হইল না। দুই দিন পরে কাগজে পড়িলাম, অপরাজিতার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার পিস্‌শাশুড়ি পুলিশের নিকট জানাইয়াছে, সকালবেলা উনুনের আঁচ ধরাইবার সময় অসাবধানে কাপড়ে আগুন লাগিয়া অপরাজিতার মৃত্যু ঘটে। শবদেহের ডাক্তারী পরীক্ষায়, পুলিশ তদন্তে ও করোনারের বিচারে প্রকৃত রহস্য প্রকাশিত হইল না। এই ঘটনার পর প্রায় সপ্তাহকাল পর্যন্ত আমি নিতান্ত মানসিক উদ্বেগ ও অশান্তিতে কাটাইয়াছি। এখনও অপরাজিতার মুখখানি আমার মনে আছে।

এদেশের ঘরে ঘরে এমন কত শোচনীয় দুর্ঘটনা হইতেছে, সে সংবাদ কি সমাজের কর্তারা রাখিয়া থাকেন?—সতীশিরোমণি বালিকাবধূর অভিশাপে সমাজ রসাতলে যাইতেছে। দুর্বৃত্ত লম্পটেরা অর্থের বলে মানমর্যাদা আদায় করিয়া সমাজের মধ্যে নির্ভয়ে বুক ফুলাইয়া বেড়ায়।

কালিদাসী একদিন আমার বাড়িতে আসিল ; তাহার চেহারা দেখিয়া বুঝিলাম, সে অতিশয় দুরবস্থায় পড়িয়াছে। তাহার মুখে শুনিলাম, রেস (ঘোড়দৌড়ের জুয়াখেলা) খেলিয়া এবং মদ খাইয়া তাহার সেই ভাটিয়াবাবু সর্বস্বান্ত হইয়াছে। তাহার কারবার উঠিয়া গিয়াছে। কালিদাসী এখন এক মাড়োয়ারির কাছে বাঁধা। কিন্তু হাতে টাকাকড়ি নাই। আমার কাছে গহনা বন্ধক রাখিয়া পাঁচ শত টাকা কর্জ চায়।

যাহারা পতিতালয়ে যাতায়াত করে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের দুইটি প্রধান নেশা জন্মে—ঘোড়দৌড়ের জুয়াখেলা এবং মদ্যপান। রেস খেলিয়া অনেকে হাজার-হাজার টাকা পায়, এইরূপ শুনা যায়, কিন্তু তাহা থাকে না ; যে পথে উৎপত্তি, সেই পথেই নিষ্পত্তি। রেসের দিন বেশ্যাপল্লীতে খুব ভিড়। যে খেলায় জিতিয়া কিছু লাভ করিয়াছে, সে যেমন আমোদ করিতে সেখানে যায়—যে হারিয়া সমস্ত খোয়াইয়াছে সেও তেমন দুঃখ ভুলিতে সেখানে ছুটিয়া যায়।

আমার হাতে টাকা ছিল না। উষাবালা নামে একটি স্ত্রীলোক আমাদের বাড়িতে নূতন আসিয়াছিল, তাহার কাছে কিছু নগদ টাকা আছে জানিতাম। কালিদাসী যে গহনা আনিয়াছিল, তাহার মূল্য প্রায় এক হাজার টাকা। সুতরাং আমার কথায় সম্মত হইয়া উষাবালা ওই গহনা বন্ধক রাখিয়া কালিদাসীকে পাঁচ শত টাকা দিল।

আমি পরে জানিয়াছি, কালিদাসী রেস খেলিয়া মদ খাইয়া সে টাকাও উড়াইয়াছে। ভাটিয়াবাবুর সংসর্গে কালিদাসীকে রেস ও মদের নেশায় পাইয়াছিল। এই পথেই সে উচ্ছন্নে গিয়াছে। আমি আরও জানিলাম, এই নূতন মাড়োয়ারি যুবকটির সহিত কালিদাসীর পূর্ব হইতেই গুপ্তপ্রণয় ছিল। এইসব দেখিয়া-শুনিয়া তাহার প্রতি আমার আর বিন্দুমাত্র সহানুভূতি রহিল না। উষাবালার ঋণ সে আর শোধ করিতে পারে নাই।

কালিদাসী এখনও বাঁচিয়া আছে। সে আমারই মত তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। কিছুদিন পূর্বে তাহাকে কলিকাতার কোনো অপরিচ্ছন্ন বস্তিতে এক বিড়িওয়ালা মুসলমান যুবকের সহিত যেভাবে ইয়ার্কি করিতে দেখিলাম, তাহাতে বুঝিতে পারিয়াছি পতিতাদের শীঘ্র মরণ হয় কেন। সেই ২৬ বৎসরের যুবতীর দেহ ৬০ বৎসরের বৃদ্ধের মত ক্ষীণ, শুষ্ক, অস্থিচর্মসার ; মদ্যপানের ফলে নানা রোগের আক্রমণ, পরনে একখানা কাপড়ই যথাসর্বস্ব, দুই বেলা আহার জুটে না—তার উপর অত্যাচার। আমি কালিদাসীর সহিত কথা কহিলাম না। মোহান্তজীর উপদেশ আমার মনে হইল—'দৈবকে অতিক্রম করিবার শক্তি কাহারও নাই। কর্মফলই দৈব।'

উষাবালার কথা এইখানেই বলিব। সে ফরিদপুরের কোনো ব্রাহ্মণ উকিলের পরিণীতা স্ত্রী, পিত্রালয় হইতে কয়েকজন ধনী মুসলমান তাহাকে অপহরণ করিয়া কলিকাতার নিকটবর্তী বেলিয়াঘাটায় রাখে। নারীরক্ষাসমিতির কর্মী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র আতর্থী মহাশয় সংবাদ পাইয়া তাঁহার কর্মীদের দ্বারা ও পুলিশের সাহায্যে উষাবালাকে উদ্ধার করেন। এইজন্য পুলিশ-আদালতে মামলা চলিতে থাকে। তাহার স্বামী তাহাকে স্ত্রী বলিয়া অস্বীকার

করেন। ঊষাবালা কিছুদিন সঞ্জীবনী-সম্পাদক, নারীরক্ষাসমিতির পরিচালক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের বাড়িতে অবস্থান করে। এই ঊষাবালার কথাই আমি পূর্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি। সে আমার নিকট বলিয়াছে, 'কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় আমাকে নিজ কন্যার মত দেখতেন। তিনি আমাকে লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা করলেন ; শিল্পকাজ শিখবার জন্য এক স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। কিন্তু আমি কিছুতেই মনস্থির করতে পারলাম না। দুষ্প্রবৃত্তি দমন করা আমার পক্ষে অসাধ্য হয়ে উঠল। আমার বয়স আঠারো বৎসরের বেশি, সুতরাং তাঁরা আমাকে আর জোর করে রাখতে পারেন না। নানা অবস্থার পাকচক্রে ঘুরে আমি এই পথে এসেছি। কিছুদিন আমাকে রাস্তায় বসে পান বিক্রিও করতে হয়েছিল।'

নারীনিগ্রহের বিশেষ উপদ্রব আরম্ভ হইলে আমি একজন ভদ্রলোককে প্রায়ই বেশ্যাদের ঘরে আসিতে দেখিতাম, তিনি আমাদের নিকট তারকবাবু নামে পরিচিত, পতিতাদের মধ্যে চারি-পাঁচজন তাঁহার বিশ্বাসভাজন ছিল, আমাকেও তিনি বিশ্বাস করিতেন। আমরা ইহা বিশেষরূপে লক্ষ করিয়াছি, তিনি কোনো কুমতলবে বেশ্যালয়ে আসেন না। তিনি নারীরক্ষা সমিতির কর্মী—না পুলিশের গোয়েন্দা, তাহা জানি না ; কিন্তু আমাকে তিনি বলিয়াছেন, আজকাল অনেক দুর্বৃত্ত গৃহস্থ ঘরের মেয়ে-বৌকে চুরি করিয়া বেশ্যাগৃহে লুকাইয়া রাখে, কোনো স্ত্রীলোক কলঙ্কের ভয়ে বাধ্য হইয়া প্রণয়ীর সহিত স্বেচ্ছায় পতিতালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে—এইসব সন্ধান লইবার জন্যই তিনিই গোপনে বেশ্যাদের নিকট যাতায়াত করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহার কার্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতাম।

একদিন তারকবাবু আমাকে বলিলেন, 'তোমাদের সম্মুখের সমস্ত বাড়িটা ভাড়া নিয়ে যে নূতন মেয়েটি রয়েছে, তার সম্বন্ধে একটু বিশেষ খোঁজ করে দেখবে, আমার প্রয়োজন আছে।' আমি তার পরদিন হইতে সেই বাড়িতে যাতায়াত করিতে লাগিলাম। অল্পদিনের মধ্যেই মেয়েটির সহিত আমার ভাব হইল। তার ভিতরের কথা অনেকটা জানিলাম।

কয়েকদিন পর তারকবাবু আসিলে আমি বলিলাম, 'মেয়েটি ব্রাহ্মণ বংশীয়া—নাম সুরুচিবালা, তাহার পিতা একজন অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার, এখন কাশীতে আছেন, হুগলি জেলার কোনো ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত সুরুচির বিবাহ হয়। সুরুচি বলে যে, তাহার স্বামী আর এক বিবাহ করিয়াছিল। সুরুচির স্বামীগৃহে স্থান হয় নাই। সে কাশীতে পিতার নিকট থাকিত। বাল্যকাল হইতে উপন্যাস-নাটক-নভেল পড়ার তার খুব ঝোঁক ছিল। ক্রমশ সে উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির হইয়া উঠে। পিতামাতার শাসন সে মানিত না, কাশীতে দুষ্ট লোক অনেক আছে, সুরুচি কোনো দুর্বৃত্তের সহিত পলায়ন করিয়া কলিকাতায় আসে। এখানে অনেকের হাতে পড়িয়া সে কলুষিত হয়। পুলিশ তাহাকে আপত্তিজনক অবস্থায় পাইয়া গ্রেপ্তার করে, পুলিশ আদালতে তাহাকে নেওয়া হইলে বিচারক বিষম সঙ্কটে পড়িলেন, নারীরক্ষাসমিতির অক্লান্ত কর্মী ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র আতর্থী মহাশয় সেদিন অন্য কোনো কার্য উপলক্ষ্যে আদালতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে বিচারক চিনিতেন। তিনি

মহেশবাবুকে বলিলেন, 'আপনি এই মেয়েটিকে নিয়ে যান, নারীরক্ষাসমিতি হইতে ইহার যথোচিত ব্যবস্থা করুন।'

সুরুচি কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের ঘরে আশ্রয় পাইল, তিনি পিতৃস্নেহে ইহাকে সৎপথে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সুরুচি এই সরলপ্রাণ, উদারহৃদয়, মহানুভব ব্যক্তিকে প্রতারণা করিয়া চলিয়া আসিল, দুষ্ট লোকের প্রলোভনে পড়িয়া সে পাপের পথই বাছিয়া লইল। এক্ষণে এক ধনী পার্শি যুবক তাহাকে বাঁধা রাখিয়াছে, মেমসাহেবদের স্টাইলে সে থাকে—ঘাড়ের উপর পর্যন্ত ছোট করিয়া চুল ছাঁটা, হাঁটু পর্যন্ত স্কার্ট, খোলা হাতের রঙের সহিত মানানসই সিল্কের মোজা, পরিষ্কার হিন্দি বলে ; ইংরাজিও কিছু শিখেছে।'

তারকবাবু সমস্ত মনোযোগের সহিত শুনিয়া বলিলেন, 'সে কৃষ্ণবাবুর বাড়ি হইতে পলাইল কেন, তাহা বুঝি জান না।' আমি বলিলাম, 'না, সে কথা সুরুচি বলে নাই।' তারকবাবু বলিলেন, 'সে কৃষ্ণবাবুর জামাতা শচীনবাবুর একটি সোনার ঘড়ি সরাইয়াছিল, এজন্য মহেশবাবু তাহাকে পুনরায় আদালতে দিয়া আসেন। তথায় সে বেশ্যাবৃত্তি করিবার অনুমতি চায়, বিচারক অগত্যা তাহাকে তথাস্তু বলিয়া ছাড়িয়া দেন।'

আমাদের এইরূপ কথাবার্তা হইতেছিল এমন সময় সুরুচি হাসিতে হাসিতে আমার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহার হাতে নানাবিধ ফল, ফুল ও কেক বিস্কুট—প্রভৃতি রহিয়াছে, আমি তাহাকে বসিতে বলিলাম, সে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, 'মানদি, আজ মোটরে চড়ে হগ্‌সাহেবের বাজারে গিয়েছিলুম, এইসব কিনে এনেছি, কাল সকালে আমাদের বাড়িতে তোমার চা-এর নিমন্ত্রণ, যেও। ভাল কথা, আজ সেই বুড়ো মহেশ আতর্থীর সঙ্গে দেখা হল, আমি বললুম, কি বুড়ো, কেমন আছো?'

তারকবাবু সুরুচির সম্বন্ধে কি করিয়াছিলেন জানি না, আমি সুরুচি ও উষার কথা ভাবিয়া দেখিলাম, ইহারা আমারই মত হতভাগিনী। যৌবনের প্রারম্ভে প্রলোভনের বশীভূত হইয়া সংযমের বাঁধ একবার ভাঙিয়া গিয়াছে—আর তো অকূল সমুদ্রে কূল পাইতেছে না। ইহারাও আমার মত সৎপথে আসিবার সুযোগ পাইয়াছিল ; কিন্তু আমারই মত ইহাদের অদৃষ্টেও বোধ হয় আরও দুঃখভোগ আছে, তাই অনিবার্য কর্মফল কেহ খণ্ডাইতে পারিল না।

দশম

অভিনব পন্থা

সোনাগাছিতে আসিবার পর আমার উপার্জন অনেক কমিয়া যায়। শরীরও নানা রোগাক্রমণের ফলে ক্রমশ ক্ষীণ ও দুর্বল হইতে থাকে, খাওয়াপরা, ঠাকুর-চাকর-ঔষধাদি-বাবদে বহু টাকা আমার খরচ হইত। পূজা-পার্বণও কিছু করিতাম, বিশেষত সরস্বতী পূজা আমার কখনও বাদ যাইত না, আমার রোজগারে আর কুলাইয়া উঠিত না।

একজন উকিল ও একজন ব্যারিস্টার আমার ঘরে আসিত, ইহারা আইন-ব্যবসায়ে যেমন পরস্পর সহযোগী ছিল আমার কাছেও সেইভাবেই যাওয়া-আসা করিত। আমাদের পতিতা নারীসমাজেব একটি রীতি এখানে উল্লেখ করিতেছি। বাবুর বন্ধু বা পরিচিত বন্ধুদের সহিত কুভাবে আসক্ত হওয়া পতিতা নারীর পক্ষে নিন্দার বিষয় ; অবশ্য প্রলোভনের বশীভূত হইয়া অনেক বেশ্যা গোপনে এই নিয়ম পদদলিত করিয়া থাকে, কিন্তু পতিতাসমাজে তাহার দুর্নাম রটে। ভদ্রসমাজে অনেকসময় যে সকল বন্ধুবিচ্ছেদ দেখা যায় তাহার কতক এই বেশ্যাপল্লীর বাবু ও বন্ধু লইয়া ঘটে, এমন কি ইহার ফলে মারামারি খুনোখুনি পর্যন্ত হইয়া যায়।

আমি অভাবে পড়িয়া অর্থলোভে এই দুই বন্ধুকে প্রণয়ীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। তাহাদের মধ্যেও কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব দেখি নাই।

আমার এ প্রকার কার্যের জন্য পতিতারা অনেকে আমায় নিন্দা করিত, আমি ভাবিতাম সমুদ্রে যার শয়ন, শিশিরবিন্দুতে তার কি ভয়? পতিতাই যখন হইয়াছি তখন কলঙ্কের পসরা তো মাথায় নিয়াছি ; 'বলিদান' নাটকের পাগলির সেই গানটি মনে পড়ে।

কলঙ্ক যার মাথায় মণি,
লুকানো প্রেম তারই সাজে,

নরকে যখন ডুবিয়াছি তখন একেবারে ইহার গভীর তলায় যাইয়া দেখি পরতে-পরতে কত রকমের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

ক্রমশ দেখিলাম, এই উকিল-ব্যারিস্টার বাবুদের পরিচয়ে দুই-একজন উঁচুদরের লোক আমার ঘরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের নিকট অনেক টাকা পাইলাম। আমার মাথায় এক নূতন ফন্দি আসিল। আমি জানিতাম, কলিকাতার অনেক বড় বড় লোকের কাছে এই উকিল ব্যারিস্টারদের যাতায়াত ও আলাপ-পরিচয় আছে। সেই সকল বড় লোককে আমার ঘরে আনিবার জন্য আমি ইহাদিগকে নিযুক্ত করিলাম, কথা রহিল, টাকার অর্ধেক তাহারা দুইজনে পাইবে।

আমি এবার খাঁটি বেশ্যা হইলাম। রামবাগানে থাকিতে নিম্নশ্রেণির লোকেরা রাস্তা হইতে দুই-একটি বাবুকে ফুসলাইয়া আমার ঘরে আনিত। পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবের শাসনে তাহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কলিকাতা শহরে ভদ্রলোকও বেশ্যার দালালি করে তাহা জানিতাম। কোনো কোনো পতিতা নারীর নিকটে আমি ভদ্রলোক দালাল রাখিবার পরামর্শ পাইয়াছিলাম, কিন্তু তখনও আমার বিবেক ও নীতিজ্ঞান একটু ছিল বলিয়া তাহা পারি নাই। আজ পাপপথের শেষ সীমায় আসিয়া হৃদয়ের অবশিষ্ট সদ্ভাবটুকুকে পদদলিত করিতে আমি আর ইতস্তত করিলাম না।

আমার উকিল ও ব্যারিস্টার দালাল দুইটি বেশ চতুর ও বুদ্ধিমান, দালালি-কার্যে তাহারা খুব পটু। দিনের পর দিন তাহারা আমার ঘরে বড় বড় লোক আনিতে লাগিল। কেহ

উচ্চশিক্ষিত জমিদার-পুত্র, কেহ রাজনীতিক নেতা, কেহ খ্যাতনামা চিকিৎসক, কেহ সমাজ সংস্কারক, কেহ ধনী-ব্যবসায়ী। ইহাদের মধ্যে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের সংখ্যই অধিক। বাংলাদেশের বাহিরের লোকও আসিতে লাগিল।

চার-পাঁচ মাসের মধ্যেই আমার হাতে কিছু টাকা জমিল। আমার দালালরাও প্রচুর অর্থ পাইল। আমি আমার মনের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, আমি কত ক্ষুদ্র, কত হীন হইয়াছি, নিত্য মিথ্যাচার, প্রতিদিন প্রতারণা, কেবল অর্থগৃধ্নুতা—ইহার ফলে আমার হৃদয় যেন শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের মত হইয়া উঠিল। দর্পণে মুখ দেখিয়া বুঝিলাম আমার সে লাবণ্য নাই, সে কান্তি নাই, নরকের ঘৃণিত ছবি যেন ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। বয়োবৃদ্ধির অনুপাতে সোনাগাছিতে আবার আমার ঐ উকিল-ব্যারিস্টার বন্ধু আমাকে ত্যাগ করেন নাই। ইঁহাদিগের পরামর্শে আমি স্থানত্যাগপূর্বক ভবানীপুরে আসিয়া নূতনভাবে জীবিকা অর্জন আরম্ভ করিলাম। মনস্তত্ত্ববিদগণ জানেন এবং দীর্ঘকাল এই ঘৃণিত ব্যবসায় আমিও এ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলাম যে জগতে যাহা সুলভ ও সহজপ্রাপ্য তাহা প্রকৃতপক্ষে সুন্দর হইলেও তত মোহজনক হয় না ; কিন্তু যাহা দুষ্প্রাপ্য ও সর্বাপেক্ষা দুর্লভ, তাহাই সমধিক প্রলোভনের বস্তু। আমি ভবানীপুরে একটা সুরম্য ভবনে মিস্ মুখার্জি নামে ব্যারিস্টার সাহেবটির শ্যালিকারূপে সাধারণের দুষ্প্রাপ্য হইয়া আসর জমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ফলও ফলিল। বাল্যে এবং কৈশোরে বিদ্যা অর্জন করিয়াছিলাম, পরে মানবসমাজের নানা স্তরের নানাপ্রকার জীবের সহিত অবাধ মিলনে মনুষ্যহৃদয়ের অতি গূঢ় তত্ত্বও সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম, সুতরাং মিস মুখার্জি-রূপে যখন সভ্য বন্ধুমহলে হাস্যরসিকতার অভিনয় করিতাম, যখন আপ-টু-ডেট্ সাজসজ্জার হাবভাববিলাসে বিগতপ্রায় যৌবনশ্রীর নূতন সংস্করণ লুব্ধ লোকচক্ষুর সম্মুখে ধরিতাম, যখন পার্কে হাত-ধরাধরি করিয়া ভগিনীপতি ব্যারিস্টারের সঙ্গে সান্ধ্যসমীরণ উপভোগ করিতাম, যখন একটি মাত্র কটাক্ষে অপরিচিতকে পরিচিতের পর্যায়ভুক্ত করিয়া বাটিতে আনিয়া স্বহস্তে পরিপাটিরূপে চা পান করাইয়া পরিতৃপ্ত করিতাম ও সঙ্গলিপ্সার দুর্দম্য বেগ তাঁহাদের হৃদয়ে সৃষ্টি করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিতাম, যেন আমার হৃদয়ের সে আবিল স্বার্থদুষ্ট রূপ কাহারও নয়নপথে পড়িত না, বরং উর্ণনাভের বিস্তৃত জালে তাঁহারা আবদ্ধ হইয়া আমার সহিত নিভৃত অলাপের অনুসন্ধান করিতেন। অবশ্য বলিতে হইবে আমিও কাহাকেও...। যাঁহার যখন উদয় হইত তিনিই যে আমার হৃদয়কমলের একমাত্র ভৃঙ্গ এবং অন্য সকলকেই মরীচিকা লইয়া ফিরিতে হইবে, তাহাকে বুঝাইয়া দিতাম।

কত সতীত্বের ভাণই করিয়াছি, আজ তাহা স্মরণ করিলেও হাস্য করিতে পারি না। একদিন সন্ধ্যার সময় সম্মুখে টিপয়ের একদিকে মিঃ গোস্বামী ও অপরদিকে প্রফেসার চৌধুরী। উভয়েই ধনী, উভয়েই সুপুরুষ। আমি হারমোনিয়মটি অঙ্গে স্থাপন করিয়া বেশভূষার পারিপাট্যের পরিবর্তে ইচ্ছাকৃত একটু অযত্নের ভাবে উন্মাদনা বৃদ্ধি করিয়া গান ধরিয়াছিলাম—

আজি অভিসার রজনী।
কোথা সে আমার কতদূরে তার দেখা পাব বল সজনি।
প্রেমের কমল ফুটেছিল তারই আলোকরেখার পরশে
দিন দিন করি বিতানু জীবন তাহারই পাবার হরষে।

মিঃ গোস্বামী বলিলেন, 'এখন বলুন তো কে সে এই ভাগ্যবান!' আমি বলিলাম, 'সে একটি মানসপুরুষ, একটি আদর্শ প্রণয়ী, বাস্তব জগতের কোনো প্রাণী না হইতেও পারে।' এমন সময় মিঃ চৌধুরী আমার পশ্চাৎদিকে অঙ্গুলিনির্দেশপূর্বক বলিলেন, 'ওই যে সে পুরুষপ্রবর, আপনি আসিয়াই ধরা দিল।' আমি ফিরিয়া চাহিতেই দুজনে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। আমি দেখিলাম আমার উকিলবাবুর সহিত আধুনিক সমাজের একটি নিতান্ত অচলবেশধারী অর্ধবয়স্ক মাণিক। আহা তাতে ছিল না কি? ঘড়ি, চেন, গন্ধতেল, আতর, চশমা, ছড়ি, শাল, ফুলমোজা, পানে-পানে ফাটা-ফাটা একজোড়া ঠোঁট, মুখের মত চলনবলন এবং যাহা কিছু অশোভনীয় তার সবই। তিনি আসিয়াই বলিলেন, 'আমরা বাহিরে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া আপনার অপ্সরা-কণ্ঠ শুনিতেছিলাম। এ রকম আর একবার শুনেছিলাম। ওঃ—বহু দিনের কথা, এই কলিকাতার রামবাগানের মতি বিবির বাড়ি। আমি পর্ববঙ্গের একজন পাট-ব্যবসায়ী। আমার পয়সা খায় নি এমন মেয়েমানুষ শহরে কম। কিন্তু আজ তোমার বাড়ি যা শুনলাম, জীবনে আর কোথাও তা শুনব না, তোমার কানাচ আর ছাড়ব না। এঁরা কারা!' এই কথা বলিয়াই তিনি একটি গিনি দিয়া আমাকে সম্মানিত করিলেন। তাঁদের ভাব দেখিয়া আমি একটা ঘৃণাসূচক ইংরাজি শব্দ উচ্চারণপূর্বক উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাঁকিলাম—'দারোয়ান—দারোয়ান—' দারোয়ান হাজির হইলে বলিলাম, 'ইস্‌কো নিকাল দেও।' পরে নিজেই সে কার্যের ভার লইয়া তাঁহাকে আমার সঙ্গে আসিতে ইঙ্গিত করিলাম এবং রাস্তার ধারে গেটের কাছে আনিয়া বিদায় দিলাম। বলিলাম, 'আমি তোমারই ; তবে সময় বুঝিয়া কথা কহিতে হয়। যাঁরা বসিয়াছিলেন তাঁরা আমাকে সহোদরার মত দেখেন।'

ক্রমশই রাত্রি অধিক হইতে লাগিল ; দুজনেই নাছোড়বান্দা। উভয়েরই ধৈর্যের সীমা নেই। মিঃ গোস্বামী পকেট হইতে হ্যামিল্টনের বাড়ির তাঁর সোনার সিগারেট-কেসটি টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন, আমি কেস হইতে সবগুলি [সিগারেট] বাহির করিয়া একটি কাগজের মোড়কে বন্ধ করিয়া কেসটি আলমারি-বন্ধ করিয়া বলিলাম, 'অন্তত ঐ মূল্যবান জিনিসটির অনুরোধেও আপনাকে প্রতি সন্ধ্যায় একবার মিস্ মুখার্জির শরণাগত হতে হবে ; কেবল যে দিন হতে মিস্ মুখার্জিতে আপনার স্নেহের অভাব দেখব সেইদিন এটা ফিরে পাবেন।' মিঃ গোস্বামী একটু বিহ্বলভাবে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'সেটা কি কখনও সম্ভব হবে? আপনাকে ভুলব?' মিঃ চৌধুরী হাসিয়া বলিলেন, 'তা হলে কেস্‌টি মহাশয়ের পকেটে প্রত্যাবর্তনও আর করল না দেখছি।' মিঃ গোস্বামীর তাঁর সিগারেট-কেসটির অবনতির জন্য অনুতপ্ত হইয়া একটু নীরব ভাব অবলম্বন করিতেই আমি একটা আঘাত

করিলাম, বলিলাম, 'কি রকম, বড় বাড়ির কথা ভাবছেন নাকি?' তিনি বললেন, 'সে আবার কি?' আমি বললাম, 'Lion's den-এ (সিংহের গহ্বরে) একটা beautiful cub-এর (সুন্দরী সিংহের বাচ্চা) শিকারে যাবেন ভাবছেন তো?' তিনি 'What a fiction !' বলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে মিঃ চৌধুরী বলিয়া উঠিলেন, 'But facts are more strange than fiction' (অর্থাৎ বাস্তবজগতের ঘটনাগুলি কল্পনারাজ্যের অদ্ভুত ব্যাপার অপেক্ষাও অধিকতর আশ্চর্যজনক হয়ে থাকে)।

মিস্টার গোস্বামীর অন্তর্ধানের সঙ্গে-সঙ্গেই আমার যেন একটু শিরঃপীড়া বোধ হইতে লাগিল। আর-একটি অসুখ, যাকে palpiation of the heart (যাকে হৃৎপিণ্ডের ধরফড়ানি বলে) রোগটি সময় বুঝে দেখা দিল। দুরাত্মার ছলের অভাব নাই, আমি বেশ একটু যেন কাতর হইয়া শোফায় অঙ্গ ঢালিয়া দিলাম ; আর, 'ওঃ—লাইটটা কি স্ট্রং' বলিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিতেই মিঃ চৌধুরী আলোকটি সুইচ অফ করিয়া দিলেন। তখন চাঁদের কিরণ ঘরে আসিয়া পড়িয়াছিল ; মিঃ চৌধুরী আমার নিকটে তাঁর চেয়ারখানি টানিয়া আনিতেই আমি তাঁর হাতটি টানিয়া আনিয়া বুকের উপর রাখিয়া বলিলাম—'আহা মিঃ চৌধুরী, আজ গোস্বামীকে কিরকম জব্দ করেছি বলুন ত। ৩০০ টাকার কেসটি যে হজম করলাম এটি অবশ্য বুঝতে বাকি নেই, আর ও কি আসবে বলেন।' তিনি যেমন একটা উত্তর দিতে যাইবেন, এমন সময় তাঁর হাতের আংটিটা খুলিয়া লইয়া বলিলাম, 'আপনাদের উভয়েরই আজ পরীক্ষা। ত্যাগের আঁচেই ভাই প্রণয়ের গাদ কাটে, বলিয়া গুণ গুণ করিয়া একটু সুর তুলিলাম :

ভালবাসার কষ্টিপাথরে
আজ তোমার কষব পরাণ...

এমন সময় ব্যারিস্টার-বন্ধুটি আসিয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন, চাঁদের আলোয় দুটি প্রাণীর অস্তিত্ব অনুভব করিয়া, 'তা হলে Let me retire for the night' (তা হলে আজ রাত্রের মত বিশ্রাম লাভ করি) বলিয়া দরজাটি বাহির হইবার সময় টানিয়া দিয়া গেলেন। আমার এই দালাল বন্ধুদুটির নিজ নিজ ব্যবসায়ে পসার হয় নাই, সেই জন্য আমার এই কার্যে তাঁহারা সহায়তা করেন, দালালির অংশ আধাআধি।

কিন্তু আশা মিটে কই? অর্থেও সঙ্কুলান হয় না, বিশেষত এই মহাপাপের পয়সারও আবার দাবিদার দুইজন। একদিন ব্যারিস্টারকে বলিলাম, 'তুমি একবারে অকর্মা। এত জায়গায় জাল ফেললে একটিও রুই-কাতলা ধরতে পারলে না। রাজধানীর আশেপাশে জাল হাতে করে ঘুরলে হবে না, একটু দূরে যাও। যে বাঙালটি, সেই যে পাট ব্যবসায়ী গুহ, সেটি বেশ জবর মক্কেল ছিল, দর্শনেই এক গিনি, স্পর্শনে হয়ত পাটের সওদাগরি জাহাজও খানকতক এই গহ্বরে রেখে যেত। পারবে ধরতে তাকে।'

কিছুদিনের জন্য ব্যারিস্টার দালাল উধাও হইলেন। শেষে একটি প্রকাণ্ড কাণ্ড করিয়া বসিলেন। আসাম হইতে বেশ একটি ভদ্রবেশধারী ধনবান মনুষ্য গ্রেপ্তার করিয়া আনিলেন।

তিনি চিরকুমার, ব্রত প্রচারের জন্য তাঁহার উৎসাহের অভাব নাই। তিনি প্রথম দিনেই আমাদিগের আতিথ্য স্বীকার করিয়া রজনীযোগে চিরকৌমার্যের মহিমা কীর্তন শুরু করিয়া দিলেন। আমি কপটাচারে অভ্যস্ত। গভীর রাত্রে তাঁহার সঙ্গে একাকী এ বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব বলিয়া রাত্রির জলযোগ শেষ করিয়া লইলাম।

মধ্যরাত্রে আলো জ্বালিয়া, ফ্যান খুলিয়া দিয়া, যুবক-যুবতীর পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণকে লক্ষ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কঠোর অশুভ মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলাম। বলিলাম, 'ঈশ্বরের এই পবিত্র রাজ্যে মানুষ নানাবিধ কৃত্রিম উপায়ে পাপপথে সর্বদা নরনারীকে আকর্ষণ করিতেছে।' উদাহরণ স্বরূপ তাঁহাকে একটি প্যাকেট হইতে কতকগুলি প্যারিসের ছবি খুলিয়া এক-একটি দেখাইতে লগিলাম। যে পাকা শিকারী সে কখনও চিড়িয়ার প্রাণ বধ করে না। সিংহ, ব্যাঘ্র—প্রভৃতি জবরদস্ত হিংস্র জন্তুই তাহাদের শিকারের বস্তু।

যখন ছবিগুলি দেখাইয়া, তাহার মধ্যে কোন্ অংশ কিরূপ অশ্লীল, বিশেষভাবে তাহার বিচার করিতে লাগিলাম, দেখিলাম যেন তাঁহার আস্ফালন অনেকটা মন্দীভূত হইয়াছে, তিনি আগ্রহ সহকারে সেগুলি যেন দুই চোখ দিয়া গিলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার পর বলিলাম, 'নরনারীর বিবাহে বা প্রণয়-মিলনে এই সব ঘৃণিত কার্যই সম্পাদিত হয়। আপনি যদি চিরকুমারব্রত ধারণ করিয়া জীবনযাপন করিতে পারেন আমিও আপনার সহিত চিরকুমারীরূপে এই মহান ধর্ম প্রচারে সহায়তা করিব।' তিনি বলিলেন, 'এরূপ ছবি আরও আছে?' আমি তখন একটি বাক্স আনিয়া তাঁহার নিকট হাজির করিলাম ; তিনি উৎসাহ সহকারে আমার নিকট এমনভাবে ঘেঁসিয়া বসিলেন যে কপট চিরকুমারী আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য চেয়ারটি সরাইয়া লইলাম। তিনি বলিলেন, 'আপনি কিজন্যে এতগুলি ছবি সংগ্রহ করিয়াছেন?' আমি বলিলাম, 'পাপ হইতে দূরেতে থাকিতে হইলে পাপের স্বরূপ পূর্বে চিনিয়া লওয়া প্রয়োজন, তাই এইগুলি যত্ন করিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু কি আশ্চর্য যখন নিভৃতে এইগুলি সম্মুখে রাখিয়া মনে মনে ইহাদের কুৎসিত ভাবগুলি আলোচনা করি, তখন কি একটা ঘৃণিত লিপ্সা প্রাণে জাগিয়া উঠে। যেন, ছি ছি সে কথা বলিতে লজ্জা মনে হয়। আপনি চিরকুমারব্রতধারী, বলিতে লজ্জা করে, তখন মনে হয়—বোধ হয় অতি নিকট-আত্মীয় বিরুদ্ধ সম্পর্কীয় একজন সুবেশধারী যুবকের সঙ্গও আমার পক্ষে নিরাপদ নহে।

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া তিনটে বাজিল। আমি বিশ্রামের প্রস্তাব করিলাম। তিনি সম্মত হইলে, উভয়ে একই কক্ষে শয়ন করিলাম, আমি নিদ্রার ভাণ করিয়া নীরব রহিলাম, কিন্তু জাগ্রত ছিলাম, তিনিও নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। আমি পূর্বেই পরিচয় পাইয়াছিলাম, তিনি মহাধনী। এক্ষণে সাড়া দিয়া বলিলাম, 'এই বাড়িখানি আমি ভাড়া লইয়াছি, বিশ হাজার টাকা হইলে এখানি নিজস্ব করিয়া, এইখানে দুজনে থাকিয়া এই মহামন্ত্রের প্রচার করিতে সমর্থ হই, নচেৎ শীঘ্রই এ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। তিন মাসের বাড়িভাড়া ১০০

টাকা হিসাবে বাকি পড়িয়াছে।' তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীকার হইলেন। বলিলেন, 'যদি আপনার মত সঙ্গী পাই তবে যথাসর্বস্ব এই কার্যে ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছি। বুঝিলাম হস্তগত করিয়াছি। তখনও তাঁহার নিদ্রা আসে নাই, আসিবার সম্ভাবনাও ছিল না, তখন আমার পবিত্রব্রতধারী, আমার জীবনসঙ্গীর একটু পরিচর্যায় নিযুক্ত হইলাম। নিকটে আসিয়া বলিলাম, 'নূতন স্থানে আসিয়া আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে, একটু তোয়াজ করিলেই সুস্থ হইতে পারিবেন।' আমার আর তখন ভয় কি? তিনিও পবিত্র আমিও পবিত্র। তাঁহার মস্তক নিজ অঙ্কে স্থাপন করিয়া কেশগুলির মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিলাম। বলিলাম, 'যুবক ও যুবতীর মনের দৃঢ়ভাবও, পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক। প্যারিস-ছবিগুলির একটি ছবির প্রসঙ্গ তুলিয়া তাঁহার মানসপটেও ভাবটি চিত্রিত করিয়া দিলাম, তিনি তৎক্ষণাৎ পার্শ্ব পরিবর্তন করিলেন, আমি তাঁহার শোচনীয় অবস্থা অনুভব করিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলাম। আমরা পিশাচী, পৈশাচিক আনন্দই আমাদের আনন্দ। তাঁহাকে এই পর্যন্ত পাপের পথে আগাইয়া দিয়া, তাঁহারই অনতিদূরে শয্যা রচনা করিয়া শয়ন করিলাম।

পরদিন প্রভাতে কি দেখিলাম। একদিন পূর্বে যিনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন, যিনি কখনও কাহারও পাণিপীড়ন করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনিই এক রাত্রির মধ্যে আমার পরম ভক্ত, অনুগত দাসে পরিণত হইয়াছেন। যে নারী সর্পদষ্ট অঙ্গুলির ন্যায় তাঁহার পরিত্যাজ্য সেই নারীশিরোমণি আমি বারবিলাসিনী মানী, ওরফে মিস্ মুখার্জি ভিন্ন তাঁর অন্ন রোচে না। চা আসিল, বিস্কুট আসিল, নিষিদ্ধ পক্ষীর একজোড়া ডিম আসিল, কিন্তু তাঁহার মুগ্ধ নেত্র আমায় অনুসরণ করিতে লাগিল। আমি যাইয়া চা পানে রত হইলাম, তখন তিনি শীতল চা-টুকু ঢোকে ঢোকে গিলিতে লাগিলেন।

বাড়ি ক্রয় করিবার জন্য দুই-তিন মাসের মধ্যে বিশ হাজার টাকা আমার হস্তগত হইল। আমার অঙ্গ মণিকাঞ্চনাদি নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইল। অলঙ্কারে আমি আপত্তি করিলেও তাহা গ্রাহ্য হইল না। আমি একদিন তাঁহাকে বলিলাম, আমিই চিরকুমারী থাকিয়া ব্রত উদ্‌যাপন করিব, তিনি অনয়াসে সংসার আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারেন। তিনি বলিলেন, আশ্রমের সেরূপ ওলটপালট করিতে আমাকে নাকি তাঁহার সঙ্গে যোগ দিতে হইবে। আমি তৎক্ষণাৎ দুই কর্ণে দুই হস্তের দুটি অঙ্গুলি প্রদান করিতেই অসাবধানতাবশত তাঁহার সম্মুখে বে-আব্‌রু হইয়া পড়িলাম, তিনি উন্মত্তের মত আসিয়া আমাকে গভীর আলিঙ্গনে নিষ্পীড়িত করিয়া গণ্ডদেশে এক-নিশ্বাসব্যাপী চুম্বন করিয়া দিলেন।

তারপরই একদিন সরাসরি বিবাহের প্রস্তাব। আমি বলিলাম, 'এর কর্তা আমি নই, দাদাবাবু।' দাদাবাবু আসামীর সঙ্গে বাঙালি শিক্ষিতা যুবতীর এরূপ মিলন অসম্ভব বলায়, আমার গবুচন্দ্র প্রণয়ীটি কিল খাইয়া কিল চুরি করিয়া অদৃশ্য হইলেন।

কুমাব গোপিকাবমণ রায় উল্লিখিত জমিদার যুবকেব নাকি বিশেষ বন্ধু, কুমার বাহাদুরের আলয়ে আমার হতাশ প্রণয়ী নিমন্ত্রিত হইতেন শুনিয়াছি। কতদিন ইনি কুমার বাহাদুবের গৃহে আমাকেও লইযা যাইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু আমি সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। তবে কুমার বাহাদুরকে একদিনের জন্য আমার প্রণয়ীর মারফত আমার কুটিরে পদধূলি প্রদানের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু জানি না কি অপরাধে তিনি আমাকে কৃতার্থ করেন নাই। ওই সময় আমি বেশ্যা বলিয়া পরিচিতা ছিলাম না। আমার এই বিচিত্র জীবনের আখ্যায়িকার কত কথাই লিখিলাম। মানুষ প্রবৃত্তির তাড়নায় কত ঘৃণিত কার্য করিতে পারে তাহাও দেখাইলাম। যাহা পবিত্র, মানুষ তাহাকে কলুষিত করিতে বিশেষভাবে চেষ্টিত। যে মুখখানি আবরণহীন, লোকে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করে না, যাহা আবৃত, যাহা পাপস্পর্শে মলিন হইয়া যায়, লোক তাহাতেই আকৃষ্ট। যে নারী প্রকাশ্যভাবে পুরুষের সঙ্গ কামনা করে, পুরুষ তাহাকে চায় না। অথচ যে কুলমহিলা পাপস্পর্শে সদা ভীত, পাপাত্মাগণ তাহাকেই পাপপঙ্কে নিমজ্জিত করিতে চায়! হায়, আমার চিরকুমারব্রতধারীর কি পরিণতি ঘটিল! কোথায় সেই ব্রত! কোথায় তার উদ্‌যাপন! এত অল্পদিনে নারী স্পর্শেই তাঁর দৃঢ় হৃদয় চূর্ণ হইয়া গেল, সংকল্প বিকল্পে পরিণত হইল। তিনি ধন-মান-যশ হারাইয়াছেন, এত অল্পদিনেই আমার চরণে দাসখত লিখিয়া দিয়া ধন্য হইলেন। আমি কাহাকেও ক্ষমা করি নাই। সুন্দর রাজঅট্টালিকাবাসী ধনী মাড়োয়ারি মহলেও আমার বিশেষ কদর ছিল। তাহাদের কতক অর্থও আমার হস্তগত হইয়াছে। আমার উকিল দালাল একজন বিশিষ্ট মাড়োয়ারিকে আনিয়াছিলেন। সে আমাকে দেখিবামাত্র বলিল, বিবি সাহেব, স্বজাতীয় নাদাপেটি মাড়োয়ারি নারীতে কোথাও শোভা নাই। বিদেশীয় আস্বাদেই পরম তৃপ্তি। সে আমাকে সোহাগ করিতে বলিত। আমি তাহাকে 'প্রাণেশ্বর' বলিয়া একটি করিয়া গিনি সংগ্রহ করিয়াছি। একটি চুম্বনের মূল্যস্বরূপ দুটি গিনিও হস্তগত করিয়াছি। একদিন বাগানবাড়িতে যাইয়া আমি ৩০০ টাকা আদায় করিয়াছিলাম। যাহারা হিন্দুধর্মের এমন ধ্বজা উড়ায় তাহারা যে এমন কামান্ধ, পরদারপরায়ণ, তাহা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।

একাদশ

টি-পার্টি

ভবানীপুরে উঠিয়া আসিয়াছি তার পর হইতে আমি মিস্ মুখার্জি নামেই পরিচিতা। আমি এখন আর 'মানদা' 'ফিরোজা বিবি' বা 'মানী দিদি' নহি। প্রতিদিন আমি নূতন নূতন মতলব আঁটিতে লাগিলাম। আমার এই মতলবের মধ্যে টি-পার্টি ছিল প্রধান। আফিস ছুটির পর আমার দালাল আসিতেন। যাঁহারা আসিতেন তাঁহারা ভাল-মন্দ উভয় শ্রেণিরই ছিলেন। দুই-এক ঘণ্টা আলাপ-পরিচয়েই আমার প্রয়োজনীয় ব্যক্তিটিকে বাছিয়া লইতে

পারিতাম। এভাবে যাঁহারা আসিতেন তাঁহাদের দ্বারা আমার তেমন ভাল আয় হইত না, বিশেষত এদের জন্যও খরচ হইত। বড়লোকের পকেটে হাত দিতে না পারিলে আমার ও দালালদ্বয়ের কি করিয়া পোষাইবে।

একদিন ব্যারিস্টার সাহেবকে বলিলাম, 'দেখ, একটা কাজ কর, এই কলিকাতা শহরের বড় ব্যবসায়ী, বড় চাকুরে, ডেপুটি, মুন্সেফ, জমিদার, উকিল, ব্যারিস্টার, স্কুলের শিক্ষক, প্রফেসার, দেশকর্মী, সংস্কারক—এদের মধ্যে যাহাদের পকেটে বেশ টাকা আছে তাদের প্রত্যেক শ্রেণি হইতে পাঁচজন করে নিমন্ত্রণ করে একটা ভাল পার্টির বন্দোবস্ত কর দেখি।'

ব্যারিস্টার সাহেব দিন-চারেকের মধ্যে একটা লিস্ট করিয়া আমাকে দেখাইলেন, লিস্ট-মধ্যে পূর্বজীবনের পরিচিত তিনটি ভদ্রলোকের নাম আমি ছাঁটিয়া দিলাম। তিনি নূতন নাম দ্বারা তাহা পূরণ করিলেন। এক রবিবারে এই পার্টির আয়োজন হইল। আমার নামে ছাপানো নিমন্ত্রণ-কার্ড দারোয়ান দ্বারা পাঠানো হইল। স্কুলের শিক্ষক এই নিমন্ত্রণে একজনও আসেন নাই, মুন্সেফ মাত্র একজন আসিয়াছিলেন, তিনি পার্টি শেষ হইবার পূর্বেই চলিয়া যান। দেশকর্মী এবং উকিল ও ব্যারিস্টার প্রায় সকলেই আসিয়াছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যেও প্রায় অনেকেই আসিয়াছিলেন। জলযোগের সামান্য বন্দোবস্ত ছিল, আর ছিল বিলাতী তরল পদার্থ। অবশ্য এ জিনিসটা সকলের মধ্যে পরিবেশিত হয় নাই। এই উপলক্ষে একটা ব্রহ্মসঙ্গীত এবং রবীন্দ্রনাথের চারিটি গান আমি গাহিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত প্রদীপকুমার রায়ও কয়েকটি গান গাহিয়াছিলেন। একজন দেশকর্মী একটা স্বদেশসংগীত গাহিতে আমায় অনুরোধ করিলেন। আমি এই নূতন গানটি গাহিয়াছিলাম।

হাত দিয়ে তুই বাঁধলি হাত
প্রাণ দিয়ে প্রাণ বাঁধলি না ;
এ যে সোনা ফেলে দিলি গেরো
আঁচলে, তা বুঝলি না।
তিরিশ কোটি বন্ধু পেলে,
জগত জয় অবহেলে
করতিস, তা আর পারলি না।

গান শেষ হইলে রাজনৈতিক তর্কবিতর্ক আরম্ভ হইল ; একজন কর্মী পদ্ম সরকারের[৩৮] নিন্দা আরম্ভ করিলেন—তার নাকি কোথায় দুই-একটা রক্ষিতা আছে, তাহার কথা, তাহার জালজুয়াচুরির কথা তুলিয়া তাহাকে অত্যন্ত হেয় প্রতিপন্ন করিলেন। মিঃ ঘোষ ইহার প্রতিবাদ করিলে, অন্য এক দেশকর্মী মিঃ ঘোষকে পর্যন্ত আক্রমণ করিতে ছাড়িলেন না। তিনি ইহাও বলিতে একটু ইতস্তত করিলেন না যে, দেশবন্ধু এদের লাই দিয়ে বড় করে

বড়ই ভুল করেছিলেন। দেশবন্ধু ভুল করিয়াছিলেন—এ কথাটাতে আমার প্রাণে যেন কেমন লাগিল, তখন আমিই ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম, দেশবন্ধু ভুল করিয়াছিলেন কি ঠিক করিয়াছিলেন, তাহা তোমার-আমার মত লোকের বুঝিবার শক্তি নাই, সে অগাধ সমুদ্রের তলস্পর্শ তোমার-আমার মত লোকের কাজ নয়। তিনি কাহারও উপর কোনো কার্য বিশেষের জন্য বিদ্বেষ বা প্রতিহিংসা পোষণ করিতেন না। তিনি লোক চিনিতে পারিতেন বলিয়াই এমন লোক ও স্থান দিয়াছিলেন। যেমন কুস্তিগির পালোয়ানের প্রয়োজন, তেমনি এই লোক দ্বারাও তিনি তার উপযুক্ত কাজ করাইবার জন্যই রাখিয়াছেন।

এর পরও তিনি জের ছাড়িলেন না, বলিলেন, 'এ যে বিশ্বাসঘাতক'—সেই প্রমাণ বোধ হয় দেশবন্ধু পান নাই। এখন তার মূর্তি বাহির হইয়া গিয়াছে—মহারাজা ক্ষৌণিশের কাছে গোপনে দলের খবর এ লোকটাই দিত...তারাদিদির প্রণয়ীর এ অপমানটাতে আমার মনটা যেন কেমন হইয়া গেল, প্রকাশ্যে বলিলাম আপনারা শ্লীলতার বাহিরে যান কেন? বিশেষত পদ্মবাবুর অসাক্ষাতে বলা কি ভাল! তার কথা না জানে কে, তাকে তো লোকে ওই চক্ষুতেই দেখে। আজ যে পার্টিতে তাকে বলি নাই, কারণ, তাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে জানিলে হয়ত অনেক বিশিষ্ট লোকও নাও আসিতে পারেন।'

এই ভদ্রলোকটি আবার বলিতে লাগিলেন, 'বীরেন শাসমল[৩৯], জিতেন ব্যানার্জি[৪০] এবং হেমন্ত সরকার[৪১] কেন চলিয়া গিয়াছেন, তাহা কি আপনারা জানেন?' আমি তাঁকে আর বাড়িতে না দিয়া কোনোপ্রকারে থামাইয়া রাখিলাম।

মিঃ ঘোষ, ব্যারিস্টার সাহেবের সঙ্গে অন্য ঘরে যাইয়া একটু টনিক খাইয়া আবার আসিলেন। তিনি বলিলেন, 'মিস্ মুখার্জি, কিছু মনে করিবেন না। সেদিন ঢাকার কাগজে দেখা গেল কোনো মেয়ে-বোর্ডিং-এ আবর্জনার স্তূপে এক মৃত ভ্রূণ পাওয়া গিয়াছে। ইহা লইয়া ঢাকায় মহা হুলস্থূল। আজকাল যে-প্রকার অবাধ মেলামেশা চলিতেছে, ইহারই ফলে এ ভ্রূণহত্যা নহে কি?' ঢাকার এক ভদ্রলোক বলিলেন, 'একটা নহে, অনেক।'

আমি বলিলাম, 'অবাধ মেলামেশা দোষের নহে, নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে হয়। এই যে মেয়েগুলি আজকাল ছেলেদের সঙ্গে এক কলেজে পড়ছে—দেখুন তাদের কেমন সুন্দর চাল-চলতি, যেন ঠিক ভাই-বোন। প্রকৃতির যা নিয়ম—ভাই-বোন এক সঙ্গে—এরা ঠিক তাই...'। আমি শিক্ষিতা উদার মিস্ মুখার্জি, ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমাকে অবাধ মেলামেশা সমর্থন করিতে হইল। নইলে আমার মান থাকে কোথায়! অবাধ মেলামেশার জন্যই আজ আমি পতিতা।

মিঃ ঘোষ তখন বলিলেন, 'আপনি কি বলিতে চান যে ওই সব কলেজের ছেলেগুলি সব ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির! পূর্ণাঙ্গী মহিলাদের কাছে সমস্ত দিন ঘুরে-ফিরেও এদের কোনো

ভাবান্তর উপস্থিত হয় না?' আমি বলিলাম, 'সকলের কি আর এক রকম হতে পারে? উহাতে কাহারও যদি ভাবান্তর হয়—এবং যদি একটু -কিছু হয়ই—তবুও তেমন দোষ কি? স্বাধীন দেশে ত এমন কত হচ্ছে, তাতে কি আসে যায়!'

মিঃ ঘোষ তখন বলিলেন, 'তবে কি আপনি এ দেশটাকে ইংলণ্ড ও আমেরিকার ন্যায় দেখতে চান?' ইহার উত্তর কি দিব তাহা ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। এমন সময় মিঃ ঘোষ আবার বলিলেন, 'রুচিবাগীশ হেরম্ববাবু' নাকি 'থিয়েটারের বাড়ি দেখাইয়া দেওয়া'ও পাপ মনে করেন, কারণ উহাতে যে সকল স্ত্রী-পুরুষ যাইয়া থাকে তাহাদের নাকি মনোবৃত্তি ভাল নহে। আজ তাঁর কলেজে যে সকল যুবক-যুবতী এক সঙ্গে পড়ে তাদের মনোবৃত্তি কেমন তাহা যদি তিনি 'ব্যালটে' পরীক্ষা করেন তবেই বুঝিতে পারিবেন। হেরম্ববাবু কি অবাধ মেলামেশার ফলে ঢাকার দুইটি ব্রাহ্ম পরিবারের বিবাহের ফল এবং তজ্জন্য এক পরিবারের পুনরায় হিন্দুধর্ম গ্রহণের বিষয় অবগত নহেন? রমলা গুপ্তা, লীলাবতী প্রভৃতি মোকদ্দমার বিষয় কি তিনি শুনেন নাই? রমলা গুপ্ত ত তাঁহাদেরই সমাজের লোক।'

এ বিষয়ে, আমি আর বাড়াবাড়ি পছন্দ করিতেছিলাম না, বিশেষত রাত্রি অধিক হইয়াছিল। ক্রমে অনেকেই বিদায় গ্রহণ করিলেন, একটি খদ্দর পরিহিত যুবক রহিয়া গেলেন। ইনি এখন কৌমার্যব্রত পালন করিতেছেন, এরও বাজারে যথেষ্ট সুনাম আছে। ভাবিলাম, এদের মত কুমার আমার কুমারীর সংখ্যা যদি এমনভাবে বৃদ্ধি হয় তবে এ দেশের কি শোচনীয় পরিণাম।

গার্ডেন পার্টি

আমি নিজে পতিতা, তার উপর আবার সাজিয়াছি ভদ্রঘরের কুমারী, এইপ্রকার জুয়াচুরি আর ভাল লগিতেছে না। আমার হাতে হাজারকয়েক টাকা জমিয়াছে। এ হীন পাপবৃত্তি আর করিব না কল্পনা করিতেছিলাম, কিন্তু আমার দালাল দুইজন অসুখী হন দেখিয়া অনেকটা ইচ্ছার বিরুদ্ধে লিপ্ত আছি।

দেহবিক্রয় করিবার জন্য বার বার আমায় প্রলুব্ধ করিয়াছিল রানিমাসি, সেজন্য তাকে ততটা দোষ দেওয়া হয়ত চলে না, কারণ উহাই ছিল তাহার ব্যবসায়। কিন্তু আমার এই দালালদ্বয়, যাহারা ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়া পরিচিত এবং উচ্চশিক্ষার ডিগ্রিও যাদের আছে, তাদের এই প্রকার প্রবৃত্তির বিষয় যখন ভাবিতাম, তখন মনে হইত, হায়, এ জগতের কি কল্যাণ আছে! যে জাতির মধ্যে উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকের ছেলে বেশ্যার দালালি করে—দালালি করে কেন, বেশ্যাকে বেশ্যাবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে দেখিলে তাহাকে ঐ পাপবৃত্তি করিতে প্রলুব্ধ করে, তাহারাও ভদ্র এবং শিক্ষিত। আমি দেখিয়াছি, বারবনিতা সমাজেও কেহ এই বৃত্তি পরিত্যাগ করিতে চাহিলে, অনেক পতিতা তাহাকে সাহায্যই করিয়া থাকে, কিন্তু ভদ্রনামধারী লোকের এ কি প্রবৃত্তি। সেদিন রামবাগানের অবস্থাপন্ন

পতিতা-নারী চুনি গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে , তাহার আত্মহত্যার কারণ সে এক চিঠিতে লিখিয়া গিয়াছিল—'পতিতার জীবনে আমার ধিক্কার জন্মিয়াছে।' সে অন্যান্য পতিতাকেও এই বৃত্তি পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছে। যে পাপবৃত্তি করিতে প্রাণ চাহে না, তাহাতে লিপ্ত থাকিতে যে কি কষ্ট, তাহা কাহাকেও বুঝানো যায় না। একদিন আমার উকিল দালালটি বলিলেন, 'দমদমায়...বাবুর বাগানে একটা পার্টি দিব ঠিক করিয়াছি।' আমি বলিলাম, 'দমদমায় আর কেন, যদি দিতেই হয় তবে বাড়িতেই দাও।' তিনি শুনিলেন না, বাগানেই ভাল লোক আসেন, ইহাই বুঝিয়া পার্টির উদ্যোগ করিলেন। আমার নামে মুদ্রিত নিমন্ত্রণপত্রও বিলি হইল, কিন্তু কাহারা যে নিমন্ত্রিত হইলেন সে খবর আমি নেই নাই। অনিচ্ছায় যে কাজ, তাহাতে তেমন উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকে না। নির্দিষ্ট দিনে আমার নিজের মোটরে দমদমায় গেলাম। মোটর চালাইতেন খোদ ব্যারিস্টার সাহেব। আমি তাঁর বাম দিকে বসিয়াছিলাম, উকিল বাবু ছিলেন আমাদের পিছনে।

দমদমায় যাইয়া দেখি সেখানে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ২০/২৫ জন লোক বসিয়া আছে। কয়েকটি খদ্দর পরিহিত যুবক নানা আয়োজনে ব্যস্ত। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এরা কারা!' উকিলবাবু বলিলেন, 'যিনি পার্টির খরচ দিচ্ছেন...বাবু, এরা তাঁহারই লোক। যিনি খরচ বহন করিতেছেন তাঁহারও খদ্দরের জামা-কাপড় এবং পায়ে স্যাণ্ডেল দেখিয়া মনে মনে বড় বিরক্ত হইলাম। কারণ নিন্দিত পল্লীতে থাকিতেও এইপ্রকার খদ্দর পরিহিত বহু যুবক, প্রৌঢ়ের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা আয় হইয়াছে সামান্য। পুলিশ যেমন ওই সকল পল্লীতে তাহাদের দাপটে কাজ সারিয়া যায়, খদ্দর পরিহিত দেশকর্মী ভলাণ্টিয়ার নামধারী অনেক যুবকও বলে—আমরা দেশের কাজে ব্রতী, পয়সা পাব কোথায়? অনেক কবি এবং সাহিত্যিকের দলও রিয়েলিস্টিক আর্টের খোঁজে নিন্দিত পল্লীতে যাইয়া মার্জিত কথা বলে এবং বিনা খরচায় আর্টের স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করে, সুতরাং আমার বিরক্ত হওয়াটা যে খুব অন্যায় হইয়াছে তাহা অন্তত কোনো ব্যবসায়ী লোক মনে করিবেন না।

সেদিন শিষ্টতার খাতিরে একটা গান গাহিলাম। আমার পরে অন্য দুই-একজনও গান ধরিলেন। গান শেষ হইলে নারীনিগ্রহের কথা উঠিল, সকলেই ইহার জন্য তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। মন্তব্য প্রকাশের প্রধান কারণ মুসলমান সমাজের নীরবতা। একজন মুসলমান ভদ্রলোক ইহার প্রতিবাদ করিয়া যাহা বলিলেন, তাহার সারমর্ম এই—হিন্দু নারীগণই মুসলমানদের সঙ্গে যায়, ইহা মুসলমানদের দোষ নহে। মৌলবী আক্রাম খাঁও[৪২] এই প্রকার কথাই তাঁহাদের আহূত প্রতিবাদ সভায় বলিয়াছিলেন। এই পার্টি যেদিন হইয়াছিল তাহার কয়েকদিন পূর্বের কাগজেই ময়মনসিংহ শহরের ওভারসিয়ার শিক্ষিত মুসলমান আব্দুল রহিমের অবিবাহিতা কন্যা এবং কাটিহাদি থানার গোলাম সাহেবের স্ত্রীর নির্যাতনের খবর দেখাইয়া বলিলাম, ইহারা কি হিন্দু ছিল? না, হিন্দু ইহাদের অপহরণ করিয়াছে! আক্রাম খাঁ সাহেবকে একটু ভাবিয়া ইহার উত্তর দিতে বলিবেন কি? আবদুল

রহিম সাহেবের এই কন্যাকে উদ্ধার করিবার জন্য হিন্দুগণ যে প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন তেমন প্রাণপণ চেষ্টা মুসলমানগণও করেন নাই। থানার দারোগা ঘোষাল মহাশয়ও হিন্দু, তিনি এজন্য আসমুদ্র-হিমাচল মন্থনের আয়োজন করিয়াছিলেন। মৌলবী সাহেব এ বিষয়ে আর কোনো জবাব দিতে না পারিয়া সৈনিক-কবি নজরুল ইসলামের বিবাহটা উল্লেখ করিয়া ফেলিলেন[৫৩] এবং হিন্দুর দোষেই এ বিবাহটা হইয়াছে বলিলেন। তিনি আরও বলিলেন, 'নজরুল কি মেয়ের ভাইয়ের নিকট এ প্রস্তাব নিয়া প্রথমে যাইতে সাহসী হইত যদি সে'... আমি তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, 'যাহাদের কোনো শাস্ত্রানুসারে বিবাহ হইয়াছে, তাহাদের কথা উল্লেখ করা উচিত নয়, আপনি এ বিষয়ে কোনো কথা বলিবেন না।' তিনি বেশ একটু রাগের ভাব দেখাইয়া চুপ করিতে বাধ্য হইলেন। আমি মনে মনে বলিলাম, ইহা একমাত্র অবাধ মেলামেশার পরিণাম, যদি বিবাহটা আরও কিছু দিন টিকিয়া যায় তবে হয়ত বা পাকা হইলেও হইতে পারে।

এই মৌলবী সাহেবটি এমনই নির্লজ্জ যে আবার বলিতে লাগিলেন, আজকাল রাস্তাঘাটে যে সকল হিন্দু মেয়ে বে-আবরু চলা-ফেরা করেন, তাঁদের অনেকের ডানদিকের অঙ্গবিশেষের উপর ইচ্ছাপূর্বক শাড়ি না দিবার কারণ কি? আমি লজ্জায় জিভ কাটিলাম। এ কথার কি উত্তর দিব? পতিতাগণও যে-অঙ্গ রাস্তায় চলিতে সাবধানে ঢাকিয়া চলে, আজকাল গৃহস্থ কুমারী ও বিবাহিতাদিগের অনেকে উহা খোলা রাখা যেন ফ্যাশান্ মনে করেন। ইহার উত্তর নাই। বেশ একটু রুক্ষ মেজাজে তাঁহাকে বলিলাম, 'মহিলাদের সম্মান রাখিয়া যিনি কথা বলিতে পারেন না, তাঁহার কথা না বলাই উচিত।'

আমার এই কথায় কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলামান এক সঙ্গে চলিয়া গেলেন, কিন্তু রহিলেন দুই-এক জন। যিনি পার্টিদাতার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং হিন্দু-মুসলমান মিলনের বিশেষ কর্মী বলিয়া আমার দালাল আমাকে তাঁহার নিকট পরিচয় করাইয়া দেন, তাঁহার মতলব আমার আর বুঝিতে বাকি রহিল না। আমি আমার দালালকে ঘৃণাভরে গোপনে বলিলাম : 'এ পাপবৃত্তি আজই শেষ, আর না। নিন্দিত পল্লীতেও যাহাদের গ্রহণ করি নাই আজ তুমি তাদের নিয়ে এসে হাজির। ধিক্ তোমাদের শিক্ষায়।' দালালটি বলিল, এ না হলে যে হিন্দু-মুসলমান মিলন হয় না, তাই এদের বাদ দিয়ে পার্টি দেওয়া ভাল নহে। তাহাদের প্রকাশ্যে কিছু বলিলাম না, লোকটার রুচি যেন মার্জিত বলিয়াই মনে হইল।

এমন সময় কেহ সর্দার বিলের[৫৪] বাদ-প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। আমার আর উহাতে যোগ দিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু গায়ে পড়ে যখন আমার মতামত জানিতে চাহিল তখন আর কি করি! আমি যে শিক্ষিতা উদার নারীর আবরণে নিজেকে ঢাকিয়া কথা কহিতেছিলাম, তাহা ভুলিয়া গেলাম। আমাদের পতিতা সমাজে যে হাজার হাজার কুমারী মেয়ে প্রথম যৌবন উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে যৌনলিপ্সা চরিতার্থ করিতে না পারিয়া প্রবৃত্তির তাড়নায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া অবৈধ প্রেমে মজিয়া নিন্দিত পল্লীতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে—তাহাদের কথাই মনে হইল ; মনে হইল যাহারা নিজেদের কলঙ্ক ঢাকিয়া

রাখিতে পারে নাই তাহারাই যে এখানে আসিয়াছে, তাহারা তো সমাজের অতি সামান্য অংশ নহে। এ প্রকার গুপ্তপ্রেম কয়টা ধরা পড়ে? হাজারে দু-একটা বই তো নয়।

প্রকাশ্যে বলিলাম, 'প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে চতুর্দশের সঙ্গে সঙ্গেই যখন মেয়েদের প্রবৃত্তি জাগরিত হয়, তখন উহার পূর্বেই বিবাহ দেওয়া উচিত।' মৌলবী সাহেব বলিলেন, 'মিস্ মুখার্জির মুখে এমন উত্তরের আশা করি নাই।' আমি বলিলাম, 'আমি কেন, ঐ সেদিন যে নারীবাহিনী সর্দার বিল সমর্থন করিতে টাউন হলে গিয়েছিল, তাহাদের যাইয়া গোপনে জিজ্ঞাসা করুন, তাহারাও আমার মতেরই প্রতিধ্বনি করিবে।' আমি আর নিজেকে সামলাইতে পারিলাম না—ঢাকার ছাত্রীনিবাসের ভ্রূণহত্যা, দাস-গুহ পরিবারের অবৈধ বিবাহ—প্রভৃতি কতকগুলি বড়-ঘরের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিলাম। সৈয়দ হুসেনের সঙ্গে নেহেরু-কন্যার পলায়নের কথাটাও বলিয়া ফেলিলাম।[৪৫]

শাস্ত্র আমি জানি না, জানিতেও চাহি না, কিন্তু প্রাণে ক্ষুধা থাকিলে যদি সুধার পাত্র সম্মুখে পায় তবে এমন বীরনারী কয়জন আছে যে বৎসরের পর বৎসর তাহা গ্রহণ না করিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়? ইংলণ্ড-আমেরিকায় কি দেখিতেছি। সেখানে প্রতি-শতে কুড়িটা ছাত্রী বিবাহের পূর্বে সন্তান প্রসব করে ; ইহাতে তাহাদের সমাজচ্যুত হইতে হয় না। যদি ভারতকে তোমরা আমেরিকা করিতে চাও, তবে সে ভিন্ন কথা।

মৌলবী সাহেব তখন আলবার্ট হলে[৪৬] মেয়েদের সর্দার বিবাহ বিল[৪৭] সমর্থনের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন—এই সে দিন ২/৩ শত মহিলা আলবার্ট হলে মিলিত হইয়া 'তালাক' আইনটাও পাশ করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। এর উত্তর আমি আর কি বলিব ভাবিয়া উঠিতে পারিলাম না। হায় হিন্দুনারী, আজ তোমার এ কি মনোবৃত্তি। তোমরা যে দেখছি সারা ভারতটাকে সোনাগাছিতে পরিণত করতে পারলে পরিতৃপ্ত হও। এ কথার কোনো জবাব না দিয়া বলিলাম, 'চতুর্দশ বৎসরের পূর্বে কন্যার বিবাহ দিবার জন্য অভিভাবককে কেহ যখন বাধ্য করে না, যদি উহা অকল্যাণ মনে করেন, তখন দেশকে বুঝাইয়া সেই ব্যবস্থা করা উচিত। তাহা না করিয়া পুলিশের হাতে হিন্দুর যৌন ব্যাপার যাঁহারা দিতে চেষ্টা করিতেছেন তাহারা দেশের ঘোর শত্রু। বিশেষত আমরা যখন শীঘ্রই স্বরাজ পাইতেছি, তখন এ কয়টা মাস সবুর করিলে কি চলে না?'

সেইদিন হইতে আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম এ পাপ ব্যবসায় আর করিব না। রিপু জয় করিতে পারি নাই বটে, চেষ্টা করিব। আমি এখন পাপ ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়াছি। আমার যে টাকা আছে তাহার দ্বারা আমার জীবনের অবশিষ্ট সময় চলিতে পারে। কবে মরিব ঠিক নাই, হয়ত আমার ধন আমার নিজ কার্যে ব্যয় না হইতেও পারে। দালালদ্বয় একটা উইল করিতে বলিলেন, আমি তাহাদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া একটা খসড়া প্রস্তুত করিতে বলিলাম খসড়া পড়িয়া দেখিলাম, আমার মৃত্যুর পর তাহারা আমার ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী—এই প্রকার লিখিয়াছেন। আমি বলিলাম, তাহা হইতে পারে না, আমার

মৃত্যুর পর পতিত ও অন্ত্যজ জাতির সেবায় আমার ত্যাজ্য সম্পত্তি ব্যয় করিতে হইবে। পতিতার ত্যাজ্য সম্পত্তি গভর্নমেণ্ট নিয়া যান তাহাতে পতিতার ইচ্ছানুরূপ কোনো কার্যই হয় না, এজন্য কলিকাতার কয়েকটি পতিতা মৃত্যুর পূর্বে—হিন্দুধর্মের যাঁহারা সংস্কারক এমন প্রতিষ্ঠানে দান করিয়া গিয়াছেন, আমিও তাহাই করিব স্থির করিয়াছি। হিন্দুসভা এবং হিন্দুমিশন, এই সকল কার্যে বিশেষ অগ্রণী। ⁊

রমেশদা'র আত্মকথা

পঞ্চম সংস্করণ

শ্রী রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ, প্রণীত

বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী
পোঃ আমহার্স্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১০৫

মূল্য এক টাকা বারো আনা

Publisher—K.C. Acherya, 24, Amherst Row, Calcutta, and Printed
by—Khairul Anam Khan, at the Mohommadi Press,
91, Upper Circular Road, Calcutta.

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

একজন কোরিয়াবাসী জাপ সম্রাটের উপর বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল, কিন্তু সম্রাটের অঙ্গে কোন আঘাত লাগে নাই। তদন্তে প্রকাশ পাইয়াছে—কোরিয়ার সামরিক শাসন পরিষদের নিকট হইতে আততায়ী দুইটি বোমা ও ১৫টি স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সম্রাটের উপর বোমা নিক্ষেপের ষড়যন্ত্র পূর্বাহ্ণে আবিষ্কার করিতে অসমর্থ হওয়ায় নিজদিগকে এজন্য পরোক্ষে দায়ী মনে করিয়া মন্ত্রীসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিয়াছেন।

ইটালির বৈদেশিক বিভাগের এক সভ্য ব্যভিচারের জন্য সংবাদপত্রে নিন্দিত হওয়ায় তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের রাষ্ট্রীয় পরিষদ, ব্যবস্থাপক সভা, বিচারক, রাজদত্ত উপাধিপ্রাপ্ত [ভারতীয় প্রজা] রাজা, মহারাজ, স্যর, রায় বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু প্রতিপত্তিশালী পরস্ত্রী অপহারক ও পরদারগামী এবং ব্যভিচারী, যাহারা অর্থের জোরে সমাজ এবং রাজকার্য পরিচালনা করিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রে ঘোর উচ্ছৃঙ্খলতা আনয়ন করিয়াছেন ও করিতেছেন, সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য রমেশদা'র আত্মকথায় তাঁহাদের স্বরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে। নীতি সংযমহীন বর্তমান উচ্চশিক্ষাও যে পূর্বকালের শিক্ষা হইতে হীন, তাহা আমার নিজের এবং এই সকল তথাকথিত নেতাদের চরিত্র পাঠে দেশের ও সমাজের বিশেষ উপকার হইবে বিবেচনায় তাহাও আলোচিত হইয়াছিল। ফলে অশ্লীলতার অভিযোগে প্রকাশক প্রভৃতি তিন ব্যক্তির তিন মাসের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের আদেশ হওয়ায় ওই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল চলিতেছে। সুতরাং বর্তমানে এ বিষয়ে নীরব থাকা সমীচীন।

স্বাধীন দেশ ও পরাধীন দেশের এই পার্থক্য।

রমেশদা'র আত্মকথার আমি লেখক, আমার পরিচয় পত্র এবং ফটো পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে এবং আমার বর্তমান আবাসস্থলও পূর্ব মোকদ্দমায় এক বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল ; কিন্তু কোন মোকদ্দমায় আমাকে আসামি শ্রেণিভুক্ত করা হয় নাই। কর্তাদের অনেকের নিকট আমি সুপিরিচিত ; আইনের ভয়ে পুস্তকে যাহা লিখিতে পারি নাই, মোকদ্দমায় তাহা খুলিয়া বলিলে দেশে একটা মহা হৈ চৈ পড়িয়া যাইত, ইহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই কি প্রত্যেকবারই আমাকে অনুগ্রহ দেখাইতে বাধ্য হইয়াছেন?

তৃতীয় সংস্করণের পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর সুবিজ্ঞ ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত বি. সি. চ্যাটার্জি মহোদয়ের লিখিত অভিমত গ্রহণ করিয়া পুস্তক বিক্রয় হয়। মিঃ চ্যাটার্জির মত অভিজ্ঞ ব্যারিস্টার যে পুস্তকখানাকে দোষশূন্য বলিয়া অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং "গ্রন্থকার এই পুস্তক দ্বারা দেশের কাজ (Public service) করিয়াছেন" বলিয়া উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন তাহারই ফলে প্রকাশক প্রভৃতি আজ কারাদণ্ডের অপেক্ষায় জামিনে মুক্ত আছেন।

এই মোকদ্দমার ঘটনাস্থল জোড়াবাগান পুলিশ কোর্টের এলাকাধীন কিন্তু কী উদ্দেশ্যে সরকারপক্ষ তাহা ব্যাঙ্কশাল কোর্টে বিচারের জন্য পাঠাইয়াছিলেন তাহা আমরা এখনও বুঝিতে পারি নাই। অনারেবল সুশীলকুমার সিংহ আই. সি. এস. ব্যাঙ্কশালের প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট, তাঁহার ভগিনী (সহোদরা) শ্রীযুক্তা রমলা গুপ্তার পতন কাহিনী 'রমেশদার আত্মকথায়' আছে। সুতরাং তাঁহারই কোর্টে ইহার সুবিচারের উপযুক্ত স্থান মনে করিয়াই সরকারপক্ষ এই আইনানুমোদিত কার্য করিয়াছিলেন কি?

প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট যাহাতে এই মোকদ্দমার বিচার না করেন এজন্য কারণ প্রদর্শন করিয়া লিখিত আবেদন করিলেও অনারেবল সিংহ মহাশয় তাহা অগ্রাহ্য করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। অনন্যোপায় হইয়া আসামিগণ হাইকোর্টে এ বিষয়ে আবেদন করিবার জন্য সময় প্রার্থনা করেন। ইহার দুই দিন পর অনারেবল সিংহ মহাশয় আসামির অন্যতম উকিলকে ডাকিয়া বলেন যে "হাইকোর্টে দরখাস্ত করা না হইয়া থাকিলে এ বিষয় পুনঃবিচেনার জন্য একটা দরখাস্ত করুন। আমি অন্য কোর্টে পাঠাইয়া দিতেছি।"

শ্রীযুক্তা রমলা গুপ্তা মিউনিসিপাল ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এন. গুপ্তের স্ত্রী। ইঁহারা খ্রিস্টান। স্বল্পসংখ্যক এ দেশিয় শিক্ষিত উচ্চশ্রেণির খ্রিস্টান পরিবার পরস্পর আত্মীয়তা এবং বন্ধুত্বে আবদ্ধ থাকা খুবই সম্ভব। পুস্তকে উল্লিখিত এ দেশিয় খ্রিস্টান নার্স অনিলাও হয়ত বিচারকদের সম্পর্কিতা হইতে পারেন। এই সকল কারণে কোন মুসলমান বিচারকের নিকট এই মোকদ্দমার বিচারের ভার অর্পণ করিবার জন্য দরখাস্ত দিতে উকিলবাবুকে বলা হইল। উকিলবাবু এই প্রস্তাবে ভয় পাইলেন, বলিলেন—"ইহাতে সকল হাকিমই চটিয়া যাইবেন, বিশেষত ব্যাঙ্কশালে অপর দুজন বিচারকই দেশিয় খ্রিস্টান। জোড়াবাগানের বিচার্য মোকদ্দমা যখন কোন অজ্ঞাত কারণে এখানে আনা হইয়াছে তখন তাহা আর অন্য স্থানে যাইবে না।" যে উকিল দ্বারা পুনর্বিবেচনার জন্য দরখাস্ত দেওয়া হইল, তিনিও এ বিষয়ে অসম্মতি জানাইলেন। অতঃপর কিম্!

আসামিদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ—ষড়যন্ত্র ও অশ্লীল সাহিত্য প্রচার। অশ্লীলতা সম্বন্ধে আইনের এমন কোন সীমা নির্দেশ নাই যে ইহা শ্লীল এবং উহা অশ্লীল। যে সাহিত্য পড়িলে মানুষের পাশবিক প্রবৃত্তি জাগরিত হয় তাহাকেই সাধারণত অশ্লীল বলা যায়। এই মোকদ্দমায় সরকার পক্ষে বঙ্গ বিহার ও আসামের প্রায় চল্লিশ জন সাক্ষী উপস্থিত করা হইয়াছিল কিন্তু তাঁহাদের একজনও পুস্তকখানাকে অশ্লীল বলিতে পারেন নাই। অধিকন্তু কেহ কেহ পুস্তকখানা বর্তমান সমাজের পক্ষে বিশেষ আবশ্যকীয় বলিয়াছেন। অপর পক্ষে সর্বজনমান্য কয়েক জন অভিজ্ঞ সাহিত্যিক বলিয়াছেন যে পুস্তকে কোন অশ্লীলতা নাই। সমাজ সংস্কারের জন্য এই পুস্তক বিশেষ আবশ্যক। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'চরিত্রহীন' প্রভৃতি বহু নভেল হইতে 'রমেশদা'র আত্মকথা' শ্লীলতা-পূর্ণ, একথাও কেহ কেহ বলিয়াছেন।

'রমেশদা'র আত্মকথা'য় কবি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা মুদ্রিত হইয়াছিল, সরকার

পক্ষ ওই কবিতাকেও অশ্লীল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন কিন্তু কবিকে আইনের জালে ফেলিতে বোধ হয় সাহসী হন নাই।

বহুদিন যাবৎ প্রচলিত সাহিত্য, যাহা বাংলার সাহিত্যরথীদিগের উচ্চশ্রেণির কাব্য সাহিত্যরূপে পরিচিত, তাহার ভাব ও ব্যঞ্জনা হইতে সাহিত্যরূপে যে পুস্তক উচ্চস্তরের সেই পুস্তকের জন্যই এই দণ্ড।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তিনি যে শ্লীলতার পরিচয় দিয়াছেন তাহার কতকগুলি কবিতা 'রবীন্দ্র জয়ন্তী রহস্যে' মুদ্রিত হইল। [এই লেখাটি মূল প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্নবোধে এই সংস্করণে বর্জিত]।

চিত্রাঙ্গদায় কবি রবীন্দ্রনাথ 'অনঙ্গ আশ্রমে' অর্জুন, বসন্ত ও চিত্রাঙ্গদার যে রমণ বিলাসের চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা নির্ভীক সমালোচক কর্তৃক তৎকালে বিশেষ প্রশংসিত হইযাছিল।

উপন্যাস সম্রাট শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চরিত্রহীন পুস্তকে তিনি যে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া প্রভূত যশের অধিকারী হইয়াছেন তাহা হইতে একটু নমুনা এখানে দেওয়া হইল।

(দিবাকর ভ্রাতৃবধূ কিরণময়ীর সঙ্গে অবৈধ প্রেমে আসক্ত ছিল। উভয়ে পরামর্শ করিয়া বাংলা ছাড়িয়া জাহাজে আরাকান যাইতেছে, জাহাজের কেবিনে কিরণময়ী শুইয়াছিল)। সে (কিরণময়ী) সুদৃঢ় বলের সহিত দিবাকরকে বক্ষের উপর টানিয়া লইয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"জাহাজ যদি ডোবে আমরা যেন এমনি করেই মরি। তীরে এসে ভেসে যাব, লোকে দেখবে, ছাপার কাগজে উঠবে, তোমার উপীন দাদা পড়বে সে কেমন হবে ঠাকুরপো!"[১]

ছাইকোলজির নামে এ চিত্রও বিনা বাধায় কাটিয়া যায় কিন্তু ইহা যদি "বিভাস" বাবুর সঙ্গে 'কমলার' ছাইকোলজি হইত তবে হয়ত এভাবে চলিত না।

বোমার মোকদ্দমার আসামি নরেন গোঁসাই ও বারীণ ঘোষ পুলিশের নিকট নিজেদের সব গোপন কথা খুলিয়া বলিয়া দেয়। এই অপরাধে গোঁসাইয়ের বরাতে ঘটিল মৃত্যু, আর আদুরে গোপাল বারীণ ঘোষ, শ্রীঅরবিন্দের ছোট ভাই, আদুরে গোপাল হইয়াই রহিলেন।[২] এক যাত্রায় এই যে পৃথক ফল ইহার কৈফিয়ত দিবে কে?

অশ্লীলতার অভিযোগে এদেশে বোধ হয় এই প্রথম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে এবং আইনের শেষ সীমা তিন মাসই প্রকাশকদিগের ভাগ্যে মিলিয়াছে। ইহাতে আমরা দুঃখিত, অনুতপ্ত অথবা মোটেই আশ্চর্য হই নাই। কারণ পুস্তক প্রথম প্রকাশিত হইবার সময় আমরা ইহা ভাবিয়াই তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম এবং প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বলা হইয়াছিল—

"পুস্তকের নানা ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের অনেকেই বিশেষ উচ্চপদস্থ, অর্থ ও প্রতিপত্তিশালী। পুস্তকখানিকে কিংবা ইহার লেখক ও প্রকাশককে গলা টিপিয়া মারিবার

জন্য কোন চেষ্টা করিতেই যে তাহারা কসুর করিবে না তাহা আমরা জানি ; কারণ পৃথিবীতে এমন কোন দুষ্কার্য নাই, যাহা তাহাদের নিকট কুকার্য বলিয়া পরিগণিত। তাহাদের একটা কথা মনে রাখা উচিৎ যে পাপ কখনও ঢাকা থাকিবে না, আজ ইহার গলা টিপিয়া বধ করিলে কালই ইহার ভস্ম গায় মাখিয়া আরও দশখানা পুস্তক প্রকাশিত হইবে।"

আমাদের ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে। ইহার প্রকাশ বন্ধ করা একেবারেই অসম্ভব—অধিকন্তু বন্ধ করিবার চেষ্টা করায় "মুকুলদার মর্মকথা" বাহির হইয়াছে।

আমাদিগকে জেলে পাঠাও আর ফাঁসি দাও আমরা নির্ভীক চিত্তে তাহা বরণ করিয়া লইব। আমরা জানি হিন্দু সমাজের জন্য এই পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন আছে, সুতরাং ইহার প্রকাশ কেহ বন্ধ করিতে পারিবে না। এই পুস্তক দ্বারা প্রকৃত হিন্দু সমাজের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। সত্য বটে, ব্যভিচারীদের অনেকেই পুস্তকখানাকে ভাল চোখে দেখিতে পারেন না, কারণ তাঁহাদের ভবিষ্যতের ভয় আছে।

শ্রদ্ধাভাজন সাহিত্যিক ও এড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী এম. এ. বি. এল. মহাশয় বর্তমান সংস্করণে পুস্তকখানা (শেষ অধ্যায় ব্যতীত) আদ্যন্ত সংশোধন করিয়া দিয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। এড্‌ভোকেট ডাঃ পাল, মিঃ এস্ বসু, মিঃ এ. রায় ও সরকার এবং অন্যান্য কয়েকজন উকিল ও সাহিত্যিক বন্ধুও এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করায় তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীরমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

অবাধ মেলামেশা ও ভদ্রমহিলার নৃত্যের শোচনীয় পরিণামের দৃষ্টান্ত চোখে আঙুল দিয়া দেখাইবার জন্য বুনিয়াদি পরিবারের কয়েকটি ঘটনা নাম ধাম সহ প্রকাশিত হওয়ায় কোন রুচিবাগীশ সাহিত্যিক ও এক নগণ্য সম্পাদক পুস্তকে অশ্লীলতার দোষারোপ করিয়া মেঘের আড়াল হইতে বাণ নিক্ষেপ করিয়া ইহার প্রচার বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। পুস্তকে কাহার কোথায় ব্যথা লাগিয়াছে তাহা আমরা—আমরা কেন অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে পরবর্তী সংস্করণে ব্যথিতদের স্বরূপ প্রকাশ করিব।

এই সকল সুরুচির উপাসকগণ কোন ভদ্রমহিলা ক্ষণিক ভুলে সাময়িক স্খলিতা হইলে, ঐ সংবাদ টীকা টিপ্পনী সহ (সমাজের উপকারের জন্য!) সংবাদ পত্রে মুদ্রিত করিতে কখনও কুণ্ঠিত হন না। কৌশল্যা, বরদা, সুভাষিণী, লীলাবতী, শোভনা হরণ, মঞ্জুল বসু ও নিরুপমা দেবীর স্বামী ত্যাগের কারণ, রমলা গুপ্তার ফরাসীদেশ ভ্রমণ প্রভৃতি সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়া দেশ বিদেশে ইহাদের এমন পরিচিতা করিয়া দিয়াছেন যে, ইহাদের হারাইলে তাহাদের কি শোচনীয় পরিণাম ঘটিতে পারে তাহা সম্পাদকগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি? এই প্রকার প্রচারের ফলে বহু নারী পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করিতেও বাধ্য হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। জানিতে ইচ্ছা হয়—কোন মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহারা এই সকল সংবাদ পত্রিকায় স্থান দিয়া থাকেন। সুরুচির মাপ কাঠিটা তখন কোথায় থাকে?

আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ যে সকল বড় ঘরের নারীর পরিচয় দিয়াছি তাহারা সকল সমাজের বাহিরে। এই দৃষ্টান্তে সমাজের উপকার হইতে পারে, তাহাদের কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। অমরা মহাজন পন্থা অবলম্বন ব্যতীত আর কিছুই করি নাই।

জননীর স্তন হইতেই শিশু দুগ্ধই গ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু জলৌকা বা জোঁক সেই স্তন হইতেই রুধির ভিন্ন কিছুই পায় না—দোষ কি স্তনের। নোবেল পুরষ্কার প্রাপ্ত আনাতোল ফ্রাঁস[৩], নুট্ [য] হামসুন[৪], মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভব[৫] প্রভৃতি কাব্য, রবীন্দ্রনাথের কাব্য, মোপাসাঁর[৬] গল্প অথবা বিশ্ব-সাহিত্যের সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা সমাজহিতকর এই গ্রন্থখানাকে অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট বলিবেন না, তাহা আমরা স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারি।

এই পুস্তক যে তরলমতি বালক-বালিকাগণের জন্য প্রকাশিত হয় নাই তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিবেন। যুবক-যুবতীদের অভিভাবক ও অভিভাবিকা এবং সমাজসংস্কারকদিগের সাহায্যার্থ ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা পাঠে সমাজের দুষ্ট ব্রণগুলি উৎপাটিত করিতে কিংবা নৈতিক কুষ্ঠব্যাধি গ্রস্থ ব্যক্তিদিগকে সমাজ হইতে দূর করিতে একজনও যদি প্রয়াস পান তবে প্রকাশকের পরিশ্রম সফল হইয়াছে মনে করিব।

প্রকাশকের নিবেদন

প্রশ্ন হইতে পারে, এ পুস্তক প্রকাশের উদ্দেশ্য কি? সমাজের যখন ভাল মন্দ দুইটা দিক আছে, তখন মন্দের দিকটা বিশেষ করিয়া দেখাইবার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না!

সমাজের ভাল দিকটাতো অনেকেই দেখাইয়াছেন ও দেখাইতেছেন, তাহাতে সমাজকে পাপমুক্ত করিতে কোন সাহায্য হইতেছে বলিয়া মনে হয় না।

কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তিকে নিরাময় করিতে গিয়া রোগীর সম্মুখীন হইতে ভয় করিলে যেমন চলে না, সমাজকে ব্যভিচারের স্রোত হইতে রক্ষা করিতে হইলেও তেমনি তাহার সম্মুখীন হইতে হইবে।

পুত্র যদি পিতাকে ধূমপান করিতে দেখে, তাহা হইলে সেই পুত্রেরও ধূমপানে আসক্তি হওয়া স্বাভাবিক। আচার-ভ্রষ্ট শিক্ষকের দৃষ্টান্তে ছাত্রও কদাচারী হইয়া থাকে। তেমনি—শিক্ষিত ও অভিজাত সম্প্রদায় যেখানে ব্যভিচার-স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে, অপর লোক তাহাদের অনুসরণ করিবে বই কি! কংগ্রেস, কাউন্সিল, করপোরেশন, বণিক সমিতি প্রভৃতি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে যাঁহারা উচ্চ আসন পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যদি ব্যভিচার দোষে দুষ্ট হ'ন তবে দেশাবাসী জন-সাধারণই কেন ব্যভিচারকে দোষণীয় জ্ঞান করিবে, কিংবা ব্যভিচারকেই ঐ সকল উচ্চ পদে উন্নীত হইবার শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে না করিবে। প্রকৃতপক্ষেও হইতেছে তাহাই।

এই সকল মার্কামারা ব্যভিচারী ব্যতীত কতকগুলি অর্থ ও প্রতিপত্তিশালী লোক পরস্ত্রীকে কুলের বাহির করিয়াও দেশে সম্মান পাইতেছেন, এমন কি বিচারপতি মাননীয় নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, বেদান্তাচার্য হীরেন্দ্রনাথ দত্ত', সঞ্জীবনী সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি সর্বজনমান্য ব্যক্তিগণও ইহাদিগকে সম্মানের আসন দিয়া থাকেন। উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ না জানিলেও সমাজের অনেকেই ইহাদের কুকীর্তি সমূহ অবগত আছেন।

অধুনা নিন্দিত পল্লীবাসিনী [তথাকথিত নিষিদ্ধ পল্লী বা সোজা কথায় বেশ্যাপাড়া] পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের কন্যা কমলা দেবী, ইটালীর [এন্টালি] মুখার্জি পরিবারের কন্যা, জুনিয়ার ক্যাম্ব্রিজ পরীক্ষোত্তীর্ণা অতুলনীয়া সুন্দরী কুমারী সুকৃতি দেবী, খড়দহের গোস্বামী পরিবারের কন্যা সরযূ দেবী, বড়িশা চৌধুরী পরিবারের বধু সরলা দেবী, বেহালার হালদার পরিবারের কন্যা দেববালা, অনিলা ও সুনিলা দেবী, শ্যামবাজারে সেন শর্মা পরিবারের কন্যা কুমারী গৌরী দেবী, বাগবাজারের সাহিত্যিক পণ্ডিতের স্ত্রী মনোরমা ও কন্যা পরিমল, তারকেশ্বরের বালবিধবা কৃষ্ণভামিনী, ভবানীপুরের ব্যারিস্টার ঘোষ বর্মা পরিবারের কন্যা প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত মহিলাদের কুলের বাহির করিয়াও যাহারা অর্থের জোরে সম্মান আদায় করিতেছে তাহাদের পরিচয় গ্রহণ করিয়া পাষণ্ডদিগকে সমাজ হইতে

তাড়াইয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া যে অবশ্য কর্তব্য, সমাজহিতৈষীগণকে তাহা হৃদয়ঙ্গম কবাইবার জন্যই এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম।

ছোট বড় অনেক কাজের জন্যই এখন যুবকগণ সত্যাগ্রহ করিতেছেন। সমাজের এই সকল কলঙ্ক দূর করিবার জন্যও তাঁহাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত নহে কি?

পুস্তকে বর্ণিত একটি ঘটনাও মিথ্যা নহে ; উৎসুক পাঠকগণ যাহাতে সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে পারেন, সেইদিকে লক্ষ রাখিয়া স্ত্রী চরিত্রগুলির বিশদ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থোক্ত পুরুষদিগের বিশেষ পরিচয়ও ওই সকল নারীগণের নিকট পাওয়া যাইবে। সাময়িক স্খলিতা নারীদিগের মধ্যে যাঁহারা বিবাহিত সামাজিক জীবনযাপন করিতেছেন তাঁহাদের পরিচয় গোপন করা হইয়াছে।

পুস্তকের নানা ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের অনেকেই বিশেষ উচ্চপদস্থ, অর্থ ও প্রতিপত্তিশালী। পুস্তকখানিকে কিংবা ইহার লেখক ও প্রকাশককে গলা টিপিয়া মারিবার জন্য কোন চেষ্টা করিতেই যে তাহারা কসুর করিবে না তাহা আমরা জানি ; কারণ পৃথিবীতে এমন কোন দুষ্কার্য নাই, যাহা তাহাদের নিকট কুকার্য বলিয়া পরিগণিত। তাহাদের একটা কথা মনে রাখা উচিত যে পাপ কখনও ঢাকা থাকে না এবং তাহার ফলভোগ করিতেই হইবে। আজ ইহাদের গলা টিপিয়া বধ করিলে কালই ইহার ভস্ম গায় মাখিয়া আরও দশখানা পুস্তক প্রকাশিত হইবে।

পুস্তকোল্লিখিত নানা ঘটনায় সম্পর্কিত অর্থ ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদিগের স্তাবক ও অনুগৃহীত সমালোচকগণ, সমালোচনার আবরণে ইহাকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতে পারেন ; তাহাতে তাঁহাদের নিজেদেরই স্বরূপ প্রকাশিত হইবে মাত্র!

যে সকল কাহিনি প্রকাশিত হইল তাহার সত্যতা সম্বন্ধে আমরা সমাজের নানা শ্রেণির বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে স্বাক্ষীস্বরূপে উল্লেখ করিতে পারি। এই সকল ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহাদের কাহারো বা প্রত্যক্ষ এবং কাহারো কাহারো পরোক্ষভাবে জ্ঞান আছে বলিয়া আমরা অবগত হইয়াছি। এমন কি মহাত্মা গান্ধীও একটা ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তাঁহার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত দেশাইকে কোন স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

অর্থ ও প্রতিপত্তিশালী এবং বিবিধ কার্যে অগ্রণী মহারাজ স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর[৮], স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র, স্যার নীলরতন সরকার[৯], কুমার মন্মথনাথ মিত্র, কুমার প্রদ্যুৎকৃষ্ণ দেব, মহামহোপাধ্যায় শ্যামাদাস বাচস্পতি[১০], মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন শর্মা, মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ[১১], শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বসু, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ কর, রায় বাহাদুর তারকনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র [য], শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার[১২], ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়[১৩] ও বাংলার প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণকে আমাদের কাহিনির সত্যাসত্য নির্ণয়

বর্তমান নেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন[১৪], শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু[১৫],
এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র

করিয়া সমাজের এই ব্যভিচারস্রোত নিবারণ জন্য বদ্ধপরিকর হইতে অনুরোধ করিতেছি।

মানদা দেবী তাহার আত্মচরিতে গ্রন্থকারকে রমেশদা' বলিয়া পরিচিত করায় এই পুস্তকের নামকরণ "রমেশদা'র আত্মকথা" করা হইল।

শ্রীমতী কমলা দেবী
(পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের কন্যা)
পুরুষটির পরিচয় লিখিতে অসমর্থ বলিয়া মুখে চুনকালি লেপন করিয়া দেওয়া হইল, ইনি কে বুদ্ধিমান পাঠক বুঝিতে পারিবেন।
[লেখক প্রদত্ত পরিচিতি]
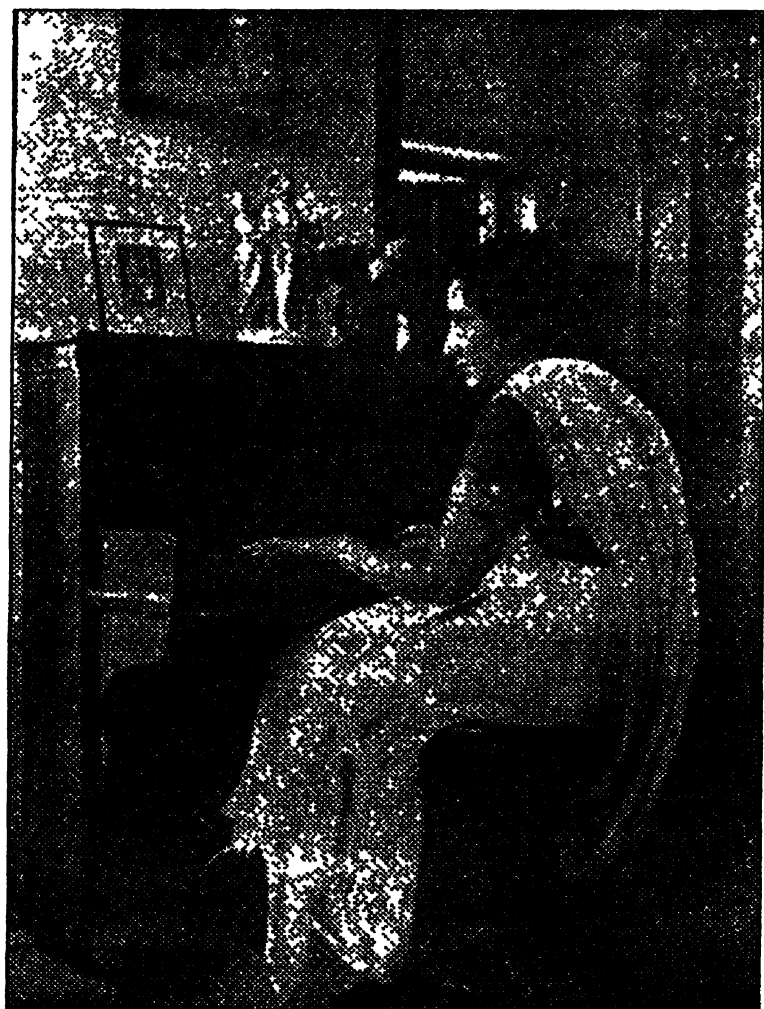
কুমারী সুকৃতি দেবী
(ইটালির [এন্টালির] মুখার্জী পরিবারের কন্যা)
[লেখক প্রদত্ত পরিচিতি]

কুমারী সরযূ দেবী
বেহালার হালদার পরিবারের কন্যা
ইনি খড়দহের গোস্বামী পবিবারের কন্যা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।
[লেখক প্রদত্ত পরিচিতি]

গোড়ার কথা

মহাত্মা গান্ধি তাঁহার আত্ম-জীবন চরিত লিখিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ জীবন স্মৃতি লিখিয়াছেন, নবীনচন্দ্রও তাঁহার জীবনের কাহিনি বাংলার পাঠকগণকে উপহার দিয়াছেন—আর আমি শ্রীরমেশচন্দ্রও আমার জীবন কথা আজ লিখিতে বসিয়াছি। তোমরা হয়তো এইটুকু পড়িয়াই চটিয়া উঠিবে, বলিয়া বসিবে—"কে তুমি হে বাপু? কোন দিন তোমার নামও শুনি নাই, আর এই সব জগদ্বিখ্যাত নামের সঙ্গে তুমি তোমার নাম করিতেছ, তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়?"—বলিতে পার, বলিলে তোমাদিগকে বিশেষ দোষও দিতে পারি না, কারণ বাংলার পাঠক তোমরা অধিকাংশই পরের মুখে ঝাল খাইতে শিখিয়াছ। বড় বড় নাম শুনিলেই তোমাদের ভাবাবেশ হয়—বোঝ আর নাই বোঝ বড় বড় লোকের কথা শুনিলেই দশ জনের সুরে সুর মিলাইয়া তোমরা বাহবা দেও—মনের নিভৃত কোণে জাগে কিন্তু ভয়, বাহবা না দিলে লোকে মনে করিবে যেন এ লোকটা সমজদার নয়। সুতরাং আমার মত একজন নগণ্য লোকের আত্ম-জীবন চরিত লেখার চেষ্টাকে তোমরা উপহাস করিতেও পারে। কিন্তু আমার অনুরোধ, উপহাস কর আর যাই কর—আমার এই জীবনের কাহিনিটা একবার পড়িও। তোমাদের মধ্যে হাজার করা নয়শত নিরানব্বুইটির পক্ষে গান্ধির আদর্শে জীবন গঠন করিবার সাধ্য নাই। কারণ তিনি "অতি মানুষ" কিন্তু আমার জীবন চরিতখানা যদি পড় তবে যে সকল প্রলোভনে পরিয়া উচ্চ বংশে জন্ম, উচ্চ সংসর্গে মিশিবার সুযোগ প্রভৃতি সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পদাধিকারী [ডিগ্রিধারী] আমি শ্রীরমেশচন্দ্র আজ মাতাল লম্পট জুয়াচোরে পরিণত হইয়াছি। সেই সকল প্রলোভন যদি এড়াইয়া চলিতে পার, তাহা হইলে অন্তত মানুষ বলিয়া নিজের পরিচয় দিতে পারিবে, একথা আমি স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারি।

তবে সত্যের অনুরোধে একথাও আমি বলিতে বাধ্য যে কেবল মাত্র অহেতুকী পরোপকার প্রবৃত্তি আমাকে এই আত্মজীবন চরিত লিখিতে প্রণোদিত করে নাই ; সে কথা যদি বলি তাহা হইলে কপটতা করা হইবে। এ জীবনে একটা কথা ঠেকিয়া শিখিয়াছি, তাহা এই যে কপটতায় লাভ হয় না। আপাতত লাভ হইলেও পরিণামে এত অধিক ক্ষতি হয় যে তাহাতে মজুরি পোষায় না। সুতরাং একথা আমি খুলিয়া বলাই প্রয়োজন মনে করিতেছি যে, আমার এই জীবন কথার প্রকাশক মহাশয় আমার এই জীবন চরিতের বিনিময়ে কিঞ্চিৎ রজতমুদ্রা (যাহার অভাবে আমার মৌতাত বন্ধ হইবার মত হইয়াছিল) আমার পকেটে না দিতেন—তাহা হইলে কেবল মাত্র তোমাদের উপকারের জন্য আমি এই পরিশ্রম স্বীকার করিতাম কিনা সন্দেহ। তারপর এই জীবন চরিত লিখিতে আমার প্রবৃত্তি আরও একটি কারণে জাগিয়া উঠিয়াছে। মানদাসুন্দরী ওরফে পতিতা মানদা দেবী আমার

নাম এক প্রকার বঙ্গবিখ্যাত করিয়া দিয়াছে। তাহার জীবন চরিতে আমি যে বর্ণে চিত্রিত হইয়াছি তাহাতে দেশবাসী আমাকে কি চক্ষুতে দেখিয়াছেন, তাহাও আমার বুঝিতে বাকি নাই। আমার দুর্বলতা আমি অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু আমার জীবন চরিত পড়িলে অন্তত দেশবাসী বুঝিতে পারিবেন যে কি প্রকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, কাল এবং সঙ্গের ফলে আমার এই অধঃপতন। তাঁহারা ইহাও জানিতে পারিবেন তাহার [মানদার] নিজের ত্রুটি অনেকখানি ঢাকিয়া আমার ঘাড়েই তাহার সর্বনাশের কারণ সম্পূর্ণ ভাবে চাপাইয়াছে।*

আর একটা কথা বলিয়াই আমি আমার এই ভূমিকা শেষ করিব। সে কথাটি এই যে, আমার এই জীবন চরিতে আমার জীবনের কোন কথা আমি গোপন করি নাই। মনীষী রোমাঁ রোলাঁ বলিয়াছেন—

"If we are to tell a hundredth part of the dreams that come to an ordinary honest man, or of the desire which come into being in the body of a chaste woman ; there would be a scandal and an outcry."

অর্থাৎ—"সাধারণত যাঁহারা সচ্চরিত্র পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক বলিয়া জগতে পরিচিত, তাঁহাদের মনের গোপন কোণে যে সকল চিন্তা জাগে এবং তাঁহাদের দেহে যে সকল লালসা লোক চক্ষুর অন্তরালে রাজত্ব করে তাহার শতাংশের এক অংশও যদি প্রকাশ করিয়া বলা যায় তাহা হইলে সমাজে একটা বিষম হৈ চৈ উপস্থিত হইবে।"

এই কথাটির সত্যতা আমি মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছি, সমাজে একটা ঘোরতর আন্দোলনের সৃষ্টি হইবে এই আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও আমি অকপটে আমার মনের ভাব প্রকাশ করিব। কারণ আমার বিশ্বাস যাঁহারা মনের কোণে কল্পনার সুন্দর পরিচ্ছদে পাপকে সাজাইয়া লইয়া, তাহার মধুর মূর্তি দেখিয়া মুগ্ধ হন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে হয়তো সেই পাপের নগ্ন বীভৎস মূর্তি দেখিলে চমকিয়া উঠিবেন এবং হয়ত সময় থাকিতে সাবধান হইতে পারিবেন। তবে আমার জীবন-নাটকে সহকর্মী হিসাবে যে সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রী অভিনয় করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের নাম ধাম প্রকাশ করিবার অধিকার আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। কারণ তাঁহাদের অনেকেরই সাধুপুরুষ এবং সাধ্বী স্ত্রী বলিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা আছে। আমার মত বেপরোয়া ছন্নছাড়া কেহই নহেন। সুতরাং তাঁহাদের সেই প্রতিষ্ঠা খর্ব করিয়া, এই শেষ জীবনে তাঁহাদের অভিশাপ কুড়াইয়া লইতে আমি ইচ্ছুক নহি। সেই জন্য তাঁহাদের নাম গোপন করিয়া ছদ্মনাম এই আখ্যায়িকায় ব্যবহার করিয়াছি।

---

* **গ্রন্থের সর্বত্রই গুরু হরফ লেখকের নয়, সংকলকের।**

রমেশদা'র আত্মকথা

বাংলা ১২৯২ সনের ৩০শে আশ্বিন [১৮৮৫ খ্রিঃ] তারিখে হুগলি জেলায়...গ্রামে আমার জন্ম হয়, আমার পিতা বিশেষ সঙ্গতিপন্ন না হইলেও একেবারে দরিদ্র ছিলেন না। বর্ধমানের মহারাজাধিবাজের অধীনে বাৎসরিক প্রায় দেড় হাজার টাকা আয়ের পত্তনি তালুকের তিনি মালিক ছিলেন। এতদ্ব্যতীত গ্রামে আমাদের একটি বড় জোত ছিল। তাহাতে যে ধান হইত, তাহাতে আমাদের বাৎসরিক ব্যয় নির্বাহ হইয়াও কিছু কিছু ধান প্রতিবৎসর বিক্রয় কবা চলিত। আখ, পাট, আলু প্রভৃতির চাষও কিছু কিছু হইত। আমাদের সংসারে পিতামাতা বৃদ্ধা পিসিমা আমার একটি খুড়তুতো ভাই এবং একটি সহোদর ছোট ভাই ও ছোট বোন ভিন্ন আর কেহ ছিলেন না। আমাদের নিজ লাঙলে জমি চাষ হইত। খেতের ধানের চাল, বাড়ির গরুর দুধ, পুকুরের মাছ, বাড়ির বাগানের তরকারি, ইহাতেই আমাদের সুখে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। তৈল, লবণ ও মশলা এবং মাঝে মাঝে সামান্য কিছু মাছ ভিন্ন আর বিশেষ কিছু কিনিতে হইত না। বাড়িতে বারমাসে তের পার্বণ হইত। শুধু আমাদের বাড়িতে নয়, মোটামুটি ভাবে পল্লীর অধিকাংশ গৃহেই এই প্রকার সুখের সংসার পাতা ছিল। শহরের চাকচিক্য তখনও পল্লীবাসীকে এত মুগ্ধ করে নাই। শহরের বিলাসিতা তখন পল্লীগ্রামে এমন ভাবে প্রবেশ করে নাই। বেলা আটটায় নাকে মুখে ভাত গুজিয়া পঁচিশ ত্রিশ টাকা বেতনের লোভে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করিতেও এত লোক তখন ছুটিত না।

কয়েকটি পুত্র কন্যা মৃত এবং গর্ভাবস্থায় নষ্ট হওয়ার পর আমার জন্ম হওয়ায় আমি কিছু বেশি আদরের ছিলাম। বিশেষত পিসিমার নিকট আমার কোন অপরাধই অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত না। কোন অন্যায় কাজের জন্য পিতামাতা শাসন করিতে আসিলে, আমি পিসিমার নিরাপদ কোলে আশ্রয় গ্রহণ করিতাম এবং শাসন করিতে আসিয়া পিতা মাতাই পিসিমা কর্তৃক শাসিত হইতেন। পিসিমা বাবার চেয়ে প্রায় দশ বৎসরের বড় ছিলেন, প্রৌঢ় বয়সেও বাবা কোন দিন পিসিমার মতের বিরুদ্ধে কোন কার্য করিতে সাহসী হইতেন না। সেই পিসিমার নয়নের মণি আমাকে কোন কড়া কথা বলিতে কেহই সাহসী হইত না। সুতরাং আমার আবদার অত্যাচার ও অশিষ্টতা এবং জেদ ক্রমে বাড়িয়াই চলিতেছিল। যাহা করিব বলিয়া সংকল্প করিতাম, ভাল হউক মন্দ হউক কেহই তাহাতে বাধা দিত না। বাল্যকাল হইতেই প্রবৃত্তির উদ্দাম গতিতে বাধা না পাওয়ায়, সেই দুর্বার প্রবৃত্তির স্রোত আমাকে কোথায় টানিয়া আনিয়া ফেলিয়াছে, আজ আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি। পিসিমার অনেক দিন হইল স্বর্গ প্রাপ্তি হইয়াছে কিন্তু প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্রের মস্তকটি ভালভাবে চর্বণ করিয়া, নরকের পথে অগ্রসর হওয়ার প্রধান পাথেয় উচ্ছৃঙ্খলতা যথেষ্ট

পরিমাণে তাহাকে দান করিয়া, তবে তিনি স্বর্গবাসী হইয়াছেন। আমার পিসিমার মত পিসিমা বাংলার অনেক ঘরেই আছেন এবং যাহারা আমার এই কাহিনি পাঠ করিবেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নিজ নিজ পরিবারেও এই প্রকার পিসিমা অথবা অবস্থাভেদে মা, খুড়িমা, ঠাকুরমা, জেঠিমার অস্তিত্ব দেখিতে পাইবেন।

বাল্যকালে গ্রামের গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় আমার বিদ্যারম্ভ হয়। আমার পাঠশালার জীবনে এমন বিশেষ বৈচিত্র্য কিছু নাই যাহা আমার পাঠকগণকে উপহার দিতে পারি। অন্য দশজন ছেলের মত দৌড়াদৌড়ি, হুড়াহুড়ি মারামারি, জলে সাঁতারকাটা, আম বাগানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আম চুরি করা এই সবই করিতাম। অন্যান্য ছেলেরা অভিভাবকের ভয়ে একটু সংযত ভাবে করিত, কিন্তু আমি ছিলাম বেপরোয়া—কারণ আমি জানিতাম সর্বশক্তিময়ী পিসিমা আমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিতেছেন। গুরুমহাশয় পাঠশালায় পড়ান ভিন্ন আমার গৃহ-শিক্ষকও ছিলেন এবং বাড়িতে আমাকে কিছু কিছু ইংরেজিও পড়াইতেন। পড়াশুনায় আমি খারাপ ছিলাম না। মেধাবী বলিয়া আমার খ্যাতি ছিল।

তের বৎসর বয়সে আমার পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ হইলে আমাদের গ্রাম হইতে কিছু দূরে শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইনস্টিটিউসন নামক উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে আমি ভর্তি হইলাম। বাড়ি হইতেই বিদ্যালয়ে যাইতে আরম্ভ করিলাম। আমাদের গ্রামের আরও দুই তিনটি ছেলে ওই স্কুলে পড়িত, তাহাদের সঙ্গেই যাইতাম এবং ছুটি হইলে তাহাদেরই সঙ্গে বাড়ি ফিরিতাম। শ্রীরামপুর হুগলি জেলার একটি সাবডিভিসন। সেখানে দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারালয়, হাইস্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয়, থানা, প্রকাণ্ড বাজার প্রভৃতি সবই আছে। যে দিন আমি প্রথম স্কুলে ভর্তি হই সেদিনের স্মৃতি আমার মনে এখনো বেশ উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত আছে। গুরুমহাশয়ের ভগ্ন প্রায় চণ্ডীমণ্ডপের ছেঁড়া মাদুর হইতে একেবারে প্রাসাদ তুল্য গৃহে টেবিল বোর্ড ডেস্ক প্রভৃতি সুশোভিত কক্ষে পড়িতে আসিয়া বিস্ময় হর্ষ এবং গর্বে আমার মনের যে অবস্থা হইয়াছিল তাহা আমার এখনও বেশ স্মরণ আছে। এ কথাটাও বেশ মনে আছে যে হর্ষ ও বিস্ময় অপেক্ষা গর্বের ভাব বেশি অনুভব করিয়াছিলাম। স্কুল কখন ছুটি হইবে এবং বাড়ি ফিরিয়া মণ্টু, ক্যাবলা, কালু প্রভৃতি আমার দুদিন পূর্বের সহপাঠীদের নিকটে, আমার এই অদ্ভুত সৌভাগ্যের কথা বর্ণনা করিয়া তাহাদিগকে তাক্ লাগাইয়া দিতে পারিব, সেই চিন্তাই সেদিন আমার মনে প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। আমার পিসিমাও নূতন ইংরেজি স্কুল হইতে বাড়ি ফিরিবার পর যে আমায় বিশেষ আদর যত্ন করিবেন এবং নূতন নূতন খাবারের বন্দোবস্ত করিবেন তাহা বারবার মনে পড়ায় বাড়ি ফিরিবার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম।

পাপের পথে

স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর হইতে সর্বপ্রকারেই জীবনে একটা নূতনের আস্বাদ পাইতে লাগিলাম। গ্রামের কপাটি খেলার পরিবর্তে ক্রিকেট ফুটবল প্রভৃতি খেলা, গ্রাম্য পাঠশালার সামান্য কয়েকটি সময়বয়স্ক খেলার সাথীর পরিবর্তে অসংখ্য খেলার সাথী ইত্যাদি নানাপ্রকার পরিবর্তন আমার কিশোর প্রাণে এমন একটা আনন্দের চাঞ্চল্য আনিয়া দিয়াছিল যে স্কুলের সময় ছাড়াও প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি নগরে থাকিতাম। নগ্নপদে একখানা চাদর গায়ে দিয়া গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় যাইতাম, এখন সার্ট কোট জুতা পরিয়া স্কুলে যাইতে আরম্ভ করিয়াছি। বাড়িতে থাকিতে পিসিমার স্বহস্তে প্রস্তুত মুড়ি নারিকেলের সন্দেশ মোয়া ইহাই জলখাবার ব্যবস্থা ছিল, এখন প্রত্যহ পয়সা লইয়া আসি, বাজারের সিঙাড়া, নিমকি, কচুরি, রসগোল্লা টিফিনের সময় কিনিয়া খাই। এখন বুঝিতে পারিতেছি যে অমৃত মনে করিয়া কি বিষ উদরস্থ করিয়াছি। কিন্তু তখন আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবারও কেহ ছিল না। আজ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ মনীষীগণ স্থানে স্থানে সভাসমিতিতে এই বাজারের খাদ্য খাইবার অপকারিতা বুঝাইয়া দিতেছেন এবং সেই মুড়ি নারিকেল খাইতে বলিতেছেন, কিন্তু তখন তাহা কেহ বলিত না।

পিতা আনুষ্ঠানিক হিন্দু ছিলেন, তিনি দোকানের খাবার-খাওয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। বাড়িতে বলিয়া দিয়াছিলেন, যেন বাড়িতে প্রস্তুত খাবার আমার সঙ্গে প্রত্যহ দেওয়া হয়। বাবা জানিতেন যে তাঁহার আদেশই প্রতিপালিত হইতেছে, কিন্তু সমপাঠীদিগের বিদ্রূপের ভয়ে আমি কান্নাকাটি করিয়া পিসিমা ও মা'র নিকট হইতে পয়সা আদায় করিয়া লইতাম। কারণ দোকানের খাবার খাওয়াটাই ছেলেমহলে aristocracy বা আভিজাত্যের পরিচায়ক হইয়া উঠিয়াছিল। মুড়ি নারিকেল চাষার খাদ্য বলিয়া পরিগণিত হইত।

আমার ছাত্রজীবনে যে এক দুষ্টগ্রহের মত আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল তাহার কথাই প্রথমে বলিব। স্বর্গীয় রামময় চৌধুরী কলিকাতার মধ্যে একজন বড় অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে বড় পুত্রটি কলিকাতার কলেজে পড়িত, দ্বিতীয় নারায়ণ মামার বাড়ি থাকিয়া ইউনিয়ন ইন্‌স্টিটিউসনে উচ্চ শ্রেণিতে পড়িত। ছেলেদের মধ্যে নূতন নূতন ফ্যাশানের আমদানিকারক নারায়ণই ছিল (Introducer of new fashions)। ছেলেমহলে নারায়ণের জামার মত জামা ব্যবহার করা, তাহার অনুকরণে হাতের আস্তিন গুটাইয়া রাখা, তাহার মত চুল ছাঁটা ও টেরি কাটা, ইহাই পরম কাম্য ছিল। নারায়ণ যাহার পোশাক পরিচ্ছদের একটু প্রশংসা অথবা যাহার সহিত একটু হাসিয়া কথা বলিত সে ছেলেকে অন্যান্য সকলেই ঈর্ষার চোখে দেখিত। পল্লীগ্রাম হইতে সদ্য আগত আমার নিকট নারায়ণ Demi God.-এর অর্থাৎ প্রায় দেবতার আসন পাইয়াছিল, অবশ্য দূর হইতেই

তাহাকে আমি এ সম্মান দিতাম ; তাহার সহিত আলাপ করিবার সাহস আমার ছিল না। খেলার মাঠে সে কেমন করিয়া বল করে, কেমন সুন্দরভাবে ব্যাটখানি ধরে, কেমন সব বকুনি দিয়ে কথা বলে, তার কাপড পরার কায়দাটি বা কেমন সুন্দর, এই সব আলোচনা আমরা আডালে আড়ালে করিতাম এবং সাধ্যমত তাহার চালচলন আদবকায়দা, রকম-সকম অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতাম। নারায়ণ আবার নকল করিত তাহার দাদা অনুকূলকে, তিনি কলিকাতা হইতে যখন মাম' বাড়ি আসিতেন, তখন এক এক রকম নূতন ফ্যাশানের আমদানি করিতেন। নারায়ণ সেই ফ্যাশান অনুসারে পোশাক করিত, আমবা সাধ্যমত নারায়ণের অনুকরণ [করার] চেষ্টা করিতাম। আমার পক্ষে এই প্রকার অনুকরণ করা বিশেষ ক্ষতি হইত না, কারণ আমার পিতা একেবারে দরিদ্র ছিলেন না। পিসিমার হাতে বেশ টাকা ছিল এবং আমার আবদার রক্ষা করিতে পিসিমা কোনদিনই কৃপণতা করিতেন না ; কিন্তু আমাদের দলের মধ্যে এমন অনেক ছেলে ছিল, যাহারা বাড়ি হইতে দরিদ্র পিতার টাকা পয়সা চুরি করিয়া আনিয়া ফ্যাশানের অনলে আহুতি প্রদান করিত।

হঠাৎ আমার অসাধারণ সৌভাগ্য উপস্থিত হইল। একদিন খেলার মাঠে এই নারায়ণের সঙ্গে আমার খুব ভাব হইয়া গেল। সে-ই সাধিয়া আসিয়া আমার সহিত আলাপ করিল। এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি ; বাল্যকালে আমার চেহারাটি সুন্দর ছিল। স্বভাবত আমি গৌরবর্ণ ছিলাম, একটু পরিশ্রম করিলেই মুখটি রাঙা হইয়া উঠিত। আমার মুখমণ্ডলের আরও একটু বিশেষত্ব ছিল যে আমি ঈষৎ হাসিলে আমার গাল দু'টিতে টোল্ পড়িত। ছেলেবেলায় আমাকে দেখিয়া—"বাঃ বেশ সুন্দর ছেলেটিতো! তুমি কাদের ছেলে বাবা!" এই প্রকার মন্তব্য অনেক অপরিচিত পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মুখে আমি শুনিয়াছি। সৌন্দর্যের প্রশংসা শুনিয়া বিশেষ কোন প্রকার মনোভাবের বিকাশ হওয়ার উপযুক্ত বয়স আমার তখন ছিল না। সুতরাং ঐ প্রকার উক্তি আমি শুনিয়া যাইতাম মাত্র কিন্তু তাহাতে মনে কোন দিন দাগ বসে নাই। ক্রমে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্যর প্রশংসা শুনিলে কেমন একটু লজ্জার ভাব ভিন্ন অন্য কোন ভাব পূর্বে কোন দিন মনে আসে নাই। কিন্তু স্কুলে ভর্তি হওয়ার কিছু দিন পর হইতেই নিজের অলক্ষ্যে একটা কেমন নূতন রকমের ভাব আমার মনকে ধীরে ধীরে অধিকার করিতেছিল। উপরের ক্লাসের বড় বড় ছেলেদের সঙ্গে আমাদের ক্লাসের বার তের বৎসর ছেলেদের মধ্যে যাহারা দেখিতে একটু সুন্দর, তাহাদের একটা লুকাইয়া দেখাশুনা, লুকাইয়া কথা বলা, অর্থাৎ এমন একটা আদান প্রদান চলিতেছে যাহা তাহারা প্রকাশ করিতে সাহসী বা ইচ্ছুক নহে। নূতন আবেষ্টনের মধ্যে আসিয়াই হউক অথবা পাড়াগাঁয়ের আমদানী বলিয়াই হউক—উপরের ক্লাসের কোন ছেলে আমার সঙ্গে কথা বলিতে আসিলে আমি সঙ্কোচ বোধ করিয়া সরিয়া যাইতাম ; কিন্তু উপরের ক্লাসের বড় বড় ছেলে অনেকেই যে আমার সঙ্গে আলাপ করিতে ইচ্ছুক ইহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম।

একদিন খেলার মাঠে যখন সকলে খেলিতেছিল তখন আমি একধারে বসিয়া লাল

নীল কাগজ কাটিয়া লতা ও ফুল তৈয়ারি করিতেছিলাম। পরদিন স্কুলে ইন্‌স্পেকটার আসিবেন, সেইজন্য স্কুলগৃহ সজ্জিত করিবার ব্যবস্থা হইতেছিল। এই সকল কাজ জানিতাম বলিয়া আমার ও আর কয়েকটি ছেলের উপর মাস্টার মহাশয় এই ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। নাবায়ণ ও তাহার ক্লাসের একটি ছেলে দূরে দাঁড়াইয়া কি যেন বলিতেছিল। তাহারা কথা বলিতে বলিতে দুই চার বার আমার দিকে ফিরিয়া তাকাইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে নারায়ণ আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং একটি কাগজের ফুল হাতে লইয়া বলিল,—"বাঃ সুন্দর ফুলটিতো, এটা তুমি করেছ?" আমি মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিলাম যে ফুলটি আমিই প্রস্তুত করিয়াছি। নারায়ণ তখন আমার বাড়ি কোথায়, কোন ক্লাসে পড়ি, বাড়িতে আমার আর কে কে আছে এই সব নানা প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল, আমিও সেগুলির উত্তর দিলাম। তাহাদের সঙ্গে আমি কথা বলিতেছিলাম এদিকে কাজও করিতেছিলাম। তাহার পব নারায়ণ আমার মত করিয়া ফুল তৈয়ারি করিতে লাগিল, কিন্তু পারিল না। তাহার ফুল দেখিয়া আমি হাসিতে লাগিলাম, সেও সেই হাসিতে যোগ দিল, তারপর বলিল,--

—"তুমি আমাকে এই রকম ফুল আর লতা কত্তে শেখাবে?"

আমি বলিলাম—"বেশ তো—আপনি দু'চার বার দেখলেই করতে পারবেন।"

এমন সময় তাহাকে কে ডাকিল, সে চলিয়া গেল। সেদিন আমার মনে যে আনন্দ হইয়াছিল তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। যে ছেলের সঙ্গে একটা কথা বলিতে পারিলে ছেলেরা কৃতার্থ হয়, সেই নারায়ণ যাচিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করিয়াছে, আমার নিকট ফুল প্রস্তুতের কৌশল শিখিতে চাহিয়াছে, ইহা অপেক্ষা আর গর্বের বিষয় কী হইতে পারে?

সেই দিনের আলাপ ক্রমশ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইল। মধ্যে মধ্যে স্কুলের ছুটির পর নারায়ণ আমাকে বাড়িতে আগাইয়া দিয়া যাইত। সে নানা প্রকার গল্প করিত, তাহার বাবার নিকট সে কলিকাতায় কতবার গিয়াছে, কলিকাতায় কত সব আশ্চর্য জিনিস দেখিয়াছে এই সব গল্প করিত। রেশমি রুমাল, অটোমেটিক পেন্‌সিল, শিশি ভরা এসেন্স এই প্রকারের জিনিস মাঝে মাঝে আমাকে উপহার দিত। আমি তাহাকে ডাকিতাম "নারায়ণ-দা" সে আমাকে ডাকিত "রমা"।

পিশাচরূপী নারায়ণ আমার মনের অজ্ঞাতে যে সূত্র ধরিয়া আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া আমাকে জাহান্নামে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিল তাহা মনে হইলে এখনও দুঃখ হয়। কত কিশোর বালক যে এই প্রকার বন্ধুত্বের ফলে পাপ-সাগরে ডুবিতেছে তাহার সংখ্যা কে বলিবে।

একদিন ছুটির পর নারায়ণ-দা আমাকে তাহাদের বাগানে লইয়া গেল। তাহার পিতা বাগানটি বেশ সাজাইয়াছিলেন। একদিকে একটা লতায় ঢাকা কুঞ্জবনের মধ্যে শ্বেত পাথরের বসিবার বেঞ্চ ছিল। চার পয়সার চানাচুর ঘুগনিদানা কিনিয়া লইয়া আমরা দু'জনে

সেই কুঞ্জের মধ্যে বসিলাম। সে দিন আকাশটা মেঘলা ছিল। আমরা পাশাপাশি বসিয়া আছি এমন অবস্থায় নারাণ-দা হঠাৎ আমাকে একেবারে বাম হাতে টানিয়া তাহার কোলে আমার মাথা রাখিয়া মুখে চানাচুর গুঁজিয়া দিয়া বলিল—

"আমি তোকে খাইয়ে দি—তুই আমাকে খাইয়ে দে"

আমি হাসিতে লাগিলাম এবং তাহার হাত হইতে চানাচুর খাইতে লাগিলাম ও তাহাকে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলাম। হঠাৎ নারাণ-দা বলিল—"তুই তো রমা—কেমন"?

আমি বলিলাম—"হ্যাঁ তাই তো কেন!"

নারাণ-দা বলিল—"রমা মানে কি তা জানিস?"

আমি বলিলাম—"হ্যাঁ তা জানি বই কি!"

নারাণ-দা বলিল—"আমি নারায়ণ—রমা নারায়ণের কি হয় জানিস?"

আমি বলিলাম—"জানি।"

নারাণ-দা বলিল—"তবে?"

আমি কেমন যেন অবাক হইয়া গেলাম, তারপর তাড়াতাড়ি আমাকে ধরিয়া নারাণ-দা আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল—

"রাগ কল্লি ভাই?"

প্রকৃত পক্ষে আমি রাগ করি নাই—রাগ কেন কিছুই করি নাই বলিলেই ঠিক হয়। তাহার কথায় প্রথমত আমার প্রাণে একটা বিস্ময়ের ভাব জাগাইয়া দিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা অনুভূতির সৃষ্টি করিয়াছিল, যাহার তখন কোন নাম দিতে পারি নাই। নারাণ-দা ওই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে পকেট হইতে একখানা অদ্ভুত রকমের ছুরি বাহির করিল, তাহার মধ্যে ছুরি, কাঁচি, কাঁটা আরও কতকী ছিল। সেইটা আমাকে দিয়া বলিল—

"নে ভাই এটা তোর জন্যে এনেছি।"

এ রকম ছুরি আমি পূর্বে কোন দিন দেখি নাই, ওই অপূর্ব জিনিসটি আমার হইল—এই আনন্দে আমার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

প্রথমেই বলিয়াছি আমি কোন কথা গোপন করিব না। পিতা মাতা পুত্রকে শিক্ষিত সৎচরিত্র দেখিবেন আশা করিয়া স্কুলে শিক্ষকগণের নিকট প্রেরণ করেন ; কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে তাঁহাদের পুত্রগণ লেখাপড়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কি বীভৎস শিক্ষা আয়ত্ত করিতে থাকে। আমার পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা আমার বয়স প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা নিজ নিজ স্কুলের জীবন স্মরণ করিয়া দেখুন, বোধ হয় অনেকের জীবনেই আমার ছাত্র-জীবনের ন্যায় বহু অভিজ্ঞতা লাভের কথা মনে পড়িবে। আমার মত খোলাখুলি ভাবে একথা অনেকেই হয়ত স্বীকার করিবেন না ; কিন্তু মনে মনে আমার কথার সত্যতা অনেকেই স্বীকার করিবেন, একথা স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারি।

ইহার পূর্বে—আমার যতদূর মনে হয়—এই সর্বনাশের আকাঙ্ক্ষার অনুভূতি আমার একেবারেই ছিল না।

আজকাল কোন কোন মাসিক পত্রে দেখিতে পাই মাতৃ-ক্রোড়েও শিশুর যৌন আকাঙ্ক্ষার উদ্ভব হয়, ইহাই তাঁহারা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত। কিন্তু আমার নিজের অভিজ্ঞতা যতটুকু তাহাতে বলিতে পারি, নারাণ-দাব সহিত বন্ধুত্ব স্থাপিত হওয়ার প্রায় এক বৎসর পরে বোধ হয় প্রকৃত আকাঙ্ক্ষার অনুভূতি আমার জাগিয়াছিল। আকাঙ্ক্ষার অস্পষ্ট জাগরণ, যাহার কথা প্রথমেই বলিয়াছি, তাহার অনুভূতি মাঝে মাঝে হইলেও তাহার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা এবং তাহা চরিতার্থদ্বারা কী প্রকার সুখলাভ হয় তৎসম্বন্ধে জ্ঞান আমার তখনও হয় নাই। সুতরাং ওই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার প্রবল ইচ্ছাও তৎকালে আমার প্রাণে জাগরিত হয় নাই। পূর্বোক্ত ঘটনার এক বৎসর অথবা দেড় বৎসর মধ্যেই আমি সেই সর্বনাশের কু-অভ্যাসে,—যাহার অনুষ্ঠান করিয়া বাংলার কিশোরগণ অকাল বার্ধক্য এবং মৃত্যুকে আহ্বান করিয়া আনিতেছে তাহাও শিক্ষা করিলাম। আমার সর্বনাশের ইহাই প্রথম সোপান।

নারাণদার সহিত বন্ধুত্ব করিবার পর আমি ক্রমে ক্রমে অনেক ব্যাপারই জানিতে পারিয়াছিলাম। সমুদয় স্কুলটি জুড়িয়া এই প্রকার ঘৃণিত অভিনয় গুপ্তভাবে চলিতেছিল। শতকরা দশটা ছেলেও নির্দোষ ছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। কোন্ ছেলের সঙ্গে কাহার ভাব, কাহার কতজনের সঙ্গে ভাব, এ সমস্ত সংবাদ নারাণ-দা বিশেষ ভাবে রাখিত। এমন কি আমাদের স্কুলের জনৈক শিক্ষকও এই ঘৃণিত কার্যে ব্রতী ছিলেন। নারাণদার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার পর আমি শুনিয়াছিলাম যে একজনের পেয়ারের ছেলেকে ফুশলাইয়া লইতে আর একজন চেষ্টা করিত, গোপনে প্রেমপত্র লেখা হইত। দূতীগিরি করিবার জন্যও এক শ্রেণির ছেলে নিযুক্ত ছিল।

আমার জীবনের এই অঙ্কে আমি এখানেই যবনিকা ফেলিতে চাই। আমার বিশ্বাস এখনও স্কুলের ছাত্র মহলে এই প্রকার সর্বনাশকর কু-অভ্যাস চলিতেছে। স্কুলের শিক্ষক, পিতা মাতা অভিভাবকগণ অনেকেই বুঝিতে পারেন না যে এই পাপ কোন্ সূত্র ধরিয়া তাঁহাদের স্নেহের পুতুলিগুলিকে গ্রাস করে। নানা প্রকার সংস্কারের চেষ্টায় আজ নব্য বঙ্গ উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন। এই গোড়ায় গলদ নিবারণ করিবার জন্য সংস্কারকগণ একটা উপায় নির্ধারণ করিতে পারিলে, আমার এই নির্লজ্জ বিবৃতি সার্থক হইবে বলিয়া মনে করিব।

প্রতিবেশী কিংবা স্কুলের ছাত্র কোন ছেলেকে অযাচিত ভালবাসা দেখাইলে বা কোন প্রকার স্নেহোপহার দিলে তাহার মূলে যে কোন স্বার্থ আছে একথা কোন অভিভাবক হয়ত ভাবিতেও পারেন না। কিন্তু এই প্রকার ভালাবাসার যে কি শোচনীয় পরিণাম ঘটিতে পারে তাহা অভিভাবকদিগকে হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্যই এত খুঁটিনাটি লিখিতে বাধ্য হইলাম।

পাপের ক্রমবিকাশ

মেধাবী ছাত্র বলিয়া সকলেই আমার প্রশংসা করিত। পূর্বোল্লিখিত দুষ্কার্যে মত্ত হইলেও আমি পড়াশুনায় অমনযোগী হই নাই। প্রতি বৎসর ক্লাসে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বারবার প্রমোশন পাইয়াছি। প্রতি বৎসর পুরস্কারের বই লইয়া যখন বাড়িতে আসিতাম তখন বাবা মা পিসিমা সকলেই খুব আনন্দিত হইতেন। বাবা ভারি চাপা লোক ছিলেন, তাঁহার সুখ দুঃখ লোকে সহজে বুঝিতে পারিত না। কিন্তু আমার বিলাসিতা যখন ক্রমে বাড়িয়াই চলিতে লাগিল, নিত্য নূতন জামা কাপড় জুতা প্রভৃতির বায়না যখন পিসিমার ক্ষুদ্র পুঁজি হইতে পূরণ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল, তখন পিসিমা বাবাকে বলিয়া আমার সেই আবদার পূরণ করিতেন। বাবাও বিশেষ আপত্তি না করিয়া সকল দ্রব্যের জন্য পিসিমাকে টাকা দিতেন। তাহা হইতেই বুঝিতে পারিতাম যে আমার পড়াশুনার উন্নতিতে বাবা সন্তুষ্ট ছিলেন। বাবা কোন সময় সামান্য আপত্তি করিলে—এই প্রকার বিলাসিতার প্রশ্রয় দিলে আমি পরিণামে খারাপ হইয়া যাইব—এই প্রকার কোন কথা বলিলে, পিসিমা গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিতেন,—কেলাসে (Classএ) বছর বছর পেরাইজ (Prize) পাচ্ছে তবু তুমি বলছ ছেলে খারাপ হয়ে যাবে। রমার মত ক'টা ছেলে পাড়ায় আছে? আর দশজন ছেলে ভাল কাপড় জামা পরে বেড়াবে, আর বাছা আমার মুখ নিচু করে থাকবে, তা হবে না! পাঁচটা নয় দশটা নয়, একটা ছেলে [অথচ প্রথমেই বিবৃত হয়েছে তার একটি সহোদর ছোট ভাই আছে। পৃঃ ১২১]—সে একটু ভাল খাবে ভাল পরবে তাও তোমার সয় না!"—

এই প্রকার বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়াই হউক অথবা আমি পড়াশুনা ভালভাবে চালাইতেছি বলিয়াই আমার আবদার পালন করা উচিত, এই মনে করিয়াই হউক, বাবা টাকা দিতে বিশেষ আপত্তি করিতেন না। সুতরাং আমার বিলাসিতা বাড়িয়াই চলিতেছিল। নিত্য নূতন ফ্যাশানের জামা জুতা পমেটম এসেন্স প্রভৃতির খরচ, নিজের খাবারের খরচ—বন্ধুবান্ধবদিগকে খাওয়াইবার খরচ—ইহাতে মাসে নেহাৎ কম লাগিত না।

আমার স্কুলে ভর্তি হওয়ার দুইবৎসর পর নারাণ-দা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিল কিন্তু সে বৎসর পাশ করিতে পারে নাই। তাহার পর বৎসর সে পরীক্ষা পাশ করে। সুতরাং তিন বৎসর আমরা একত্রে থাকিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। এই তিন বৎসর নারাণ-দা আমাকে আর একটি বিদ্যায় দীক্ষিত করিয়াছিলেন, সেটি হইতেছে সিগারেট খাওয়া ; অবশ্য অত্যন্ত গোপনে ইহা খাওয়া হইত। 'কৃপণের ধন' প্রহসনে সুরসিক অমৃতলাল মধু-খুড়ার মুখে বলাইয়াছেন—

—'পাঠশালায় তামাক, স্কুলে সিগারেট, কলেজে হুইস্কি, বিষয় কর্মে গাঁজা, শেষে চণ্ডু টেনে সমাধিতে যেয়ে বসো।"—

আমার ভাগ্যে পাঠশালায় তামাকটা হয় নাই বটে, কিন্তু অবশিষ্টগুলি হুবহু খাটিয়া গিয়াছে। তামাকটাও বাদ যায় নাই, তবে সেটা আরম্ভ হয় অনেক পরে। সে সব ইতিহাস যথাস্থানে বলিব।

নারাণ-দার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছিল তাহার কিছুদিন পর আমি নিজেই যখন লায়েক হইয়া উঠিলাম তখন অবশ্য সেই সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু আমাদের বন্ধুত্বের বন্ধন ক্রমেই দৃঢ়তর হইতেছিল এবং পরস্পরের মনের কথার আদান প্রদান হইত। এই ভাবের আদান প্রদানের ফলে একদিন নারাণ-দার নিকট এমন একটা সংবাদ পাইলাম যাহাকে আমার ভবিষ্যৎ আরও গভীর অধঃপতনের বিশেষ কারণ বলিয়া এখন মনে করিতে পারি। বাড়িতে যুবতী ঝি থাকিলে যে কি ভীষণ পরিণাম ঘটিতে পারে তাহা অনেক অভিভাবক প্রথমত বুঝিতে পারেন না। এই প্রকার সুযোগ পাইয়া নারাণ-দা নিজে সর্বনাশের পথে আর এক ধাপ নামিল এবং আমাকেও আগাইয়া দিল।

কোন কারণে আমি তিন চারিদিন স্কুলে যাই নাই। তিন চারিদিন পরে স্কুলে টিফিনের ছুটির সময় নারাণ-দার সঙ্গে মিলিত হইলাম এবং প্রথম প্রশ্নই নারাণ-দাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি নারাণ-দা তোমার নলিনের খবর কি?"

নারাণদা বলিল—"নলিন ফলিনের চেয়ে অনেক উঁচু দরের জিনিস শর্ম্মারাম এবার দখল করে বসেছেন!"

আমি একটু অবাক হইলাম, তারপর চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কে নারায়ণ-দা? কোন্ ক্লাসে?" নারাণ-দা আবার হাসিয়া উঠিল—তারপর বলিল—

"কেলাস ফেলাস নয় রে গরু, কেলাস ফেলাস নয়।"

আমি নির্বাক বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম, সে আমার মুখের ভাব দেখিয়া খুব এক চোট হাসিয়া লইল—তারপর বলিল—"শোন্ তোকে সব কথা বল্‌ছি। আমাদের বাড়ির রানি ঝিকে চিনিস তো, সেই যে আমাদের খাবার টাবার এনে দেয়!"

নারাণ-দা আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল—সেই।

আমি প্রায় লাফাইয়া উঠিলাম। তারপর নারাণ-দার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলাম—"সত্যি বল্‌ছো?"

নারণা-দা বলিল—"সত্যি নয়তো কি মিছে!"

আমি তখন নারাণদাকে ধরিয়া বসিলাম কেমন করিয়া কী ভাবে এই ব্যাপার সংঘটিত হইল তাহার বিস্তারিত ইতিহাস শুনিবার জন্য। তাহার উত্তরে নারাণ-দা যাহা বলিল তাহাতে আমি জানিতে পরিলাম যে ৪/৫ দিন পূর্বে আমাদের স্কুলের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী একটি স্কুলের একটা ফুটবল ম্যাচ খেলিতে নারাণ-দা হাতে একটা চোট পাইয়াছিল। তখন বিশেষ কিছু লাগে নাই কিন্তু বাড়িতে গেলে সন্ধ্যার পর হইতে ক্রমে বেদনা বৃদ্ধি হয়। নারাণ-দার মা রানিকে বলেন তাহার হাতে একটা ঔষধ মালিশ করিয়া দিতে।

নারাণ-দা বিছানায় শুইয়াছিল, রাণী বিছানায় বসিয়া তাহার হাত দুটি কোলের কাছে

লইয়া ঔষধ মালিশ করিতেছিল। ঔষধ মালিশ করিবার সময় নারাণ-দা একবার নড়া-চড়া করিতে তাহার একটা হাত হঠাৎ রানির অঙ্গ স্পর্শ করে। বলা বাহুল্য নারাণ-দা ইচ্ছা অথবা কোন উদ্দেশ্য লইয়া ওই প্রকার করে নাই। সে নারাণ-দার দিকে একটা বিলোল কটাক্ষ হানিয়া বলিল—'ছিঃ দাদাবাবু!' নারাণ-দা প্রথমত একটু ভ্যাবাচাকা খাইয়াছিল কিন্তু পরক্ষণই তাহার কিছু বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

নারাণ-দার নিকট এই কাহিনি (অবশ্য এত সংক্ষেপে নয়) খুটিনাটি প্রত্যেক বিষয় সহ শুনিবার পর নারাণ-দার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে আমার মন ভরিয়া উঠিল। নারায়ণ-দার প্রতি "শ্রদ্ধা" ও "সম্ভ্রম" এই দুইটি কথা শুনিয়া কেহ হাসিবেন না। বাস্তবিক তখন আমার মনে যে ভাব জাগিয়াছিল, এতদিন পরে তাহাকে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে তাহা "শ্রদ্ধা" ও "সম্ভ্রম" ভিন্ন আর কিছুই নহে। তখন কৈশোর এবং যৌবনের সন্ধিস্থলে আমরা দাঁড়াইয়া। নানা উপায়ে সর্বনাশী ক্ষুধার নিবৃত্ত করিলেও বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে যাহা করিতেছি তাহা শুধু "ছায়া" লইয়া খেলা, প্রকৃত "কায়ার" নকল, আসল কায়া নহে। সেই রহস্যের অবগুণ্ঠন উপযুক্ত সাহসের অভাবে আমরা তখন পর্যন্ত কেহই মোচন করিতে পারি নাই। কেবল মাত্র কল্পনার সাহায্যে সেই পাপের মাধুর্য নানাপ্রকার রঙিন রেখায় অঙ্কিত করিতেছি মাত্র। এই প্রকার অবস্থায় যখন জানিতে পরিলাম যে আমাদেরই একজন সেই সর্বনাশী রহস্যের অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়াছে, যাহা আমাদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ ফল, সাহসের সহিত তাহা চয়ন করিয়া উপভোগ করিয়াছে, (Has plucked and enjoyed the forbidden fruit) তখন তাহার প্রতি আমাদের মনে "শ্রদ্ধা" ও "সম্ভ্রমের" জাগরণ ভিন্ন অন্য আর কি ভাব আসিতে পারে! ফুটবলে, ক্রিকেটে, ফ্যাশানে সবটাতেই নারাণ-দা অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়া যেমন আমার শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে, এই ব্যাপারেও তাহার এই কৃতিত্ব (achivement) আমার প্রাণে ঠিক সেই জাতীয় শ্রদ্ধারই উদ্রেক হইয়াছিল।

ইহার পর প্রায় প্রত্যহই নারাণ-দার সঙ্গে আলাপ হইতে লাগিল। কি কি উপহার নারাণ-দা তাহাকে দিয়াছে (অবশ্য কলের লাটিম, আর অটোমেটিক পেনসিল নয়) ইত্যাদি সব কথা শুনিতাম এবং এই প্রকার সৌভাগ্য আমার কবে হইবে তাহা চিন্তা করিতাম। এক দিন যাহাকে সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিতাম আজ বুঝিতেছি তাহা সৌভাগ্য নহে, দুর্ভাগ্যেরই প্রথম সোপান মাত্র। প্রকাশ্যে পতিতালয়ে যাওয়ার প্রবৃত্তি আমার ছিল না, সে সময়ে কেমন একটা ঘৃণাও ছিল, সাহসও ছিল না বলিতে পারি। দুর্ভাগ্যক্রমে বাড়িতে যে ঝি ছিল তাহার বয়স পঁচিশ ত্রিশ হইলেও রং ছিল আবলুস কাঠের মত। সম্মুখের দুটি দাঁত ঠোঁটের বাহিরে সর্বদা যেন আক্রমণোদ্যত হইয়া থাকিত। সুতরাং তাহাকে অবলম্বন করিয়া কোন প্রকার রোমান্স্ (Romance) সৃষ্টি করাও সম্ভব ছিল না। অতি আধুনিক নব্য সাহিত্যের প্রচার হইয়া পদি জেলেনি, ভবি মেছুনি প্রভৃতি বস্তিবাসীগণকে তখনও নায়িকার পদবিতে প্রতিষ্ঠিত করে নাই : সুতরাং আমার আশা পূর্ণ হওয়ার কোন প্রকার সুযোগ খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না।

কিন্তু "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধর্ভবতি তাদশী" এই কথাটির সার্থকতা শীঘ্রই বুঝিতে পারিলাম। অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার সুযোগ ঘটিয়া গেল। সেদিন রবিবার। আহারের পর একটু বিশ্রাম করিয়া বেলা প্রায় দুইটার সময় ছিপ চার প্রভৃতি লইয়া আমাদের চাটুজ্জেদের পুকুরে মাছ ধরিতে গিয়াছি। চাটুজ্জ্যেদের প্রকাণ্ড চকমেলান বাড়ির সম্মুখে এই পুকুর। চাটুজ্জ্যেদের কেহই থাকেন না। কর্তা চাকুরি উপলক্ষে সারা বৎসর বাংলা দেশের নানা জেলায় ঘুরিয়া বেড়ান। পরিবারবর্গ তাহার সঙ্গেই থাকেন। বাড়ির অন্তঃপুরে বৃদ্ধা মাতা থাকেন। অধিকাংশ ঘরই তালা দ্বারা আবদ্ধ থাকে। বাড়ির বৈঠকখানা সোফা কাউচ প্রভৃতি দ্বারা আধুনিক প্রথামত সজ্জিত। আর একটিতে তাকিয়া সতরঞ্চ প্রভৃতি বিছাইয়া প্রাচীনমতে ফরাস করা থাকে, আর একটি কক্ষে সম্রান্ত অতিথি প্রভৃতি থাকিবার জন্য দু'খানি খাট পাতা আছে। এই বৈঠকখানা ঘরের প্রথোমক্ত এবং শেষোক্ত কক্ষও তালা-বদ্ধ থাকে। কেবল মাত্র ফরাস করা ঘরটা খোলা থাকে। এই ঘরে বাবুর ভাগিনেয় শ্রীমান অপূর্ব সশরীরে বিরাজ করিয়া থাকেন। এই শ্রীমানের বয়স তখন সাতাশ-আটাশ বছর, পিতামাতা নাই, মাতুলের অন্নেই প্রতিপালিত। মাতুল লেখাপড়া শিখাইতে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু এণ্ট্রান্স স্কুলের তৃতীয় শ্রেণিতে পাঁচবার প্রমোশন না পাওয়ায় বিদ্যা সেইখানেই খতম হয়। কিন্তু বিদ্যা তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত হইলে কি হইবে, তাহার মুখে ইংরেজি বুক্‌নি দেওয়া বক্তৃতা শুনিলে মনে হইত যে সে অন্তত বি. এ. পর্যন্ত পড়িয়াছে। সম্মুখে চোদ্দ আনা, পিছনে দু'আনা রকমে ছাঁটা চুল, মিহি আদ্ধির আজানুলম্বিত পাঞ্জাবী, লম্বা কোঁচা ঘুরাইয়া পাঞ্জাবীর পকেটে গোঁজা, মুখে প্রজ্বলিত সিগারেট, হাতে একখানি ছড়ি, পায়ে নাগরাই লপেটা জুতা (তখন তাহা কেবল নূতন উঠিয়াছে), এই বেশে আমরা তাহাকে প্রায়ই দেখিতে পাইতাম। গ্রামের শখের থিয়েটারে তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী। হারমোনিয়াম বাজাইতে, মেয়েলি গলায় গান গাহিতে তিনি খুব পটু। সম্প্রতি কলিকাতা যাইয়া নৃপেন বোসের নিকট নাচ শিখিয়া আসিয়াছেন এবং গ্রামের ও আশ-পাশের কতকগুলি ছেলেকে লইয়া নাচ শিখাইতে ব্যস্ত আছেন। তখনকার দিনে তিনি ছিলেন 'অতি আধুনিক' বেকার গ্রাম্য বাবু এবং তিনি নিজকে রবিবাবুর শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতেন। বাবুর মাতা তাঁহার মাতামহী, আমার পিসিমারই উন্নত সংস্করণ ছিলেন। সুতরাং দাদার এই বাবুয়ানায় বিশেষ বাধা হইত না। বৎসরে এগার মাস অব্যাহত স্বাধীনতা তিনি ভোগ করিতেন, কেবল যে একমাস বাবু বাড়িতে থাকিতেন সেই একমাস তাঁহার স্বাধীনতা কিছু খর্ব হইত। যাহা হউক যে কথা বলিতেছিলাম তাহাই এখন বলি। আমি মাছ ধরিতে যখন পুকুরের ঘাটে যাইয়া উপস্থিত হইলাম তখন ঘাটে কোন লোকজন ছিল না। ঐ দিকটাই স্বভাবত নির্জন। চাটুজ্জেদের বাড়িতেও সেই সময় লোকজন শূন্য।

আমি ধীরে ধীরে ঘাটে নামিলাম সহসা ঘাটের সকলের নীচের ধাপে আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। দেখিলাম একটা কলসি এবং একখানা চওড়া লালপেড়ে শাড়ি ও গামছা

সেই ধাপের উপর এক পাশে রহিয়াছে কিন্তু কোন লোক নাই। আমার মনে গুরুতর সন্দেহ উপস্থিত হইল। আমি জানিতাম চাটুজ্জেদের বাড়িতে কোন সধবা মেয়ে নাই। সুতরাং এই শাড়ি পাড়ার অন্য কোন মেয়ের হইবে তাহা বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু সে মেয়ে কোথায় গেল! আমার ধারণা হইল কোন মেয়ে হয়ত পা পিছলাইয়া পরিয়া ডুবিয়া গিয়াছে। আমি ছিপ ফেলিয়া তাড়তাড়ি জলে নামিয়া অনুসন্ধান করিতে উদ্যত হইলাম, কিন্তু হঠাৎ মনে হইল যে চাটুজ্জে বাড়িতে যদি কোন আত্মীয় কুটুম্বের মেয়ে আসিয়া থাকে তবে সে হয়তো ঘাটে এই সব রাখিয়া অন্য কোনও কিছু আনিতে বাড়ির ভিতরে যাইয়া থাকিবে। এই কথা মনে হইতেই জলে আর নামিলাম না, দুই তিন মিনিট কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলাম। তারপর মনে হইল দাদা বোধ হয় বৈঠকখানা ঘরেই আছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেই গোল মিটিয়া যায়। এই মনে করিয়া তাড়াতাড়ি উপরে উঠিলাম এবং দৌড়িয়া বৈঠকখানা ঘরে দরজায় গেলাম। দুটি কক্ষ বাহির হইতে তালা বন্ধ ছিল। মধ্যের কক্ষের দরজা ভেজান ছিল, আমি ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলিয়া গেল এবং ভিতরের হুড়কাটা সশব্দে মেজের উপর পরিয়া গেল। বুঝিতে পারিলাম হুড়কাটা ভাল করিয়া লাগিয়াছিল না। যাহা হউক দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে যে দৃশ্য আমার চোখে পরিল তাহাতে আমি হতভম্ব হইয়া গেলাম।

আমি সমুদয় ব্যাপারই বুঝিতে পারিলাম। ঘাটে যে কলসি ও কাপড় ছিল তাহা যে রমলার এবং রমলাই পুকুরে গা ধুইবার ও জল আনিবার ছল করিয়া অপূর্বদার নিকট আসিবার সুযোগ করিয়া লইয়াছে তাহা আমার বুঝিতে বাকি রহিল না। আমি কিছু না বলিয়া ফিরিয়া আসিলাম এবং ঘাটে আসিয়া চার করিয়া ছিপ ফেলিবার যোগাড় করিতে লাগিলাম।

যোগাড় করিত লাগিলাম বটে কিন্তু আমার সে সময়ের মনের অবস্থা অতি আধুনিক কোন কবির ভাষায় বলিতে গেলে—

"দেহে দাহ চোখে মরু সর্ব অঙ্গ কাঁপিছে তৃষায়"। অল্পক্ষণ পূর্বে ষোড়শী সুন্দরী রমলার যে মূর্তি আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম তাহার স্মৃতি শিরায় শিরায় যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটাইয়া দিতেছিল। ছিপটা ধরিয়া বসিয়াছিলাম বটে কিন্তু মাছ ধরিবার দিকে আমার কোন লক্ষ ছিল না। ভাবিতেছিলাম রমলার কথা, আর ভাবিতেছিলাম তাহার নিটোল নিখুঁত অবয়ব ইত্যাদি—। সহসা আমার চিন্তাস্রোতে বাধা পরিল, আমার পা দুটিতে কাহার হস্ত এবং তপ্ত কয়েক ফোটা জলের স্পর্শ অনুভব করিলাম। আমি চমকিয়া উঠিয়া দেখি রমলা দুই হাত দিয়া আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতেছে। অতি কষ্টে আত্ম-সংবরণ করিয়া বলিলাম—

—"কিরে রমলি কাঁদিস্ কেন?"

রমলা বলিল—"দোহাই তোমার রমেশ-দা।"

এই কথা বলিয়া আরও জোরে ফোপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি গম্ভীরভাবে

বলিলাম—"তুই একেবারে বয়ে গেছিস্—বাড়ুজ্জে কাকাদের আমায় এসব বলতেই হবে। ছি। ছি! তুই যে বাড়ুজ্জে গোষ্ঠীর নাম ডোবালি।"

রমলা আরও কাঁদিতে লাগিল, তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া এবং আমার দু'টি হাত তাহার দুই হাত দিয়া ধরিয়া বলিল,—"আমি তা হলে আর বাঁচবো না রমেশ-দা, বাবা শুনলে আমায় মেরে ফেলবে। দোহাই তোমার—আমাকে মাফ কর।"

আমি বলিলাম—"আচ্ছা বেশ--কিন্তু তার জন্য তুই কি দিবি?"

রমলা বিস্মিত হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"কী দেবো রমেশ-দা! আমার কী আছে--কি চাও তুমি!"

আমার বুকের ভিতর টগ বগ করিয়া রক্ত ফুটিতেছিল।

রমলা আমার মুখের দিকে তাকাইয়া একবার বিদ্রূপের হাসি হাসিল, তারপর বলিল—"বটে, তবে না বড় নেকচার (lecture) দিচ্ছিলে!"

আজ এই দীর্ঘকাল পরে, যৌবনের উন্মাদনা যখন হ্রাস হইয়াছে, অপরিমিত অত্যাচারের ফলে নানাপ্রকার ব্যাধি যখন আসিয়া দেহকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, অজ্ঞাত অজানা-রাজ্যে কৃতকার্যের ফলাফল ভোগ করিবার জন্য, অলভনীয় আহ্বানের দূরাগত অস্পষ্ট ধ্বনি যখন এক একবার কানে আসিয়া পৌঁছিতেছে তখন বুঝিতে পারিতেছি যে নিজের কী সর্বনাশ আমি করিয়াছি। কিন্তু ইহার জন্য দায়ী কি আমি? আমার মনে হয় কতকটা আমি হইলেও সম্পূর্ণ আমি নই। ধর্ম ও সংযমহীন শিক্ষা প্রণালী, যাহা শুধু বিলাসিতার আগ্রহ বৃদ্ধি করে, তাহাই আমার অধঃপতনের জন্য প্রধানত দায়ী বলিয়া আমার মনে হয়। আমার দুষ্টগ্রহ নারাণ-দা এই প্রকার শিক্ষা প্রণালীরই একটি জীবন্ত ফল। তিনি আমার সর্বনাশ করিয়াছিলেন, আরও অনেকের সর্বনাশ করিয়াছেন, আমি এবং সেই সকল ছেলে আবার আরও অনেকের সর্বনাশ করিয়াছি, তাহারাও তাহাদের পরবর্তী অনেকের সর্বনাশ করিয়াছে। এই পাপের ক্ষুদ্র বীজ শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট বিশাল মহীরুহের আকার ধারণ করিয়া আমাদের সমাজকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। সেই বৃক্ষের আওতায় প্রকৃত মনুষ্যত্বের বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারিতেছে না।

প্রাচীনকালে গুরুগৃহে শান্ত সমাহিত চিত্তে ধর্ম ও নীতির অবেষ্টনে সংযম ও ব্রহ্মচর্যের ভিতর দিয়া যে শিক্ষা ছাত্রগণ লাভ করিত, বর্তমান যুগে তাহা ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করা দুরাশা মাত্র—তাহা অস্বীকার করিতে পারি না, কিন্তু বর্তমান যুগোপযোগী শিক্ষার মধ্যেও সেই ব্রহ্মচর্য, সংযম, ধর্ম ও নীতির আবহাওয়া সৃষ্টি করা কি একেবারেই অসম্ভব! আমার চরিত্রের যে পরিচয় এপর্যন্ত পাঠকগণ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাতে আমার মুখে এই সব কথা তাঁহারা "ভূতের মুখে রাম নাম" মনে করিতে পারেন। কিন্তু আমি ঠেকিয়া শিখিয়াছি—যাঁহারা এই সব চিন্তা করেন তাঁহারা অন্তত আমার এই কঠোর অভিজ্ঞতার সুযোগ লইতে ঘৃণা করিবেন না আশায় এই কয়েকটি কথা বলিলাম। এই অতি আধুনিক বাবুটির সংশ্রবে আমার মত কত কিশোর ও যুবক যে বিপথগামী হইয়াছে তাহা ভাবিলে এখনও শিহরিয়া

উঠিতে হয়। এই প্রকার বাবুর আওতা হইতে ছেলেদিগকে দূরে রাখিতে অভিভাবকদিগকে সাবধান করিবার জন্যই নিজ জীবনের এই ঘৃণ্য কাহিনিও লিখিতে বাধ্য হইলাম।

আমার যে খুড়তুতো ভাইয়ের কথা বলিয়াছি তিনি আমার ন্যায় শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই। কৈকালা ও নবদ্বীপ সংস্কৃত টোলে তিনি কাব্য ব্যাকরণ সাংখ্য বেদান্ত ও স্মৃতি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে কৈকালা গ্রাম সংস্কৃত শিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। অনেকগুলি চতুষ্পাঠী সেখানে ছিল। ইংরাজি শিক্ষার গর্বে তাঁহাকে (দাদা হইলেও) আমি একটি আস্ত জানোয়ার বলিয়া তখন মনে করিয়াছি। কিন্তু আজ বুঝিতে পারিয়াছি প্রকৃত শিক্ষা যাহা সংযম, সততা ও সন্তোষ আনয়ন করে তাহাই তিনি লাভ করিয়াছিলেন (Plain living and high thinking), সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপনের সঙ্গে উচ্চ চিন্তার সমাবেশ তাঁহার মধ্যে ঘটিয়াছিল। আর আমি আধুনিক শিক্ষা প্রণালীর ফলে লাভ করিয়াছিলাম উচ্ছৃঙ্খলতা, অসততা এবং দুরাকাঙ্ক্ষা। বিলাস ব্যসনরত জীবনযাপন এবং কুৎসিত হীন চিন্তা—এই দুটি আমার মধ্যে সমাবেশ ঘটিয়াছিল।

দাদার কথা আমার এই জীবন কাহিনিতে পরে আরও বলিতে হইবে। প্রাচীনকালের গুরুগৃহের শিক্ষার লুপ্তাবশেষ যাহা এখনও চতুষ্পাঠীগুলিতে আছে, তাহার ফলেই যদি দাদার মত চরিত্র সৃষ্ট হয় তাহা হইলে ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, সেই প্রাচীন কালের শিক্ষা প্রণালী প্রকৃত মনুষ্যত্ব গড়িয়া তুলিতে কত বেশি কার্যকরী ছিল। এইটুকু বলিয়া আমার জীবন চরিতের এই অধ্যায় আমি শেষ করিলাম।

আমার স্কুলের অবশিষ্ট জীবনের ভিতর আর বিশেষ বৈচিত্র কিছুই নাই। আমি যখন শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইন্‌স্টিটিউসনে পড়ি তখন যাঁহারা সেই স্কুলে পড়িতেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কর্মক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন। হুগলি কলেজের প্রিন্‌সিপাল শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য এম. এ. পি. আর. এস. মহোদয় এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। আমি এই স্কুলে ভর্তি হওয়ার পূর্বেই তিনি স্কুল হইতে পাশ করিয়া বাহির হইয়া যান, কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে আসিতেন। তাঁহার ন্যায় অসাধারণ মেধাবী ছাত্রকে আমাদের স্কুলের গৌরব বলিয়া মনে করিতাম। এস. সি. ঘোষ, যিনি শেষে রেলওয়ে বোর্ডের মেম্বার হইয়াছিলেন তিনিও এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তিনিও আমার ভর্তি হওয়ার পূর্বেই ওই স্কুল পরিত্যাগ করেন। বর্তমান "রামযাদু" প্রেসের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিমোহন গোস্বামী বি-এ মহাশয় আমাদের সময় ওই স্কুলের হেড্‌মাস্টার ছিলেন। এই শ্যামবর্ণ গোঁপদাড়ি কামান সাধারণ গোছের মানুষটিকে আমরা একদিকে যেমন ভয় করিতাম তেমনি অপরদিকে চরিত্রের গুণে তাঁহাকে অসাধারণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি না করিয়া পারিতাম না। শ্রীরামপুরের বর্তমান প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য এম. এ. বি. এল. আমাদের সময় ওই স্কুলের ছাত্র ছিলেন, অবশ্য তিনি আমাদের চেয়ে উপরের শ্রেণিতে পড়িতেন।

আমি এণ্ট্রান্স পাশ করিলে কিছুদিন পরেই স্বদেশি আন্দোলন আরম্ভ হয়। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ স্বরূপ যে ভাবের বন্যা সমস্ত বাংলা দেশকে ভাসাইয়া দিয়াছিল আমিও তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারি নাই। বাঙালির জীবনে সেবার এমন একটা প্রেরণা আসিয়াছিল, যাহার ফলে বাংলার দিকে সমুদয় ভারতের, ভারতের কেন—সমুদয় পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছিল।

শ্রীরামপুরে মাঝে মাঝে সভা হইতে লাগিল, দেশবিশ্রুত বড় বড় বক্তা যাইয়া বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা বিদেশি বর্জনের জন্য দোকানে দোকানে পিকেটিং করিতে লাগিলাম। এই সময় স্বর্গীয় ডি. এল. রায়ের সেই গান—"বঙ্গ আমার জননী আমার—ধাত্রী আমার—আমার দেশ" আমরা প্রথম শুনিলাম। আমরা সমস্বরে কতকগুলি ছাত্র মিলিয়া ওই গান গাহিয়া ভিক্ষা ও পিকেটিং করিতাম। সেই সময়ে বাংলা দেশে এমন কতকগুলি গান রচিত হইয়াছিল, যাহা ভাবে, ভাষায় ও ব্যঞ্জনায় পৃথিবীর যে কোন জাতীয় সংগীতের তুল্যস্থান অধিকার করিতে পারে। অনুশীলন সমিতি, সুহৃদ সমিতি প্রভৃতি বহু উচ্চশ্রেণির সমিতি তখন স্থাপিত হইয়াছিল। আমরা "তামছা-বাহেবা-শির" ইত্যাদি উচ্চারণ করিয়া তরবারির অনুকল্পে লাঠি লইয়া তরবারি চালনা শিক্ষা করিতাম। শ্রীরামপুরে প্রফেসর মুরতাজা নামক একজন মুসলমান ছিলেন, ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে তিনি সার্কাসের দল লইয়া ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট আমরা লাঠি, তরবারি, ছোরা খেলা এবং অন্যান্য কসরৎ শিখিতাম।

এণ্ট্রান্স পাশ করিবার পর এই হুজুগে আমার পড়াশুনা অনেক দিন বন্ধ ছিল। আমার পিতা এই হুজুগের বিপক্ষে ছিলেন। তিনি বলিতেন যে "গঙ্গাজলে মুরগি সিদ্ধ করে খাওয়া যেমন হিন্দুয়ানি তোমাদের এই স্বদেশিও ঠিক তেমন।"

বাবার সমবয়স্ক অনেকে ইঁহার প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার এই প্রকার মতের কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন তাহা এখনও আমার বেশ মনে আছে। তিনি বলিয়াছিলেন—

"তোমরা বলিতেছ বিলাতি বর্জন কর—কিন্তু সত্যই কি তাই? সে দিন কলিকাতার একটি বন্ধুর বাড়ি গিয়াছিলাম, তাঁহার বাড়ির ছেলে মেয়েদের কতকগুলি জামা কাপড় তৈয়ারি হইয়া আসিয়াছে দেখিলাম। সবই দেশি কাপড়ের, কিন্তু জিনিসগুলি হইতেছে নিকার-বোকার, ব্লাউজ, কোট, প্যাণ্ট। কাপড়টা স্বদেশি হইবে কিন্তু তদ্দ্বারা জামাগুলি যাহা প্রস্তুত হইবে তাহা বিলাতি সভ্যতার আদর্শে না হইলে চলিবে না—স্বদেশিজাত জুতা পরিবে কিন্তু জুতা তৈরি হইবে বিলাতি জুতার অনুকরণে। বিদেশির অনুকরণে চা না খাইলে চলিবে না, তবে চিনিটা বিদেশি হইলেও কাপটা স্বদেশি হওয়া চাই। তাকিয়া ফরাসে তোমাদের চলিবে না—সোফা কাউচ টেবিল চেয়ার বিলেতি সরঞ্জাম চাই, তবে সেটা ল্যাজারসের বাড়ি হইতে না আনিয়া দেশি দোকান হইতে আনিবে, এইটুকু ত্যাগ স্বীকার তোমরা করিতে প্রস্তুত। বৈদেশিক খাদ্য খাইতেই হইবে তবে তাহা গ্রেট্‌ইস্টার্নে না

খাইয়া কোন স্বদেশি রেস্তোরাঁতে খাইবে, এই তো তোমাদের মনোবৃত্তি! ইহা কি গঙ্গাজলে মুরগি রাঁধা নয়? দেশিয় সরল অনাড়ম্বর আচার ব্যবহার তোমরা ঘৃণা করিতে শিখিয়াছ। বিদেশির আচার ব্যবহার পরিচ্ছদ প্রভৃতির মোহ তোমাদিগের মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহা যদি পরিত্যাগ করিতে না পার তাহা হইলে এই সাময়িক উত্তেজনা বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বড় জোর একটা সাময়িক ফলপ্রসব করিতে পারে কিন্তু তারপর আবার তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।"

অবশ্য তখন কথাটা খুব ভাল লাগে নাই। তখন আমরা নব উৎসাহে সঞ্জীবীত, নিজেরা নিজকে এক একটা গ্যারিবল্‌ডি বলিয়া মনে করি—পাষণ্ড ইংরেজকে তাড়াইয়া দিয়া দুচার দিনের মধ্যেই আমরা ভারত স্বাধীন করিব, ইহাই আমরা একপ্রকার স্থির করিয়া ফেলিয়াছি—তখন এসব কথা ভাল লাগিবে কেন!

কিন্তু কিছুদিন পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে বাবার ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে।

এই স্বদেশি-আন্দোলনে যোগদান করিয়া পড়াশুনা ত্যাগ করায় বাবা আমার উপর খুব অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু আমি তখন তাহা গ্রাহ্য করি নাই। এই সময় আমি প্রথম কলিকাতায় আসি। আমার এক জ্ঞাতি খুড়া কলিকাতাতে তখন বাস করিতেন, তিনি হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। তিনি স্বদেশি আন্দোলনের একজন পাণ্ডা ছিলেন—আমাকে এ বিষয়ে তিনি খুব উৎসাহ দিতেন। **তাঁহার নাম আমি প্রকাশ করিব না, কারণ তিনি "মানদা" ওরফে "পতিতা মানদার" পিতা।** মানদা যখন তাঁহার নাম গোপন করিয়াছে তখন আমার পক্ষে তাঁহার নাম প্রকাশ করা সঙ্গত হইবে না। তিনি পরবর্তী জীবনে আমার বহু উপকার করিয়াছিলেন, নিজের বাড়িতে রাখিয়া খাওয়াইয়া ভাল একটি চাকুরিও করিয়া দিয়াছিলেন,—**কিন্তু রিপুর তাড়নায়, তাঁহার কন্যাকে গৃহত্যাগিণী করিয়া, তাঁহার উপকারের যে প্রতিদান আমি দিয়াছি তাহাই যথেষ্ট** ; এখন আবার সমাজে তাঁহার নাম প্রকাশ করিয়া তাঁহার উন্নত মস্তক হেঁট করিতে ইচ্ছা করি না।

স্বদেশি আন্দোলন সম্বন্ধে আর বেশি কিছু লিখিবার প্রয়োজন নাই। আন্দোলন হ্রাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি পুনরায় কলেজে ভর্তি হইলাম। ইহার কিছু পূর্বেই আমার পিসিমার মৃত্যু হয়। বৃদ্ধাবস্থায় জ্বরাতিসারে তিনি মারা যান। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব দিবস সন্ধ্যার সময় আমি তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিলাম, এমন সময় পিসিমা আমাকে বলিলেন—"বাবা! আমি তো এবার যাচ্ছি। তুই পড়াশুনা ছেড়ে আর স্বদেশি করিসনে—তোর বাপ মা তোকে দিয়ে কত আশা করেছিল—তুই আবার পড়াশনা কর।"

পিসিমার যে জীবনের আশা নাই তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম। পিসিমার কথা শুনিয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম এবং স্বীকার করিলাম আমি আবার পড়াশুনা করিব। পিসিমা হঠাৎ আমাকে বলিলেন—"দ্যাখ তো বাবা কেউ আসছে নাকি।" আমি দরজায় যাইয়া

দেখিলাম—কেহই নাই। আমি পিসিমাকে সে-কথা বলিলাম। পিসিমা তখন বলিলেন—"আমার মাথার নীচে একখানা কাঁথা আছে—টেনে বের কর দেখি।"

আমি আস্তে আস্তে পিসিমার মাথাটা তুলিয়া ধরিয়া বালিস তুলিয়া দেখিলাম সেখানে সযত্নে ভাঁজ করা একখানা কাঁথা রহিয়াছে। পিসিমা বলিলেন—"এই কাঁথাখানার ভিতর তিন হাজার টাকার নোট সেলাই করা আছে। এই টাকাগুলি আমি তোকে দিলাম। বুঝে শুনে খরচ করিস। তোর বাপ তোর উপর বড্ড রেগে আছে, সে যদি তোর পড়ার খরচ না দেয়—এই টাকা দিয়ে তুই কলকাতা যেয়ে পড়বি। তোর বাপকে এ টাকার কথা বলিসনে—সাবধানে টাকাগুলো রেখে দিস।"

আমি অবাক হইয়া গেলাম। পিসিমা অল্প বয়সে বিধবা হইয়া পিত্রালয়ে আসিয়াছিলেন। তাঁহার স্বামীর খুব বড় একটা জোত ছিল। বাবাই তাহা আধি হিসাবে প্রতিবৎসর লাগাইয়া দিতেন এবং ফসলের সময় শস্য বিক্রয় করিয়া যাহা পাওয়া যাইত পিসিমাকে আনিয়া দিতেন। এসব কথা আমি জানিতাম। পিসিমা সেই সব টাকা ইচ্ছামত খরচ করিতেন, দুই তিনবার তীর্থ পর্যটনও করিয়া আসিয়াছিলেন, আমার নানাপ্রকার আবদার পালনের জন্যও তিনি বহু টাকা দিয়াছেন, তাহার পরও তিনি এত টাকা জমাইয়াছেন ইহা আমি স্বপ্নেও ধারণা করিতে পারি নাই।

যাহা হউক কাঁথাটা লইয়া আমি বাক্সে লুকাইয়া রাখিয়া দিলাম। পরদিন পিসিমা মারা গেলেন। পিসিমার এক জ্ঞাতিকে আনিয়া বাবা তাঁহার দ্বারা শ্রাদ্ধাদি নিজ ব্যয়েই সম্পন্ন করাইলেন। পিসিমার বাক্স খুলিয়া নগদ তেত্রিশ টাকা সাড়ে সাত আনা পাওয়া গিয়াছিল। বাবা তাহা ঐ দরিদ্র জ্ঞাতিটিকে দিয়া দিলেন।

পিসিমার মৃত্যুর পর কলিকাতা যাইয়া কলেজে পড়িবার কথা বাবার নিকট প্রস্তাব করিলাম। বাবা আপত্তি করিলেন না। শুভদিন দেখিয়া আমি কলিকাতা যাত্রা করিলাম। যেখানে আমহার্স্ট স্ট্রীট এবং সুকিয়া স্ট্রীট মিলিত হইয়াছে [বর্তমানে রামমোহন সরণি ও কৈলাস বোস স্ট্রিট], তাহারই নিকটে আমহার্স্ট স্ট্রীটের উপরিস্থিত একটি ছাত্রাবাসে আমার থাকবার স্থান করিয়া লইলাম।

কলেজ জীবন

কলেজ জীবন সম্বন্ধে লিখিতে বসিয়া প্রথমেই আমার মনে হইতেছে মেসের কথা। মেস জীবনের অভিজ্ঞতা আমার তখনই প্রথম হইল। এই মেস জীবন আমার নিকট তখন খুব ভালই লাগিয়াছিল। প্রথমত কতকগুলি সহপাঠী ও সমবয়স্কের একত্রে বাস, দ্বিতীয়ত অভিভাবকের কঠিন শাসন হইতে মুক্তি এই, দুইটি জিনসই আমার ন্যায় অপরিণতবয়স্ক যুবকের পক্ষে অত্যন্ত আরামদায়ক বলিয়া মনে হইয়াছিল। স্কুলে মাস্টার মহাশয় দৈনিক পড়া জিজ্ঞাসা করিতেন, পড়া বলিতে না পারিলে নানাপ্রকার শাস্তির বিধান ছিল, তৎপরিবর্তে কলেজে অধ্যাপকের শাসন রহিত অধ্যাপনা ; অধ্যাপক বই খুলিয়া বক্তৃতা করিয়া যাইতেন, আমরা পিছনের বেঞ্চে বসিয়া বেশ গল্প করিতেছি—এই অবাধ স্বাধীনতা, শাসন হইতে অব্যাহতি পাইয়া আমি খুব আনন্দিত হইয়াছিলাম।

আমি যে মেসে থাকিতাম তখন এফ-এ (তখনও আই এ. আই. এস-সি. হয় নাই) ও বি-এ ক্লাসের অনেক ছাত্র এবং ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলেরও কয়েকজন ছাত্র থাকিত। আমি যে ঘরে থাকিতাম সে'টি দুই সিটের ঘর, আমার সঙ্গে থাকিত একটি মেডিকেল স্কুলের ছাত্র। প্রতি মাসে আমার পড়ার খরচের জন্য বাবা ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা দিতেন। খাওয়া ও জল খাওয়া, ধোপা নাপিত কলেজের বেতন ইত্যাদির জন্য এই টাকাই যথেষ্ট ছিল। প্রত্যেক মাসে জমা খরচ আমাকে বাবার নিকট পাঠাইতে হইত। কলিকাতায় অসৎ সংসর্গে মিশিয়া অসৎভাবে কোন টাকা আমি খরচ না করিতে পারি এইজন্যই জমাখরচ দেওয়ার কড়াকড়ি ব্যবস্থা বাবা করিয়াছিলেন। বাবা তো জানিতেন না যে পিসিমার কৃপায় আমার হাতে উচ্ছৃঙ্খলতা পরিতৃপ্তির জন্য যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত ছিল।

বাঁচিয়া থাকিতে আমার উচ্ছৃঙ্খলতার ইন্ধন তিনিই যোগাইতেন, মৃত্যুর সময় কতকগুলি টাকা আমার ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল যুবকের হাতে দিয়া ভবিষ্যৎ অধঃপতনের পথ তিনিই প্রসারিত করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতার ন্যায় স্থানে অভিভাবকশূন্য চরিত্রহীন আমার হস্তে ওই অর্থের কী প্রকার সদ্ব্যবহার হইয়াছিল তাহাই ক্রমে বলিব।

আমার সঙ্গে একই কক্ষে যে মেডিকেল স্কুলের ছেলেটি ছিল তাহার নাম বিনোদ। তাহার বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে। অল্পদিনের মধ্যেই তাহার সঙ্গে আমার বিশেষ ভাব হইয়া গেল। বিনোদের সঙ্গে আমার রুচির বেশ খাপ খাইত। তাহার পিতা ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। নানাপ্রকার ছুতা করিয়া সে তাহার পিতার নিকট হইতে প্রতিমাসে ন্যায্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক টাকা আদায় করিত। জামা জুতা এসেন্স ল্যাবেণ্ডার ইত্যাদিতে তাহার যথেষ্ট ব্যয় হইত। প্রসাধনের নিত্য নূতন সামগ্রী তাহার টেবিলে আমদানি হইত। আমিও

বাবুগিরিতে তাহা অপেক্ষা কম ছিলাম না। মেসের অপরাপর ছেলেরা ঠাট্টা করিয়া আমাদের নাম দিয়াছিল—"মানিকজোড়"।

একদিন বিনোদ কি কাজের জন্য বাহিরে গিয়াছে, আমি আমার বিছনায় শুইয়া আছি। সেদিন ভয়ানক গরম। বিনোদের বিছানাটা যে দিকে ছিল, সেই দিকে একটু হাওয়া পাওয়া যাইবে মনে করিয়া আমি বিনোদের বিছানায় যাইয়া শুইলাম। বিছানায় শুইয়া পাশ ফিরিতেই পিঠে একটা শক্ত কী যেন লাগিল। বিছানার চাদর উঠাইয়া দেখিলাম, প্রকাণ্ড একটি কাগজের লেফাফার মধ্যে একখানা পিচ-বোর্ডের মতন কী যেন রহিয়াছে। বাহির করিয়া দেখি একখানা ফটোগ্রাফ। ফটোগ্রাফটি একটি যুবতী রমণীর। ব্রাহ্মিকাগণের ন্যায় কাপড় পরা, পায়ে লেডিজ সু ; একটি টেবিলের উপর কনুইতে ভর দিয়া দাঁড়ান। ফটোখানার পশ্চাৎ দিকে লেখা আছে—

"Forget me not"
From—A to B

অর্থাৎ "আমাকে ভুলিও না"—'এ' কর্তৃক 'বি'-কে প্রদত্ত লইল। "বি" যে আমাদের বিনোদ তাহা বুঝিতে পারিলাম কিন্তু "এ"টি কে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। না বুঝিলেও তিনিই যে এই ছায়াচিত্রের কায়া (original) তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। বিনোদের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক অনুমান করিয়া লইতেও বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। ফটোগ্রাফখানি আমার টেবিলের দেরাজে চাবি বন্ধ করিয়া রাখিয়া আমি আমার নিজের বিছানায় আসিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পর বিনোদ ফিরিয়া আসিল। আমি আমার বিছানায় শুইয়া আছি, তখন দেখি বিনোদ তাহার বিছানা উলটাইয়া, টেবিলের দেরাজ বাক্স খুলিয়া কাপড়-চোপড় মেজেয় ছড়াইয়া কী যেন খুঁজিতেছে। আমার অবশ্য বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না, কিন্তু আমি ঘুমের ভাণ করিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পর বিনোদ বিছানায় বসিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া আমি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। বিনোদ এক লাফে আমার বিছানার উপর আসিয়া আমাকে ভীষণ একটা ঝাঁকুনি দিয়া বলিল,—"রাস্‌কেল—কোথায় রেখেছিস্ বল্!" আমি বলিলাম—"কী কোথায় রেখেছি?" বিনোদ দুমদাম করিয়া আমাকে কয়েকটি কিল বসাইয়া দিয়া বলিল—"আর ন্যাকামি কত্তে হবে না, ফটোখানা দে!"

আমি বলিলাম—'অত সহজে হচ্ছে না বাছাধন। ব্যাপারটা কি খুলে বল, তারপর কিছু খরচ কর, তা'হলে না হয় খুঁজে দেখা যাবে।"

বিনোদকে আরও কিছু ঠাট্টা তামাসা করিয়া ফটোখানা বাহির করিয়া দিলাম। বিনোদের নিকট জানিতে পারিলাম, রমণীটির নাম অনিলা, তাহাদের হাসপাতালের একজন (Nurse) শুশ্রূষাকারিণী। মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদের হাসপাতালের ডিউটি খাটিতে হয় ; রাত্রিতে ডিউটি খাটিবার সময় কয়েকমাস পূর্বে অনিলার সঙ্গে তাহার আলাপ হয়। আলাপ ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। অনিলা একজন দেশিয় খ্রীস্টানের কন্যা। তাহার

পিতা নাই। মাতা ও একটি ছোট ভ্রাতা বর্তমান। অনিলার এবং তাহার মাতার উপার্জন দ্বারা কোন প্রকারে সংসার প্রতিপালিত হয়। তাহার মাতা একটি খ্রীস্টান বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়ত্রীর কার্য করেন। বিনোদ নানাপ্রকারে সেই সংসারে এখন সাহায্য করিতেছে। অনিলার মাতা ব্যাপার যে না বুঝিতে পারিয়াছেন তাহা নহে ; কিন্তু তিনি ইহাতে আপত্তি করেন না। বিনোদ সেই বাড়িতে গেলে তাহাকে চা প্রভৃতি দ্বারা আদর অভ্যর্থনা করিয়া অনিলার ভাইটিকে সঙ্গে করিয়া তিনি কোন ছুতা করিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যান।

এই সব কথা জেরা করিয়া আমি বিনোদের নিকট হইতে জানিতে পারিলাম। বিনোদ একেবারে মাতিয়া গিয়াছে। সে অনিলাকে বিবাহ করিবে ইহাই তাহার সংকল্প, কিন্তু কেবল পিতার ভয়ে পারিতেছে না। ডাক্তারি পাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সে অনিলাকে বিবাহ করিবে ইহাই তাহার ইচ্ছা।

আমি বলিলাম—"বাপ যে তা'হলে ত্যাজ্য পুত্তুর কর্‌বে—"সে বলিল "তখন নিজে রোজগার করেই চালাতে পারব, না হয় ভিক্ষে করে সংসার চালাব, তবু আমি অনিলাকে ছাড়তে পারব না।"

সেদিন এ পর্যন্তই শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার দুই তিন মাস পরেই বিনোদ ও অনিলার প্রেমনাটকের যবনিকা পতন হইয়াছিল। সেই কাহিনি বিস্তারিত বলিতে গেলে পুথি বাড়িয়া যায় ; মোট কথা বিনোদের ক্লাসের আরও দু'টি ছাত্রের সঙ্গে অনিলার ঠিক ওই প্রকার সম্বন্ধ বিনোদের নিকট ধরা পড়িয়া যায়। সে বুঝিতে পারে যে অনিলার মাতা অনিলার বিভিন্ন বন্ধু দ্বারা অর্থোপার্জনের বেশ একটা পন্থা আবিষ্কার করিয়া লইয়াছেন। বেচারা বিনোদ যেদিন এই ঘটনা জানিতে পারিয়াছিল, সেদিন তাহাকে ঠাণ্ডা করিতে আমাকে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল। আমি বিনোদ অপেক্ষা বয়সে ছোট হইলেও, তাহা অপেক্ষা এই সব ব্যাপারে একটু বেশি অভিজ্ঞ বলিয়াই নিজেকে তখন মনে করিয়াছিলাম। তাহার হা-হুতাশ এবং আক্ষেপোক্তিকে হাস্যজনক মনে করিয়া তাহাকে স্পষ্টই বলিলাম যে—"ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দাও যে তুমি রক্ষা পেয়েছ, তাকে তোমার বে করতে হয় নি। পয়সা যখন আছে—আবার খরচ কর, অমন ঢের মিলবে, সেইতো ভাল। একটা নিয়ে থাকার চেয়ে নূতন নূতন যদি মেলে সেইটেই কি ভাল নয়!"

তখন বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু এখন চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে বিনোদ যে চোখে ব্যাপারটি দেখিয়াছিল আমি সে চোখে ব্যাপারটি দেখিতে পারি নাই। আসঙ্গ লিপ্সাই পুরুষকে নারীর দিকে টানিয়া লইয়া যায় একথা সত্য। রমলার প্রতি আমার আকর্ষণ, যাহা পূর্বে বলিয়াছি, তাহাও সেই আসঙ্গ লিপ্সা সঞ্জাত, আর অনিলার প্রতি বিনোদের যে আকর্ষণ তাহাও সেই আসঙ্গ লিপ্সারই ফল। পরিণামে আমার ও বিনোদের উভয়েরই পতন হইয়াছিল। কিন্তু পতন হইলেও আজ আমার মনে হইতেছে, এই দুই পতনের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। আমি বিনোদ হইতে বেশি পতিত। আমি রমলাকে পাইবার জন্য লালায়িত হইয়াছিলাম দৈহিক লালসার উত্তেজনায়, তাহাই আমার কাম্য ছিল এবং সেই

কামনা পুরণের জন্যই আমার সমস্ত চেষ্টা নিয়োজিত হইয়াছিল। আমার নিকট রমলা পাপ দমনের একটি পাত্র ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। রমলার ব্যক্তিত্ব আমাকে আকর্ষণ করে নাই, করিয়াছিল তাহার নারীত্ব। কিন্তু বিনোদ অনিলাকে প্রকৃত ভালবাসিয়াছিল, পত্নীর গৌরবময় আসনে অনিলাকে বসাইবে, ইহাই তাহার কাম্য ছিল। অনিলার ব্যক্তিত্ব ও নারীত্ব উভয়ই তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছিল। ক্ষণিকের মোহেই হউক অথবা অনিলার প্ররোচনাতেই হউক, যদিও বিবাহের পূর্বেই বাসনা চরিতার্থ করিবার সুযোগ তাহাদের ঘটিয়াছিল তথাপি তাহাই তাহার একমাত্র কাম্য ছিল না। অনিলার বিশ্বাসঘাতকতাই তাহার প্রাণে অত বেশি আঘাত দিয়াছিল। সেইজন্যই বলিতেছিলাম, যদিও আমরা দুজনেই পাপী তথাপি আমার তুলনায় বিনোদের চরিত্র অনেক উন্নত ছিল, একথা আমি আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি। বিনোদের পরবর্তী জীবন যেটুকু আমার সঙ্গে কাটিয়াছিল, তাহাও আমার এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করে। কারণ, তাহাকে অন্য নারীব প্রতি আসক্ত করিতে পারি নাই, যদিও তার সুযোগ আমি অনেকবার দিয়াছিলাম। ইহাই ছিল বিনোদের বিশেষত্ব।

এখন আমার নিজের কথা আরম্ভ করিতে হইতেছে। আমার কলেজ জীবনে আমি অনেক কলেজ বদলাইয়াছি। স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে আমি বি-এ পাশ করি। কিন্তু তাহার পূর্বে বিদ্যাসাগর, সিটি, রিপন প্রত্যেক কলেজেই আমি পড়িয়াছি। এই কলেজ পরিবর্তনের কারণ এক এক সময় এক একটি ঘটিয়াছিল। সে সমুদয় কারণ বলিতে যাইয়া সময় নষ্ট করিতে চাই না। কলেজে আমি নিয়মিত ভাবেই যাইতাম, পড়াশুনাও করিতাম, কিন্তু শনি ও রবিবারে থিয়েটার দেখা আমার একরকম বাঁধা ছিল। স্বর্গীয় অমর দত্ত মহাশয় তখন থিয়েটারের পাণ্ডা ছিলেন। নাচগান হর্‌রা তখন খুব বেশি ছিল।

বাল্যকাল হইতেই আমার কণ্ঠস্বর খুব মধুর ছিল কিন্তু রীতিমত গান শিখিবার সুযোগ তখনও হয় নাই, কেবল স্বদেশি গান গাহিয়া বেড়াইতাম। কলিকাতা আসিয়া গান আরম্ভ করিলাম এবং অল্প দিনেই সুগায়ক বলিয়া আমার একটা খ্যাতি জন্মিল।

তখন এখনকার মত অলিতে গলিতে রেস্টুরেন্ট (Resturant) হয় নাই। দু'টি চারিটি হইয়াছিল। সেই সকল রেস্টুরেণ্টে হিন্দুর নিষিদ্ধ পক্ষীর মাংসে ক্রমে ক্রমে আমরা অভ্যস্থ হইয়া উঠিয়াছিলাম। একথা বলাই বাহুল্য যে, সমপাঠীদের মধ্যে আমার এমন কতকগুলি বন্ধু জুটিয়াছিল, যাহাদের প্ররোচনাতেই আমি এই সকল ব্যাপারে অভ্যস্থ হইতেছিলাম।

আমাদের আর একটি কার্য ছিল, রবিবারে কোন ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া। উপাসনা করিতে অথবা ধর্মভাব প্রণোদিত হইয়া নয়, ব্রাহ্ম মহিলাদিগকে দেখিতে—এবং পরে নিজেদের মধ্যে তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কুৎসিত প্রবৃত্তির উত্তেজনার পক্ষে সাহায্য করিতে।

পূর্বে বলিয়াছি বেশ্যাদের প্রতি আমার একটা ঘৃণা ছিল, কিন্তু কলিকাতায় থিয়েটার

দেখিবার পর হইতে সেই ঘৃণার ভাব আমার ক্রমশ হ্রাস হইতে লাগিল। রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের উজ্জ্বল আলোক, তাহাদের সুন্দর সুবেশ মূর্তি ও তাহাদের হাবভাবময় অভিনয় দেখিয়া আমার মনে হইত যেন তাহারা অন্য জগতের মানুষ। আমি আমার একজন কলিকাতার অধিবাসী বন্ধুর সাহায্যে থিয়েটারের কয়েকজন অভিনেতার সহিত পরিচয়ের সুযোগ করিয়া লইলাম। তাহাদের খাতিরে থিয়েটারের গ্রীন-রুম্ অর্থাৎ সজ্জাগৃহে প্রবেশের অধিকার প্রাপ্ত হইলাম। আমি একজন খুব ধনী লোকের পুত্র বলিয়া বন্ধুটি আমার পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন, সুতরাং অভিনেত্রী এবং নর্তকীদের সঙ্গে পরিচিত হইতেও আমার বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। নামজাদা অভিনেত্রী তখন যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই কোন বড় অভিনেতার, অথবা ম্যানেজারের অথবা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের মধ্যে কাহারও না কাহারও বাঁধা ছিলেন। তাঁহাদের দিকে নজর দেওয়া বড় সহজ ছিল না। ছোট খাটো অভিনেত্রী অথবা নর্তকী দলে (Dancing batch) দুই চার জনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হওয়ার সুযোগ আমার ঘটিয়া উঠিল। ক্রমে তাহাদের কাহারও গৃহে রাত্রিযাপন করিতে লাগিলাম। অবশ্য ইহাতে টাকা খরচও হইতে লাগিল—আমার বরাদ্দ মাসিক টাকা হইতে এই সমস্ত ব্যয় নির্বাহ হওয়া সম্ভব ছিল না। ডাক্তারের ভিজিট, ঔষধের দাম, দুধের দাম, কলেজের চাঁদা ইত্যাদি নানা প্রকার মিথ্যা অজুহাতে বাবার নিকট হইতে প্রতি মাসে কিছু বেশি টাকা আনিতে লাগিলাম। পিসিমার প্রদত্ত টাকাটা স্থায়ী হেডে ব্যাঙ্কে রাখিয়া দিয়াছিলাম, তাহা উঠাইবার উপায় ছিল না। কিন্তু তাহার সুদ বাৎসরিক প্রায় পৌনে তিনশত টাকা এবং বাবার নিকট হইতে জুয়াচুরি করিয়া যে টাকা অতিরিক্ত লইয়া আসিতাম তদ্দারাই এই সকল খরচ চলিত।

এই সময়ই বিনোদকে আমার দলে ভিড়াইতে কয়েকজন অভিনেত্রীর দ্বারা চেষ্টা করি। সে আমাদের সঙ্গে যাইত কিন্তু বহু প্রলোভনেও তাহাকে কোন অন্যায় কার্যে প্রণোদিত করিতে পারি নাই, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি।

কিছুদিন পরে অভিনেত্রীর সংসর্গ আমার বিশেষ ভাল লাগিত না ; অথচ প্রবৃত্তির তাড়নায় স্থিরও থাকিতে পরিতাম না। এই সময় একদিন আমি ও আমার একজন সহপাঠী ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার পর ফিরিতেছি, এমন সময় আমাদের কলেজের একটি প্রফেসারের সঙ্গে দেখা হইল। তিনি ব্রাহ্ম, উপাসনা করিয়া ফিরিতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে একটি সুন্দরী মেয়ে দেখিলাম। পরে জানিয়াছিলাম সেটি তাঁহার কন্যা। কন্যাটির বয়স পনের কি ষোল হইবে। আমি তাঁহাকে দেখিয়া নমস্কার করিতেই তিনি প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন—

"কে ও রমেশ যে—তুমি এখানে কি মনে করে?"—

আমি বলিলাম—"আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর উপদেশ শুন্‌তে এসেছিলাম স্যার।"

তিনি বলিলেন—"বটে কেমন শুন্‌লে।"

বাস্তবিক পক্ষে সেদিন শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশ আমি খুব মনোযোগ দিয়াই শুনিয়াছিলাম। বেদী হইতে সেই দেবচরিত্র বৃদ্ধ সেদিন এমনই সুন্দর প্রাণস্পর্শী ভাষায়

বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে আমার ন্যায় লম্পট মাতাল, কুপ্রবৃত্তি লইয়াই যাহারা তথায় যায়, তাহারাও তৎকালের জন্য আকৃষ্ট না হইয়া পারে নাই। সুতরাং আমি খুব উৎসাহের সহিতই উত্তর দিলাম—"খুব চমৎকার স্যার।"

অধ্যাপক মহাশয় আমার উৎসাহ দেখিয়া হাসিলেন। অধ্যাপকটির বিশেষত্ব এই ছিল যে তিনি ক্লাসের প্রায় ছেলেকেই চিনিতেন এবং নাম ধরিয়া ডাকিতেন। তাঁহার নিকট কোন ছেলের ফাঁকি দেওয়ার উপায় ছিল না।

প্রত্যেক কথাতেই নানারকম জেরা করা তাঁহার অভ্যাস ছিল। ক্লাসে পড়াইতে পড়াইতে তিনি অনেক সময় বলিতেন— "You understand," (বুঝতে পাচ্ছ?) যদি কেহ কিছু না বলিত, তাহা হইলে কোন বিপদ ছিল না—তিনি আপন মনে পড়াইয়া যাইতেন এবং মাঝে মাঝে "You understand" (অর্থাৎ বুঝতে পাচ্ছ?) বলিয়া যাইতেন। কিন্তু যদি কোন হতভাগ্য ওই প্রকার "You understand"এর উত্তরে "Yes sir" (হ্যাঁ বুঝতে পাচ্ছি) বলিত, তাহা হইলে রক্ষা থাকিত না। তাহাকে তখনই দাঁড়াইতে হইত এবং কী বুঝিতে পারিয়াছে তাহা বুঝাইয়া বলিতে হইত। যদি বলিতে পারিত তাহা হইলে কোন কথা ছিল না, কিন্তু যদি না বলিতে পারিত তাহা হইলে তাহার তীব্র বিদ্রূপে তাহাকে অস্থির হইতে হইত। তিনি একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিতেন— "I understand that you understand—nothing (অর্থাৎ "অমি বুঝতে পাচ্ছি যে তুমি কিছুই বুঝতে পার নাই)। ক্লাসের বাহিরেও যে ছাত্র দেখিলেই অধ্যাপক মহাশয়ের সেই জেরা করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিবে ইহা আমার ধারণা ছিল না ; তাহা থাকিলে হয়তো প্রথমেই পাশ কাটাইয়া যাইতাম। সুতরাং যখন অধ্যাপক মহাশয় পুনরায় জেরা করিলেন—"কোন্ কথাগুলি চমৎকার লাগল?"—তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে এই প্রশ্ন ক্লাসের সেই "What do you understand" (কি বুঝতে পারলে?") প্রশ্নেরই রূপান্তর মাত্র। সৌভাগ্যক্রমে বক্তৃতাটি মনোযোগ দিয়া শুনিয়াছিলাম এবং বেশ মনে ছিল, তাই কেবল জব্দ হইলাম না। যে কথাগুলি বেশ ভাল লাগিয়াছিল সেইগুলি গুছাইয়া বলিলাম। অধ্যাপক মহাশয়ের ভাবে বুঝিলাম, তিনি বেশ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কথা বলিতে বলিতে আমরা সমাজগৃহ ছাড়িয়া ফুটপাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, অধ্যাপক মহাশয় আমার স্কন্ধদেশে হস্তার্পণ করিয়া সস্নেহে বলিলেন—"বেশ, বেশ, এ সব কথাগুলি যে তুমি মনোযোগ দিয়ে শুনেছ এতে আমি খুব খুশি হলাম। আচ্ছা আমরা তবে যাই। এস লীলা", বলিয়া কন্যাকে লইয়া গাড়িতে উঠিলেন। কন্যাও এতক্ষণ একপাশে দাঁড়াইয়া তাহার পিতার প্রশ্ন এবং আমার উত্তর শুনিতেছিল, কোন কথাই বলে নাই। পিতার ডাকে যাইয়া গাড়িতে উঠিল, আমি কপাল মুষ্টি ঠেকাইয়া অধ্যাপককে স্যালিউট এবং লীলাকে একটা নমস্কার করিলাম। লীলাও তাহার ছোট হাত দুটি জোড় করিয়া একটি প্রতিনমস্কার করিল।

আমরা মেসে ফিরিয়া আসিলাম। আমার এই সহপাঠী ও আমি মেসে একই কক্ষে বাস

করিতাম। বিনোদ সে সময় পাশ করিয়া চলিয়া গিয়াছে! আমার এই সহপাঠী বর্ধমান জেলার একটি জমিদারের ছেলে। তাঁহার পিতা ছিলেন না। বিধবা মাতাই একমাত্র অভিভাবিকা ছিলেন। মাতার নিকট হইতে ইচ্ছামত অর্থ সে প্রতি মাসে আনিত। মেসের প্রত্যেক ছাত্রকেই টাকা পয়সার অভাব হইলে সে টাকা ধার দিত কিন্তু টাকার জন্য বিশেষ তাগাদা করিত না। আমিও অনেক সময় তাহার নিকট হইতে টাকা ধার করিতাম। ইহার নাম আমি গুণেন্দ্র বলিয়া উল্লেখ করিব। ইহার চরিত্র আমারই অনুরূপ ছিল। গুণেন্দ্র এবং আমি উভয়েই থিয়েটারের গ্রীনরুমে একত্র প্রবেশলাভ করি এবং অভিনেত্রীদের সহিত পরিচয়, তাহাদের গৃহে রাত্রি যাপন ইত্যাদি কার্যে সে আমার সহকারী ছিল। অবশ্য এই সকল কাজ আমাদের খুব লুকাইয়া করিতে হইত। যেদিন অভিনেত্রীর বাড়িতে রাত্রিযাপন করিতাম সেদিন কোন আত্মীয় বাড়ি নিমন্ত্রণ আছে বলিয়া যাইতাম।

আমি ও গুণেন্দ্র সমাজ হইতে যখন বাসায় ফিরতেছিলাম তখন গুণেন্দ্র নানা কথা বলিতেছিল কিন্তু আমি মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেছিলাম। আমি কেবল লীলার কথাই ভাবিতেছিলাম। তাহার সুন্দর দেহ, টানা টানা দু'টি চোখ, তাহার নমস্কারের সুন্দর ভঙ্গিমা আমার মনের মধ্যে।

গুণেন্দ্র বলিল "কি ভাবছিস বল্‌তো? লীলাময়ীর রূপ!" আমি বলিলাম—"যাঃ—আবোল তাবোল বকিস্‌নে"। গুণেন্দ্র বলিল—"আবোল তাবোল আমি বলছি না তুই আবোল তাবোল ভাবছিস! ঠিক করে বল্ দেখি তুই লীলার কথা ভাবছিলি কিনা।"

আমি শেষটায় তাহার নিকট মনের কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম। অনেক রাত্রি পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে লীলার কথা আলোচনা হইল। গুণেন্দ্র হঠাৎ বলিয়া বসিল—"এতই যখন মজেছিস্ তখন একটা কাজ করে ফেল, প্রফেসারকে প্রাইভেট টিউটার রেখে নে। এক ঘণ্টা করে তাঁর বাসায় যেয়ে পড়ে আসবি। মাসে গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিলেই হবে। রোজ বাসায় গেলে লীলার সঙ্গে দেখা হবে। Try your luck and sce what you can do (ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখ কি করতে পারিস্)।" আমি বলিলাম—"মাসে পঞ্চাশ টাকা আসবে কোথা থেকে, আমি তো তোর মত বড়লোক নই।" সেদিনের মত আর বিশেষ কোন কথা হইল না ; কিন্তু গুণেন্দ্রের শেষ প্রস্তাব (Suggestion) ঘুরিয়া ফিরিয়া আমার মাথায় খেলিতে লাগিল। ইহার দুই চার দিন পর আমি ব্যাঙ্ক হইতে দুইশত সত্তর টাকা সুদ পাইলাম। তখন মনে হইল যে ইহা দ্বারা অন্তত পাঁচ মাস পড়া হইবে। যদি ভাগ্যে থাকে এই পাঁচ মাসেই আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। এই টাকা হাতে পাওয়ার পর এক শনিবার আমি বাড়ি যাইয়া বাবাকে জানাইলাম যে আমার পড়াশুনার সাহায্য করিবার জন্য একজন গৃহশিক্ষক প্রয়োজন। মাসিক পঞ্চাশ টাকার কথা বাবাকে বলিতে সাহসী হইলাম না ; বলিলাম মাসিক পঁচিশ টাকা দিলেই অধ্যাপকের বাড়িতে গিয়া পড়াশুনা বুঝিয়া আসিতে পারিব। বাবা মাসিক পঁচিশ টাকা করিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। আমি তাহার পরদিনই অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট গুণেন্দ্রকে পাঠাইয়া তাঁহার নিকট প্রাইভেট পড়িবার

প্রস্তাব করিলাম। তিনি স্বীকৃত হইলেন। মাসিক পঞ্চাশ টাকা দিতে হইবে। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর এক ঘণ্টা আমি তাঁহার বাড়িতে যাইয়া পড়িব স্থির হইল।

প্রথম যে দিন পুথি ও খাতা বগলে পড়িতে বাহির হইলাম সে দিন গুণেন্দ্র আমাকে খুব একচোট ঠাট্টা করিল। ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া অনুচ্চস্বরে বারকতক হুলুধ্বনি করিল, তারপর "I wish you good luck" (তোমার শুভ কামনা করি) বলিয়া আমায় বিদায় দিল।

আমি যখন অধ্যাপকের বাড়িতে পৌঁছিলাম তখন মাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। নীচের ঘরে একখানি টেবিল ও তাহার চারিদিকে কয়েকখানি চেয়ার এবং একপাশে দু'টি আলমারি ছিল। আমি সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া একটি ছোট ছেলেকে দেখিতে পাইলাম। ছেলের মুখখানি লীলার মতই। আমার মনে হইল সে লীলারই ভাই। পরিচয় লইয়া জানিলাম তাহাই বটে। তাহার দ্বারা উপরে খবর পাঠাইয়া দিতেই আমার উপরে যাইতে ডাক আসিল। আমি উপরে গেলাম। যে ঘরটিতে অধ্যাপক মহাশয় ছিলেন সেটি নীচের ঘর হইতে বড়। ঘরের মেজেয় একখানা কারপেট, কয়েকটা সোফা, এক কোনে একটি অরগ্যান, মাঝখানে মান্দ্রাজের তৈয়ারি কালো কাঠের একটি বড় টিপয়, এক দিকে সারি সারি দেরাজওয়ালা একটি হাফ-আলমারি, তাহার উপর কতকগুলি পুতুল সাজান ; ইহাই ঘরখানার আসবাব। দেওয়ালে রামমোহন রায়, কেশব সেন প্রভৃতি কয়েকজন বিখ্যাত লোকের ছবি, প্রত্যেকটি দরজা ও জানালায় পর্দা।

ঘরখানায় বেশি আসবাব পত্র নাই, কিন্তু এই সামান্য কয়েকটি জিনিসই এমন সুন্দরভাবে সজ্জিত যে তাহা দেখিলেই গৃহস্বামীর মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। ঘরে অধ্যাপক মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী বসিয়াছিলেন। লীলা অধ্যাপকের সম্মুখে একটি মিউজিক টুলে বসিয়াছিল। আমাকে দেখিয়া অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন—"এই যে—রমেশ এসেছ—বসো—তাহার পর স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এই রমেশ, এর কথাই তোমাকে কাল বলেছি"—আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"ইনি আমার স্ত্রী"। আমি অধ্যাপকপত্নীর পায় হাত দিয়া প্রণাম করিলাম,—তিনি সস্নেহে আমার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—"থাক থাক। বসো বাবা বসো।" অধ্যাপক মহাশয় আমাকে প্রণাম করিতে দেখিয়া হাসিয়া স্ত্রীকে লক্ষ করিয়া বলিলেন—"তোমাদের বরাতই ভাল, এতদিন ধরে পড়াচ্ছি, ছাত্রের কাছে কোনদিন প্রণাম পাই নি, মাথার সঙ্গে মুষ্ঠি ঠেকিয়েই খালাস, মুষ্ঠি ঠেকিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুলও অনেকে দেখায়, আর তুমি প্রথম দিনই একেবারে প্রণাম পেয়ে গেলে।"

অধ্যাপক মহাশয়ের কথা শুনিয়া আমরা সকলেই হাসিয়া উঠিলাম, অধ্যাপক মহাশয় তারপর লীলাকে বলিলেন "লীলা—তোমার সঙ্গে রমেশের পরিচয় করে দিই।" লীলা আমাকে একটি নমস্কার করিয়া বলিল—"সেদিন সমাজ থেকে আসতে রমেশবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল না বাবা!"

অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ—আমার সে কথা মনেই ছিল না।" আমি লীলাকে প্রতি নমস্কার করিলাম। তারপর অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন—"আজকে প্রথম দিন আর পড়াশুনায় কাজ নেই—তার চেয়ে লীলার একটা গান শোনা যাক—কি বল রমেশ।"

আমি ঘাড় নাড়িয়া আমার সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। লীলা অরগানের ডালা খুলিয়া গান ধরিল—এই দীর্ঘকাল পরও সেদিনের গানের দুই চারিটি 'কলি' আমার মনে আছে—

কুঞ্জবনের ভ্রমর বুঝি
বাঁশির তানে গুঞ্জরে
বকুলগুলি আকুল হয়ে
বাঁশির তানে মুঞ্জরে

লীলার কণ্ঠস্বরের মাধুর্য আমাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল, তাহার দিক হইতে আমি চোখ ফিরাইতে পরিতেছিলাম না। গান শেষ হইলে অজ্ঞাতসারে আমার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল—"চমৎকার"। কথাটি বলিয়া ফেলিয়া আমি যে অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম। অধ্যাপক মহাশয় এবং অধ্যাপক পত্নী একটু হাসিলেন। লীলাও একটু লজ্জিত হইল এবং সুখীও হইল, কারণ আমার প্রশংসা বাক্যের অকপটতা (Sincerity) সে বুঝিতে পারিয়াছিল।

এমন সময় একটি ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম লইয়া একজন ভৃত্য প্রবেশ করিল। অধ্যাপক পত্নী লীলাকে চা করিতে বলিলেন এবং আমার জন্য এক পেয়ালা করিতে বিশেষভাবে বলিলেন। অধ্যাপক মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—"কি রমেশ! চা খাবেতো? শুনেছি তুমি গোঁড়া-হিন্দুর ছেলে, আমার এখানে চা খেলে সমাজ একঘরে করবে না তো?" আমি একটু হাসিয়া মাথা নত করিয়া বলিলাম "আমার কোন গোঁড়ামি নেই স্যর্। চা কেন মা যদি ভাত খেতে দেন তাও খেতে আমার আপত্তি নেই।"

অধ্যাপক মহাশয় খুশি হইলেন—বলিলেন—"বেশ! বেশ! এই তো চাই। তোমরাই দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা। তোমরা যদি সংকীর্ণতার গন্ডিতে নিজেকে বেঁধে রাখবে তা হলে দেশটা জাগবে কি করে? চায়ের সঙ্গে কয়েকখানা করিয়া স্যাণ্ডউইচ এবং একখানা করিয়া কেক ছিল। আমরা সকলেই তাহার সদ্ব্যবহার করিলাম। তাহার পর লীলা একটা গান করিল। গান শেষ হওয়ার পর লীলা তাহার মাকে বলিল—"রমেশ বাবু নিশ্চয়ই গান গাইতে জানেন। ওকে একখানা গান গাহিতে বল না।"

অধ্যাপক পত্নী সহাস্যমুখে আমাকে বলিলেন—"লীলা কি বলছে শুন্‌ছো রমেশ? তুমি গাইতে জান নাকি? জান তো একটা গান শোনাও আমাদের।"

আমি আমতা আমতা করিতে লাগিলাম। গান গাইতে জানি না—এমন জলজ্যান্তো মিথ্যা কথা বলিতেও বাধ বাধ বোধ হইল, অথচ অধ্যাপক মহাশয়ের সম্মুখে গান

গাহিতে জানি বলিতেও কেমন একটা লজ্জার ভাব আসিয়া পড়িল। আমার এই ইতস্তত ভাব দেখিয়া অধ্যাপক পত্নী হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিলেন—"রমেশ নিশ্চয়ই গাইতে জানে। তুমি তার মাস্টার মশায়, তোমার সামনে সে কথাটা স্বীকার কর্তে চাচ্ছে না।"

অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন—"লগুড় হাতে গুরুমহাশয়ের ভয় আজকাল আর নেই। আমরা ছাত্রকে বন্ধু বলে মনে করি এবং তারাও আমাদের বন্ধু বলে মনে করবে—আমরাও তাই চাই।"

অধ্যাপক পত্নী বলিলেন—"তবে আর কি রমেশ! এইতো হুকুম পেলে, এখন গাও"—

লীলাও বলিল—"একটা গান না রমেশ বাবু!"

আমি বলিলাম—"আমি তেমন ভাল গাইতে জানি না—তারপর আপনার এই সুন্দর গানের পর—" বলিতে বলিতেই লীলা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"আমরা মনে করে নেব অপরিচিত স্থানে গান গাইবার পূর্বে যেটুকু ভদ্রতা করা প্রয়োজন, আপনি তা করেছেন। এখন উঠুনতো—একটা গান।"

অধ্যাপক মহাশয় ও তাঁহার পত্নী খুব হাসিয়া উঠিলেন। আমিও সেই হাসিতে যোগ দিলাম। তারপর উঠিয়া অরগ্যানের কাছে যাইয়া বসিলাম ও একটা হিন্দি গান গাহিয়াছিলাম। লীলার কণ্ঠস্বর মধুর হইলেও উচ্চ সংগীতে তাহার শিক্ষা ছিল না। আমি ওস্তাদের নিকট রীতিমত বিশুদ্ধ লয়ে সংগীত শিখিয়াছিলাম। লীলার চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য সেদিন আমার সমুদয় প্রাণ ঢালিয়া দিয়া গানটি গাহিয়াছিলাম। সুতরাং আমার গান শেষ হওয়ার পর সকলেই খুব বিস্মিত হইয়াছিলেন। আমাকে গান গাহিতে অনুরোধ করিবার পর সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে সাধারণ স্কুল কলেজের ছেলেরা যেমন গায় আমিও তেমনি গাহিব ; কিন্তু আমি বিশুদ্ধ তান লয়ে এমন সুন্দর ভাবে গান গাহিব ইহা তাঁহারা কেহই আশা করেন নাই। অধ্যাপক মহাশয় প্রথম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন—"তাইতো! তুমি যে অবাক করে দিলে হে রমেশ! তুমি এমন সুন্দর গাইতে পার তাতো মনে করিনি।"

লীলা বলিল—"আমার গান শুনে রমেশবাবু নিশ্চয়ই মনে মনে হাসছিলেন। আগে জানলে ওঁর সামনে গাইতুম না।"

আমি বলিলাম—"আপনি যে সুন্দর গান শুনিয়েছেন তার কথা আমি জীবনে ভুলতে পারব না। এমন মিষ্টি গলার স্বর আমি জীবনে কোন দিন শুনিনি।"

অধ্যাপক পত্নী বলিলেন—"লীলার সুর মিষ্টি হলেও সে গান কিছুই শেখেনি। তুমি তো রীতিমত ওস্তাদ দেখছি।"

আমি বলিলাম—"না না—আমি এখনও ওস্তাদ হইনি, তবে গান শিখতে চেষ্টা কচ্ছি মাত্র।"

অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন—"থাক তর্ক করে সময় নষ্ট করে কাজ নেই, তার চেয়ে রমেশ আর একটা গান গাও।"

আমি আরও একটা গান গাহিলাম। তারপর বহু সাধ্যসাধনা করিয়া লীলার আর একটা গান শুনিলাম। ইহার পর সেদিনের মত বিদায় লইয়া আসিলাম।

বাসায় আসিয়া গুণেন্দ্রকে সব কথা খুলিয়া বলিলাম। গুণেন্দ্র আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—"বহুৎ আচ্ছা বাবা, একদিনেই অনেক এগিয়েছ দেখছি।"

পরদিন হইতে আমি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট পড়িতে যাইতে আরম্ভ করিলাম। কোন কোন দিন লীলার সহিত দেখা হইত, কোন দিন বা হইত না। শনিবার রাত্রিতে অধ্যাপক মহাশয় পড়াইতেন না। সেদিন উপরের ড্রয়িং রুমে গান ও গল্পের মজলিস বসিত। আমাকে গান গাহিতে হইত, লীলাও গাহিত। লীলার বন্ধু ও আর দুচারটি প্রগতিপ্রাপ্তা মহিলা মাঝে মাঝে আসিতেন, তাহারাও গান গাহিতেন। তাহারাও কুমারী এবং দেখিতে সুন্দরী। আমি তাহাদের সকলের সঙ্গেই পরিচিত হইলাম। আমার সুকণ্ঠ এবং সংগীত শাস্ত্রে অভিজ্ঞতাই আমাকে এইভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ দিয়াছিল সন্দেহ নাই। অধ্যাপক মহাশয়ের পরিচিত দুই চারিটি যুবক ও প্রৌঢ় ব্যক্তিও শনিবারের মজলিসে অনেক সময় যোগ দিতেন। শনিবারের রাত্রিটা খুব আমোদেই কাটিত। ব্রাহ্ম পরিবারে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা আমার জীবনে ইহাই প্রথম। স্ত্রীজাতির সঙ্গে আমার মেলামেশার অভিজ্ঞতা—একদিকে গ্রামের অশিক্ষিতা বা সামান্য শিক্ষিতা এবং প্রাচীন আওতার কোণে বর্ধিতা মা খুড়ি জেঠি বৌদিদি ভগ্নী ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রভৃতি কুলললনাগণের মধ্যে, অপরদিকে কুলত্যাগিনী সকল সমাজের বাহিরে অবস্থিতা অভিনেত্রীগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং ইহাদের সহিত আলাপ করিতে আমার প্রথম প্রথম খুবই বাধ বাধ বোধ হইত। অপরাপর আলোকপ্রাপ্ত যুবকেরা যেমন নিঃসংকোচে কথা বলিত,—আমি প্রথম প্রথম তেমন পারিতাম না। সর্বদাই মনে হইত, হয়ত এমন কিছু বলিয়া ফেলিব, অথবা এমন কোন ব্যবহার করিয়া বসিব যাহাতে ইহারা আমাকে একেবারে অসভ্য মনে করিবে। লীলা আমার এই সংকোচের ভাব বুঝিতে পারিত এবং বেশ একটু আমোদ অনুভব করিত।

এই ভাবে প্রায় মাসখানেক অতীত হইবার পর একদিন অধ্যাপক পত্নী আমাকে বলিলেন—"রমেশ, তোমার পড়াশুনার যদি বিশেষ ক্ষতি না হয় তা হলে তুমি লীলাকে একটু গান শেখালে আমরা খুব খুশি হব।"

আমি উৎসাহের সঙ্গে সেই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলাম এবং বলিলাম যে অধ্যাপক মহাশয় যদি মত করেন তা হলে আমার কোনো আপত্তি নাই। অধ্যাপক মহাশয় কোন আপত্তি করিলেন না। আমি লীলাকে গান শিখাইতে আরম্ভ করিলাম। সন্ধ্যার সময় ঘণ্টাখানেক নিজের পড়া বুঝিয়া লইতাম, তারপর ড্রয়িং রুমে এক ঘণ্টা লীলাকে গান শিখাইতাম। লীলাকে গান শিখাইতে আমার বেশি বেগ পাইতে হয় নাই। যে কোন কঠিন সুর আয়ত্ত

করিবার ক্ষমতা তাহার বেশই ছিল ; কিন্তু বিপদ হইল "তাল" লইয়া ; সুরকে তালের গণ্ডিতে বাঁধিতে যে সূক্ষ্ম হিসাবের প্রয়োজন হয় তাহা লীলাকে আয়ত্ত করাইতে আমার খুব বেগ পাইতে হইয়াছিল।

এই গান শিখাইবার উপলক্ষে লীলার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। গান শিখাইবার সময় অধ্যাপক মহাশয় ও অধ্যাপকপত্নী প্রথম প্রথম উপস্থিত থাকিতেন, পরে অনেক দিন থাকিতেনও না। ভাল ভাল গানই আমি লীলাকে ক্রমে ক্রমে শিখাইতেছিলাম। এই সময় লীলার অনেক বন্ধু -পরিবারেও সান্ধ্য সম্মিলনে আমার নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল এবং সেই সকল মজলিসেও আমি গান গাহিতে লাগিলাম। অনেক আলোক ও প্রগতিপ্রাপ্তা মহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় হইল। প্রতি রবিবার বৈকালে অধ্যাপক মহাশয়ের সঙ্গে সমাজেও যাইতে আরম্ভ করিলাম। উপাসনার শেষে অধ্যাপক মহাশয়ের সঙ্গে গভীরভাবে সেই দিনের বক্তৃতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতাম। এমন ভাব দেখাইতাম, যেন আমি প্রচলিত হিন্দুধর্মের কুসংস্কারাপন্ন আচার ব্যবহারের প্রতি ক্রমশ বিতৃষ্ণ এবং ব্রাহ্ম সমজের আচার ব্যবহারের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছি। আমি বাছা বাছা ব্রহ্মসংগীতগুলি যত্ন করিয়া গোপনে শিখিতে লাগিলাম এবং কতকগুলি সংগীতে প্রচলিত সুর একটু পরিবর্তন করিয়া তাহাতে একটু নূতন শ্রুতিমধুর ঢং লাগাইয়া গাহিতে লাগিলাম। তাহার ফলে যাঁহারা এ-সব গানে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁহারাও আমার নিকট একটা নূতন কিছু শিখিবার প্রলোভনে আমার সহিত মেলা মেশা করিতে লাগিলেন।

এইভাবে আমার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হইতে লাগিল বটে, কিন্তু আমি যে উদ্দেশ্য লইয়া গিয়াছিলাম সেই উদ্দেশ্যের সফলতার পক্ষে বিশেষ কিছু অগ্রসর হইতে পারিলাম না। লীলার সরল সহজ নিঃসংকোচ ব্যবহারই যেন আমাকে দূরে রাখিতে লাগিল। আমি তাহার মধ্যে এমন কিছু দেখিতে পাইলাম না যাহাতে আমি তাহার নিকট কোন প্রকার অসৎ প্রস্তাব করিতে পারি। অথচ দিন দিন লীলার সান্নিধ্য এবং রূপ আমার বাসনার অনলে ইন্ধন যোগাইয়া আমাকে যেন পাগল করিয়া তুলিল। কেবল লীলা নহে, যে সকল আলোক ও প্রগতিপ্রাপ্তা মহিলার সঙ্গে আমি মিশিতে পারিয়াছিলাম তাহাদের অনেকের সৌন্দর্যই আমার প্রাণে ওই প্রকার লালসার সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে 'বাঁশ বনে ডোম কানা' যাহাকে বলে আমার দশা অনেকটা তাহাই হইয়াছিল।

এই সময় শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় হয়। কেন যেন আমাকে তিনি বিশেষ ভাল চোখে দেখেন নাই। হিতবাদী সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ[১৬] মহাশয়ের লিখিত রুচি-বিকার কবিতা লইয়া ইনি তাঁহার নামে যে মানহানির মোকদ্দমা করিয়াছিলেন তাহা আমি কাগজে পড়িয়াছিলাম, অবশ্য তখন আমি স্কুলে পড়ি। সুতরাং তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সময় মনে মনে বেশ একটু কৌতূহল অনুভব করিয়াছিলাম। হেরম্ববাবু অতিশয় গম্ভীর প্রকৃতির লোক। তাঁহার মুখে হাসি কদাচ দেখিয়াছি মনে হয় না।

হেরম্ববাবু আমাকে বিশেষ পছন্দ করিতেন না এবং আমার অধ্যাপক মহাশয়কে তিনি বলিয়াছিলেন যে তাঁহাদের সমাজের বাহিরের একটি যুবককে এমন ঘনিষ্ঠভাবে সমাজের মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করিতে দেওয়া মঙ্গল হইতেছে না।

যাহা হউক হেরম্ববাবুর আপত্তি টেঁকে নাই। আমি অবাধে সর্বত্র মেলামেশা করিতে লাগিলাম। একথা বলা প্রয়োজন যে, অধ্যাপক মহাশয়কে আমি প্রথম এক মাস পঞ্চাশ টাকা দিয়াছিলাম। তাহার পরের মাসে টাকা দিতে গেলে, তিনি সে টাকা গ্রহণ করেন নাই। আমি লীলাকে গান শিখাইতাম সুতরাং তিনি আমার নিকট কোন টাকা লইতে পারেন না, এই অজুহাতে আমার টাকা ফেরত দিয়াছিলেন।

ইহার মধ্যে একদিন অধ্যাপক মহাশয় আমাকে বলিলেন—"রমেশ, পরশু লীলার জন্মতিথি উৎসব, আমার কয়েকজন আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবকে সেদিন আহ্বান করিব। তুমিও সেদিন রাত্রে এখানে খাবে, আর অভ্যাগতদের cnteratin করতেও (আমোদ দিতে) তোমাকে চাই।"

সাগ্রহে তাঁহার কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। তখনই মনে হইল লীলাকে জন্মতিথি উপলক্ষ্যে একটা কিছু উপহার দিতে হইবে। গুণেন্দ্র বলিল—"নিশ্চয়ই দেওয়া উচিত। মাস মাস পঞ্চাশ টাকা করে যা দেওয়ার কথা ছিল, তা দিলে এত দিনে [য] প্রায় তিনশত টাকা তোকে দিতে হ'তো সে টাকাটা বেঁচে গেছে। একশ দেড়শো টাকা দামের ভেতর একটা সোনার অলঙ্কার কিনে দে।"

তারপর দিন আমি ও গুণেন্দ্র রাধাবাজারের একটি দোকান হইতে একটি সুদৃশ্য নেকলেস খরিদ করিলাম। দাম আমাদের বরাদ্দ টাকায় কুলাইল না, দুই শত পঁচিশ টাকা লাগিল। নেকলেসের যে ভেলভেট মণ্ডিত কেস ছিল, তাহার উপর সোনার একখানা পাত লাগাইয়া তাহার উপর—

To Lila Devi

On Her Seventeenth Birth-day

Wishing many happy returns of the same.

Ramesh

অর্থাৎ—"লীলাদেবীর সপ্তদশ জন্মতিথিতে এই দিবসের বহু পুনরাগমন কামনা করিয়া রমেশ কর্তৃক এই উপহার প্রদত্ত হইল।" এই কয়েকটি কথা খোদাই করিয়া দিলাম।

লীলার জন্মতিথি উৎসবের দিন নেকলেসের বাকসটি লইয়া খুব সকালে আমি অধ্যাপক মহাশয়ের বাড়িতে গেলাম। লীলার ছোট ভাইয়ের হাতে বাকসটা দিয়া, তাহার দিদিকে দিতে বলিয়া চলিয়া আসিলাম। নিজ হাতে লীলাকে দিতে আমার কেমন একটু বাধ বাধ ঠেকিল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আমি যখন অধ্যাপক মহাশয়ের বাসায় গিয়া পৌঁছিয়াছি, তখন তাঁহার নিমন্ত্রিত ও নিমন্ত্রিতাগণ আসিয়া জুটিতেছিলেন। লীলা যে সকল উপহার পাইয়াছে তাহা ড্রয়িং রুমে একটা টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। আমার প্রদত্ত উপহার প্রত্যেকেরই দৃষ্টি ও প্রশংসা আকর্ষণ করিয়াছিল। অত মূল্যবান উপহার কেহই লীলাকে দেয় নাই।

আমি কক্ষে প্রবেশ করিতেই অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন—"রমেশ, তুমি ভারি অন্যায় করেছো, এতগুলো টাকা খরচ করে ওই নেকলেসটা কিনলে কি বলে?"

অধ্যাপক পত্নী বলিলেন—"পাগল? এখনো সংসারে ঢোকেনি কিনা, টাকার দরদও তাই বোঝেনি।"

দু'জনেই মৃদু তিরস্কার করিলেন কিন্তু তাঁহাদের সহাস্য মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হন নাই। তিরস্কারের উত্তরে আমি একটু মৃদু হাসিয়া মাথা নত করিলাম মাত্র। তারপর লীলা যেখানে বসিয়াছিল সেই দিকে অগ্রসর হইলাম।

লীলা ও তাহার একটি বন্ধু, উষাদেবী বলিয়া আমি তাঁহাকে উল্লেখ করিব, একটি সোফায় একত্র বসিয়াছিলেন। আমি যাইয়া দু'জনকে নমস্কার করিতেই —উভয়ে প্রতিনমস্কার করিলেন।

উষাদেবীর বয়স লীলা অপেক্ষা দুই এক বৎসর বেশি হইবে। তিনি বিধবা মাতার একমাত্র কন্যা। পিতা ব্যারিস্টারি করিতেন ; তাঁহাদের পার্কস্ট্রীট অঞ্চলে একখানি বাড়ি ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা পূর্বোক্ত বাড়িখানি ভাড়া দিয়া বাঙালি পল্লীতে অল্প ভাড়ায় একখানা বাড়ি লইয়া বাস করিতেছেন। উষাদেবী সুন্দরী এবং সুরসিকা ছিলেন। লীলা তাহার বয়স হিসাবে একটু অতিরিক্ত গম্ভীর ; কিন্তু উষাদেবীর চাল-চলন, কথাবার্তা সবটাতেই বেশ একটা চপলতা সর্বদাই আত্ম-প্রকাশ করিত। আমার সঙ্গেও উষাদেবীর খুব আলাপ ছিল। যে সকল মহিলা আমার হৃদয়রাজ্যে বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া পূর্বে বলিয়াছি উষাদেবীও তাহার মধ্যে একজন ছিলেন।

আমাকে দেখিয়া উষাদেবী হাসিয়া লীলার পার্শ্ব হইতে উঠিলেন—এবং পাশে আর একখানি চেয়ার টানিয়া বসিয়া লীলার পাশে সোফার খালি জায়গাটা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন "বসুন বসুন রমেশবাবু—আজ ওই Seat of honour (সম্মানের আসনটা) আপনারই প্রাপ্য"—

আমি একটু অপ্রস্তুত হইলাম। লীলারও গণ্ডদেশ আরক্ত হইয়া উঠিল। আমি বলিলাম—"আপনি উঠলেন কেন, আপনিই ওখানে বসুন, আমি এই চেয়ারটায় বসছি।"

উষাদেবী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ওটা হলো মুখের কথা—মনের কথা নয়, কি বলিস লীলা।"

লীলা বলিল—"বসুন না রমেশ বাবু এখানে, ও কি এক জায়গায় পাঁচ মিনিট বসে থাকতে পারে?"

আমি লীলার পার্শ্বেই বসিলাম। উষাদেবী আমার প্রদত্ত নেকলেস উপহার দেখিয়াই যে ওই প্রকার পরিহাস করিয়াছিলেন তাহা আমি ও লীলা উভয়েই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমি কী বলিব স্থির করিতে পারিতেছিলাম না, কিন্তু লীলার কথায় তৎকালীন situation saved হইল, অর্থাৎ সোজা বাংলায় নাক রক্ষা হইল। উষাদেবী দুইচারিটি কথার পর উঠিয়া কক্ষের অপর পার্শ্বে গেলেন, আমি ও লীলা একত্রে রহিলাম ; তখন লীলা বলিল—"রমেশবাবু আপনি এতগুলি টাকা খরচ করে কেন নেকলেসটা কিনলেন বলুন তো?"

আমি বলিলাম—"তুমি কি সেজন্য অসন্তুষ্ট হয়েছ লীলা?" লীলা মাথা হেঁট করিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না। আমি তখন বলিলাম—"আমাকে তোমরা পর মনে কর লীলা? তোমার জন্মদিনে তোমাকে একটা উপহার দেবার অধিকারও কি আমার নেই?"

লীলা বলিল—" না না রমেশবাবু, আমি তা বলিনি, উপহার তো অনেকেই দিয়েছে কিন্তু অত টাকা দামের—"

আমি বলিলাম—"ছাই দামের, তোমার গলায় ওই সাধারণ হার কি মানায় লীলা? ওর দশগুণ দাম দিয়ে যদি একটা কিনে আনতে পারতেম তা হলেও আমার কতকটা তৃপ্তি হতো।"

গাঢ়স্বরে কথা কয়টি বলিতে বলিতে আমি লীলার চোখের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া দেখিলাম, তাহার গাল দুটি লাল হইয়া গিয়াছে। নিকটে কেহ ছিল না। আমি খপ করিয়া তাহার হাত দুটি ধরিয়া বলিলাম—"বল লীলা—তুমি রাগ করনি!"

লীলা চকিতে আমার দিকে একুট চাহিল ; একটু মৃদু হাসিতে তাহার ওষ্ঠাধর রঞ্জিত হইয়া উঠিল ; তারপর বলিল—"না"।

এমন সময় কক্ষে অপর দিক হইতে অধ্যাপক মহাশয় আমার নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন শুনিয়া আমি উঠিয়া গেলাম। তখন অতিথিদের মধ্যে অনেকেই আসিয়াছেন। অধ্যাপক মহাশয় আমাকে গান গাহিতে বলিলেন। আমি অরগ্যানের নিকট গেলাম এবং এই গানটা গাহিলাম—

"তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্তসুদূর, আমার সাধের সাধনা,
মম শূন্য গগন-বিহারী।
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি বরণ, [রচনা]'
তুমি আমারি-যে তুমি আমারি
মম অসীম গহন-বিহারী।"

আমার গান আরম্ভ হইবামাত্র কক্ষের চতুর্দিক হইতে অনেকে অরগ্যানের নিকটে আসিয়া বসিলেন। লীলা এবং উষাও আসিল। গান গাহিতে গাহিতে যখন গানের শেষ 'কলি'—'মম সংগীত তব অঙ্গে অঙ্গে দিয়াছি [দিয়েছি] জড়ায়ে জড়ায়ে, তুমি আমারি-যে

তুমি আমারি, মম জীবনমরণবিহারী'—গাহিতেছিলাম, তখন অন্যের অলক্ষ্যে আমি লীলার দিকে তাকাইলাম, দেখিলাম লীলাও আমার দিকে চাহিয়া আছে। চোখে চোখ পরিতেই লীলা মুখ ফিরাইল। আমিও মুখ নত করিলাম। আমাদের এই জনান্তিক অভিনয় অন্য কাহারও চোখে পড়িল না বলিয়াই আমরা ভাবিয়াছিলাম ; কিন্তু লীলার পার্শ্বে উষার চক্ষু যে আমরা এড়াইতে পারি নাই, তাহা পরে বুঝিয়াছিলাম।

আমার গান শেষ হওয়ার পর উষা গান গাহিল, লীলা এবং অন্য দুই চার জনও গাহিলেন। উষার গান শেষ হওয়ার পর যখন লীলা গান গাহিতেছিল, তখন একদিকে একটি সোফায় গিয়া বসিয়া উষা আমাকে হাতছানি দিয়া ডাকিল। আমি নিকটে যাইয়া একখানা চেয়ার লইয়া বসিলাম। উষা আমার দিকে বক্র কটাক্ষে চাহিয়া একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া আস্তে আস্তে বলিল—"তারপর রমেশ বাবু—কবে propsoe (বিবাহের প্রস্তাব) কচ্ছেন?"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"Proposc ! সে কি?"

উষা একটু হাসিয়া বলিল—"আকাশ থেকে পড়লেন যে? আমরা কিছু বুঝিনে, কেমন? এই যে আড়াইশো টাকা দামের হার উপহার, এই যে "তুমি আমারি" গাইতে গাইতে সপ্রেম দৃষ্টি বিনিময়, এ থেকে কি অনুমান করা যেতে পারে! আর ঢাক্‌লে চলছে না রমেশবাবু!"

আমি একটু অপ্রস্তুত হইয়াছিলাম, কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিলাম—"উষা দেবী! বৈদান্তিকেরা রজ্জুতে সর্পভ্রম বলে একটা কথা ব্যবহার করেন, আপনার ঠিক তাই হয়েছে। লীলাকে হার দেওয়ার মানে আমি তার প্রেমে পড়িনি, তাঁর বাপ আমাকে রোজ পড়ান, কোন বেতন নেন না ; আমি এই জিনিসটা লীলাকে দিয়ে তিনি আমাকে যে obligation-এ রেখেছেন (উপকার করেছেন) তারই সামান্য প্রতিদান দিয়েছি মাত্র।"

উষা এভাবে কথাটাকে চিন্তা করে নাই, সুতরাং আমি যে কারণ দেখাইলাম তাহা সে উড়াইয়া দিতে পারিল না এবং অবিশ্বাস যোগ্যও মনে করিতে পারিল না। কিন্তু সে সহজে ছাড়িবার পাত্র ছিল না, বলিল—"তা যেন হলো কিন্তু "তুমি আমারি তুমি আমারি' অমন প্রাণ ঢেলে দিয়ে গান আর লুকিয়ে লুকিয়ে চাউনি সেটা কোন obligation-এর প্রতিদান"?

আমার মাথায় চট করিয়া একটা দুষ্ট বুদ্ধি গজাইল, আমি গম্ভীর হইয়া বলিলাম—"উষাদেবী সত্যই শুনতে চান আমার মনের কথা?"

উষা বলিল—"যদি অনুগ্রহ করে বলেন—"

আমি বলিলাম—"ত হলে প্রথমত প্রতিশ্রুত হোন, আমি যা বলি তা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, তাহাতে আমার উপর আপনি অসন্তুষ্ট হবেন না ; আর আমাদের মধ্যে এখন যে সরল সহজ বন্ধুভাব আছে আপনি সেটা কেড়ে নেবেন না।"

উষা একটু চমকিত হইল, তারপর বলিল—"না না আমাদের বন্ধুভাব নষ্ট হবে কেন? বলুন না কি বলিতে চান।"

আমি আস্তে আস্তে বলিলাম—"আপনি মনে কচ্ছেন, আমার গান লীলাকে উদ্দেশ্য করে গাওয়া হচ্ছিল, তার কারণ গান গাইতে গাইতে আমি লীলার দিকে তাকিয়েছি। কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে লীলার সঙ্গে একাসনে তার একটি বন্ধুও বসেছিলেন, আমার দৃষ্টিটা লীলার দিকে কি তার বন্ধুটির দিকে ছিল, সেটা বিশেষ লক্ষ্য করে দেখেছিলেন কি?"

উষার সারাটা মুখ লাল হইয়া উঠিল। লীলার সঙ্গে একাসনে সেই বসিয়াছিল, সুতরাং আমার কথার অর্থ বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। লীলার প্রতি আমার অনুরাগ সে যে একটু ঈর্ষার চোখেই দেখিতেছে এবং আমার তরফ হইতে পাওয়া ক্ষীণতম আহ্বানও যে সে উপেক্ষা করিতে পারিবে না, একথা বুঝিয়াছিলাম বলিয়াই সে প্রথমত কোন উত্তর দিল না। মাথা হেঁট করিয়া দাঁত দিয়া ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি কামড়াইতে লাগিল। তাহার বাম হাতখানি এক পাশে পড়িয়াছিল, আমি আস্তে আস্তে তাহা ধরিয়া বলিলাম—'উষা! আমি কি খুব অন্যায় কাজ করেছি? আমার যে স্বপ্ন রবিবাবুর ওই গানখানাতে ভাষা পেয়েছে সে স্বপ্ন কি কোনদিন সফল হবে? সত্যি সত্যি "তুমি আমারি" একথা বলবার অধিকার কি তুমি আমাকে কোন দিন দেবে?"

উষা বলিল—"বড্ড গরম, চলুন রমেশবাবু বারান্দায় যাই"। নিজের সাহসে আমি নিজেই অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। ধীরে ধীরে উষার পিছনে বারান্দায় এক কোনে যাইতেই উষা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"রমেশবাবু আপনি যে বল্লেন, এটা কি সত্যই আপনার মনের কথা, না আমি আপনাকে ঠাট্টা করেছিলুম বলে তার পালটা জবাব দিলেন।"

আমি একটু অভিমানের সুরে বলিলাম—'উষা। আমার বিশ্বাস ছিল মনের কথা আর মুখের কথার ভেতর যে পার্থক্য আছে তুমি সেটা সহজেই বুঝতে পারবে।"

উষা কিছু না বলিয়া মাথা হেঁট করিল, আমি আস্তে আস্তে তাহার কটিদেশ জড়াইয়া ধরিয়া বসিলাম—উষা হাসিয়া আমার বুকে মাথা লুকাইল। আমি তাহার ওষ্ঠাধরে আমার প্রণয়ের চিহ্ন মুদ্রিত করয়া দিলাম, সেও তাহার প্রতিদান দিল।

এমন সময় সংগীতধ্বনি থামিয়া গেল, আমরা উভয়ে দুইদিক দিয়া তাড়াতাড়ি গৃহে প্রবেশ করিলাম। তখন উষাকে গান গাহিবার জন্য কয়েকজন অনুরোধ করিলেন। উষা আরগ্যানে যাইয়া বসিল এবং গান ধরিল—

গানখানির শেষ "কলি" উষা যখন গাহিল—

তোমার প্রণয় যুগে যুগে মোর লাগিয়া
জগতে জগতে ফিরিতেছিল কি জাগিয়া?
একি সত্য?

আমার বরণে, নয়নে অধরে অলকে
চিরজনমের বিরাম লভিলে পলকে—
একি সত্য?
মোর সুকুমার ললাট ফলকে লেখা অসীমের তত্ত্ব
হে আমার চির ভক্ত...একি সত্য?

তখন সে সচকিতে আমার দিকে দুই একবার চাহিয়াছিল। উষার কণ্ঠ সকল সময়ই মধুর কিন্তু সেদিন তাহার সুরের মূর্ছনা যেন শ্রোতাদের কানের ভিতর দিয়া মরমে পশেছিল। আমি তাহার কারণ বুঝিয়াছিলাম। ঐ সংগীতখানিতো আজ তাহার নিকট শুধু ছন্দের বাঁধনে বাঁধা গান নহে, ওই গানখানি যেন সঞ্জীবীত হইয়া উঠিয়াছে। আমি রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি দ্ব্যর্থবাচক গান শিখিয়াছিলাম, উদ্দেশ্য ছিল প্রগতিপ্রাপ্তা যুবতী মহলে গাহিয়া তাহাদের রুচির পরীক্ষা করা। রবীন্দ্রনাথের গান বলিয়া কেহ আপত্তি করিতেন না, কিন্তু উষাও যে এমন গান কণ্ঠস্থ করিয়াছিল তাহা আমি জানিতাম না।

অজস্র প্রশংসাধ্বনির মধ্যে গান শেষ হওয়ার পর জলযোগের ব্যবস্থা হইল। প্রত্যেককে চা কয়েক রকমের মিষ্টি দেওয়া হইল। অতিথিগণ সকলে ক্রমে ক্রমে বিদায় লইলেন। উষাও বিদায় লইল। উষা বিদায় লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমিও বিদায় লইলাম। উষা যখন গাড়িতে উঠিতেছিল, তখন তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম—"আপনি একলা যাবেন! অনুমতি করেন তো আপনার বাড়ি পর্যন্ত পৌছে দিয়ে আসি।"

উষা বলিল—"বাড়ির গাড়ি রয়েছে, আপনাকে আর কেন কষ্ট দিই!"

অধ্যাপক মহাশয় নীচে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি আমাদের কথা শুনিতে পাইলেন—বলিলেন—"বেশ তো! রমেশ গিয়ে তোমাকে পৌছে দিয়ে আসুক, রাত একটু বেশি হয়েছে, একজন সঙ্গে থাকা ভাল।"

উষা আর আপত্তি করিল না, আমি গাড়িতে উঠিলাম। গাড়ি চলিতে লাগিল। গাড়িতে বসিয়া কত কথাই হইল। উষা স্বীকার করিল, যে প্রথম দেখার পর হইতেই আমাকে সে ভালবাসিয়াছে। আমি লীলাকে ভালবাসি মনে করিয়া সে কতদিন ঈর্ষায় জর্জরিত হইয়াছে। আমিও ওই রকম কত কথা বলিলাম। গাড়ি বাড়িতে গিয়া পৌছিল। উষার মা বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমার পূর্বেও অনেকবার দেখা হইয়াছে। আমি উষাকে পৌছাইয়া দিতে গিয়াছি শুনিয়া তিনি আমাকে পৌছাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন।

বাড়ি আসিয়া অবশিষ্ট রাত্রি আমার ভাল ঘুম হইল না। উষার উত্তপ্ত স্পর্শ যেন আমাকে মাতাল করিয়া তুলিয়াছিল। গুণেন্দ্র সেদিন বাসায় ছিল না। থিয়েটারের একজন সুন্দরী অভিনেত্রীকে লইয়া সে তখন মজিয়াছে। সুতরাং আমার মনের কথা বলিবার কেহ ছিল না।

কেমন করিয়া উষার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং কেমন করিয়া আমার বাসনা পরিতৃপ্তি করিতে পারি, এখন হইতে তাহাই আমার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। লীলার

বাড়িতে যাইবার যেমন লোক দেখান একটা সংগত কারণ সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলাম, উষার বাড়িতে যাওয়ার তেমন কোন সংগত কারণ ছিল না। মধ্যে মধ্যে কাহারও বাড়ির সান্ধ্য সম্মিলনে উষার সঙ্গে আমার দেখা হইত এবং পাঁচ সাত দশ মিনিট নির্জনে আলাপের সুবিধা হইত মাত্র।

এমন সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে সুযোগ ঘটিয়া গেল। উষার মা'র অসুখের জন্য ডাক্তারগণ তাঁহার শিমুলতলা, দেওঘর অথবা মধুপুর এই প্রকার কোন স্থানে কিছুদিন থাকিতে বলিতেছিলেন। উষা আমাকে বলিয়াছিল যে অর্থাভাবেই স্থান পরিবর্তন হইতেছে না। কলিকাতার বাসা পাঁচ বৎসরের এগ্রিমেণ্টে তাঁহারা লইয়াছিলেন, সেই বাসার ভাড়া চালাইয়া, আবার স্বতন্ত্র বাসা ভাড়া করিয়া থাকা তাঁহাদের পক্ষে কষ্টকর। ইহার মধ্যে একদিন কথায় কথায় গুণেন্দ্রর নিকট আমি জানিতে পারিলাম—মধুপুরে তাহাদের একখানা বাড়ি আছে। আমি গুণেন্দ্রকে বলিলাম বাড়িটা উষার মা'র জন্য ছাড়িয়া দিতে হইবে। গুণেন্দ্র আমার সব খবরই রাখিত। সে একটু হাসিয়া স্বীকৃত হইল। আমি সেই দিনই বৈকালে উষার বাড়িতে গেলাম। উষা আমাকে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল। তাঁহার মাও বিস্মিত হইলেন। করাণ সেই একদিন উষাকে পৌঁছাইয়া দেওয়া ভিন্ন আমি তাঁহাদের বাড়িতে আর যাই নাই, যদিও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের গৃহে প্রায়ই দেখা হইত। উষার মা আমাকে আদর করিয়া বসাইলেন এবং উষাকে চা আনিতে বলিলেন। অন্যান্য কথার পর চা খাইতে খাইতে আমি উষার মাকে বলিলাম—"আপনি খুব অসুস্থ, ডাক্তার আপনাকে চেঞ্জে যেতে বলেছেন, কিন্তু আপনি যেতে দেরি কচ্ছেন কেন?"

উষার মা আমার মুখের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন—পরে বলিলেন—"অনেক কারণ আছে বাবা, যাবার উপায় থাকলে কি আর না যেতাম!"

আমি বলিলাম—"আমার অপরাধ নেবেন না, আমি বুঝতে পেরেছি যে Financial difficultyর (অর্থঘটিত অসুবিধার) জন্যই আপনি যেতে পাচ্ছেন না—কেমন তাই নয়?"

আমার এই প্রশ্নে উষার মা একটু বিস্মিত হইলেন। কারণ এ রকম প্রশ্নটা একটু ভদ্রতা বিরুদ্ধ। কিন্তু আমি যে কেবল কুতূহলের বশবর্তী হইয়া কথাটা জিজ্ঞাসা করি নাই তাহাও তিনি আমার মুখের ভাব হইতে বুঝিতে পারিলেন এবং বলিলেন—"হ্যাঁ বাবা—একটা কারণ তাও বটে।"

আমি বলিলাম—"মধুপুরে আমার একটি বন্ধুর একখানা সুন্দর বাড়ি আছে। বারমাস খালি পড়ে থাকে, আমি সেই বাড়িখানা আপনার জন্য চেয়ে নিয়েছি। দু'চার মাস যা দরকার হয় আপনি সেখানে স্বচ্ছন্দে থাক্‌তে পারেন। বাসায় মালি দরোয়ান আছে, কোন অসুবিধা হবে না। তিনি বাড়ি ভাড়া দেন না, আবশ্যক হলে বন্ধু-বান্ধবকে থাকতে দেন।"

উষার মা একবারে অবাক হইয়া গেলেন—বলিলেন—'তুমি আমাদের জন্য এত কচ্ছ কেন বাবা।"

আমি বলিলাম—"এ আর এত কি কল্লেম। আমি উষা দেবীর কাছে একদিন কথায়

কথায় শুনেছিলুম যে ডাক্তার আপনাকে চেঞ্জে যেতে বলছেন, আপনি দুটো establishment এর খরচ কঠিন বলে যেতে রাজি হচ্ছেন না। আমার বন্ধুর বাড়িটা খালি আছে শুনে আপনার কথা আমার মনে হল, তাই আমি তাঁকে বলেছি। তিনি ঘর দোর পরিষ্কার কর্তে দরোয়ানকে লিখে দিয়েছেন।"

ঊষার মা হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"কি সর্বনাশ! একেবারে ঘর দোর পরিষ্কার পর্যন্ত শেষ! কি বলিস ঊষা, এ পাগল ছেলের কাণ্ডটা দেখেছিস্!"

ঊষা কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল—তারপর মাকে বলিল—"বেশ তো মা—চল না দু' এক মাস সেখানে থেকে আসা যাক।"

ঊষার মা বলিলেন—"তুইতো বলেই খালাস। তোর কলেজের কি হবে? এখানে বাসায় একলা তুই থাকবি কি করে?"

ঊষা বলিল—"আমিও তোমার সঙ্গে যাব, আমি বুঝি এখানে থাকব!"

ঊষার মা বলিলেন—"তাকি হয়—তোর একজামিন এসে পড়েছে!"

আমি বলিলাম—"আপনি চলুন, ঊষাদেবী আপনার সঙ্গে যাবেন, সপ্তাহ খানেক সেখানে থেকে তিনি চলে আসবেন, আপনি সেখানে থাকবেন।"

ঊষা বলিল—"সেই ভাল মা, তুমি আমাকে সঙ্গে রাখবে, আমি এসে কয়টা দিন এখানে থেকে একজামিন দিয়ে আবার তোমার কাছে যাব।"

ঊষার মা বলিলেন—"তুই একলা এ বাড়িতে থাকতে পারবি?"

ঊষা বলিল—"বারে, একলা কেন? রামদীন (দারোয়ান) আছে, ভজুয়া (মালী) আছে, দুখীয়া (মালীর স্ত্রী) রাত্রিতে আমার কাছে থাকবে। ইসমাইল্ (বাবুর্চি) থাকল, তোমার এত ভাবনা কি?"

এরা সকলেই ব্যারিস্টার সাহেবের বহুদিনের পুরাতন চাকর।

আরও কিছুক্ষণ তর্ক-বিতর্কের পর ঊষার মা যাইতে স্বীকৃত হইলেন এবং আমাকে বলিলেন—"বাবা তোমাকে তাহলে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। আমাকে পৌঁছে দিয়ে ঊষাকে নিয়ে তুমি ফিরে আসবে, আর ও যে ক'টা দিন একলা থাকবে তুমি মাঝে মাঝে এসে ওকে দেখে যাবে।"

আমি স্বীকৃত হইলাম। কয়েকদিন মধ্যেই সব বন্দোবস্ত করিয়া ঊষা এবং তাহার মাকে লইয়া যাত্রা করিলাম। গুণেন্দ্র স্টেশনে গিয়াছিল, আমি তাহার সঙ্গে ঊষা এবং তাহার মার পরিচয় করিয়া দিলাম। ঊষার মা গুণেন্দ্রকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন। গুণেন্দ্রও যথাযোগ্য উত্তর দিল। গাড়ি ছাড়িবার সময় গুণেন্দ্র আমার কানে কানে বলিল... "Lucky dog"—অর্থাৎ "খুব বরাৎ জোর যে তোর।"

মধুপুরের বাসা দেখিয়া উভয়ে খুব সুখী হইলেন। দিন রাত্রি ঊষার সঙ্গে একত্র থাকিয়া আমিও স্বর্গসুখ ভোগ করিতে লাগিলাম। ঊষার মা রাত্রি আটটা সাড়ে আটটার সময়ই আহারাদি করিয়া শুইতে যাইতেন। আমি ও ঊষা একত্র বসিয়া অনেকক্ষণ গল্প করিতাম, গান গাহিতাম। আমার এতদিনের সাধ পূর্ণ হইল।

সাতদিনের স্থলে পনেরদিন কাটাইয়া আমি ঊষাকে লইয়া কলিকাতা ফিরিলাম। যাত্রার পূর্ব দিন স্টেশনে আসিয়া রাত্রির গাড়িতে একটি কামরা রিজার্ভ করিয়া গিয়াছিলাম। বাড়িতে তাহা কেহই জানিত না। স্টেশনে আসিয়া ঊষা কামরায় রিজার্ভ টিকিট দেখিয়া হাসিয়া বলিল—"গাড়ি রিজার্ভ করেছ দেখছি।"

আমি বলিলাম—"আজ আমাদের পূর্ণ মিলন-বাসর—আজ আর ভয় নেই।"

গাড়ির চাবি একটা কিনিয়াছিলাম ; গাড়ি ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে চাবি বন্ধ করিয়া দিলাম।

ঊষা কলিকাতায় প্রায় কুড়ি পঁচিশ দিন থাকিয়া পরীক্ষা শেষ হইলে, মধুপুর চলিয়া গেল। এই পঁচিশ দিন প্রায় প্রত্যহ আমি তাহাদের বাড়িতে যাইতাম ; দুখিয়াকে কোন ছুতায় সরাইয়া দিয়া আমরা নানারকম গান ও গল্পগুজব করিতাম।

যে কয়দিন মধুপুরে ছিলাম সেই ক'দিন ভিন্ন প্রতি সন্ধ্যায় অধ্যাপক মহাশয়ের বাড়ি যাওয়া আমার বন্ধ হয় নাই। মধুপুর যাওয়ার সময় অধ্যাপক মহাশয়, তাঁহার স্ত্রী এবং লীলাকে আমি বলিয়াই গিয়াছিলাম যে জন্য যাইতেছি। ঊষার মাও একদিন অধ্যাপক মহাশয়কে বলিয়াছিলেন। আমার অনুগ্রহেই যে তাঁহাদের স্বাস্থ্যলাভের এই সুযোগ ঘটিতেছে একথা বলিয়া আমার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। নিছক পরোপকার প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়াই আমি ঊষাদের জন্য এই ব্যবস্থা করিতেছি, ইহাই সকলে জানিয়াছিল এবং অধ্যাপক মহাশয় ও তাঁহার বন্ধু-বান্ধবদের পরিবারে এজন্য আমি যথেষ্ট প্রশংসাও প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।

যাহা হউক কয়েক মাস পর ঊষার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পরও তাহার সঙ্গে দেখা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, সুযোগ পাই নাই। সে এখন সমাজে বিশিষ্ট সম্মানের অধিকারিণী ও সতীসাধ্বী বলিয়া পরিগণ্যা। তাহার প্রকৃত নাম এই গ্রন্থে ব্যবহার করিতে পারিলাম না।

এই সকল আলোকপ্রাপ্ত, বিলাত প্রত্যাগত এবং বিলাত প্রত্যাগতের অনুকরণকারী আধুনিক প্রগতিপ্রাপ্তা পরদা-বিরোধী সমাজের মহিলাগণের সহিত মিশিয়া আমার লাম্পট্য প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার কতগুলি সুযোগ ঘটিয়াছিল, তাহার প্রত্যেকটির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নহে। ঊষার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। আর একটি মহিলার অনুগ্রহ লাভ করিতে আমি সমর্থ হইয়াছিলাম। তিনি যাঁহার স্ত্রী, তাঁহার নাম আমি কমলিনীরঞ্জন বলিয়া উল্লেখ করিব। বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে তিনি পরিচিত, পণ্ডিত লোক বলিয়া ইহার খ্যাতি আছে। ইনি কেবল আমাকে অনুগ্রহ করেন নাই, আমাদের দলের অনেকেই ইহার কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছিল। প্রায় দুই বৎসর পূর্বে স্ত্রী ষোড়শী কন্যাকে লইয়া স্বামীগৃহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহার এই কন্যাটিরও বিবাহ হইয়াছিল। কন্যাটি নাকি একটু জ্যোতিষ জানিতেন। জ্যোতিষ গণনায়, ইহার সঙ্গে স্বামীর মিলনে স্বামীর প্রাণহানির সম্ভাবনা জানিতে পারিয়া পতির প্রাণরক্ষার জন্য পাতিব্রত্য ধর্মের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ইনি স্বামী ত্যাগ করিয়া অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাংলার রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে যে সকল পত্রিকা

প্রকাশিত হইতেছে, তাহার একটি পত্রিকার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট জনৈক ভদ্রলোকের আশ্রয়ে কন্যাটি ছিল, বর্তমানে শিশির ভাদুরীর সঙ্গে এমেরিকা গিয়াছে। (আমরা ওই ভদ্রলোকটিব নাম মহাদেববাবু বলিব) ইনিও আমার মত একটি নরদেবতা। কন্যার মাতা পলায়ন করিয়া আসিয়া প্রথমত কলিকাতা বোর্ডিং-এ কয়েকদিন, তারপর সিটি বোর্ডিং-এ কয়েকদিন, পুনরায় কলিকাতা বোর্ডিং-এ কয়েকদিন থাকিয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া অবশেষে রামবাগানের আস্বাদও গ্রহণ করিয়াছেন। ২৪ বৎসর স্বামীর ঘর করিয়া তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া আজ তৃপ্তির আশায় যাহা করিতেছেন তাহাতেও নাকি তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। গরীবের ঘরে এমন সুন্দরী স্ত্রী খুবই কম দেখা যায়। কবি এবং সাহিত্যিক বন্ধুগণই ইহাকে কুলের বাহির হইতে প্ররোচিত করিয়াছিল। কমলিনীবাবু 'মনোরমা' স্ত্রীর আশা এখনও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি জানেন না যে 'পরিমল' গন্ধে কেবল অলি নহে, পশুও জুটিয়াছে। কবি ও সাহিত্যিক বন্ধুদিগকে তিনি নিজেই স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিয়া বাঙালির কুসংস্কার দূর করিতে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। স্ত্রী ও কন্যার কোন রাজবাড়িতেও যাতায়াত ছিল বলিয়া শুনা যায়—অবশ্য কমলিনীবাবু নিজেই সেখানে পরিচয় করিয়া দিয়া থাকিবেন। দুইজন বাংলা কাগজের সম্পাদক ইহাদের সারথী ছিল।

মনোরমা* গড়িয়াহাটার কোন শখের থিয়েটারে মাঝে মাঝে অভিনয় করিয়া থাকেন। ফিল্মের অভিনেতৃর ব্যবসা অবলম্বন করিবার জন্য তিনি বিখ্যাত অভিনেতা চারু রায় মহাশয়ের নিকট যাতায়াত করিতেন। কন্যা পরিমল বিখ্যাত অভিনেতা শিশির ভাদুড়ী মহাশয়ের সঙ্গেই আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছিলেন।**

গুণেন্দ্র একদিন বলিল—"কলিকাতা যে আমেরিকা হ'তে চল্‌ল হে!" বলিয়াই সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। আমি বলিলাম—"ঘটনাটা কি খুলেই বল না।" তখন তাহার নিকট যাহা শুনিলাম, তাহা পাঠকগণ হয় ত বিশ্বাসই করিবেন না। গুণেন্দ্র বলিল যে বেহালার নিকট বড়িশার এক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পরিবারে অক্ষয় চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার স্ত্রী অসামান্যা সুন্দরী। জোড়াসাঁকোর নিকট তাঁহার স্ত্রী সরলা দেবী এক আত্মীয়ের বাড়ি আসিতেন। এখানে এক 'দত্ত' পদবিধারী উকিলের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। পরিচয় ক্রমে প্রেমে পরিণত হইল। স্বামী এই গুপ্ত প্রেমের বিষয় শুনিলেন। স্বামীও মোটা বেতনে চাকুরি করিতেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চাকরি যায়। চাকুরি যাওয়ায় অর্থকষ্ট হয়। তখন স্বামী

---

* এই পুস্তক প্রকাশিত হইবার অনেক পরে ১৯৩১ সনে মনোরমা কোন এক বক্তির বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানীর এক অভিযোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিচারে প্রমাণিত হইয়াছে যে মনোরমা বর্তমানে ঘৃণীত জীবনযাপন করিতেছেন, এজন্য মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইয়াছে। ইহার বর্তমান নাম সুদেবী।

** '১৯৩৩-এর সেপ্টেম্বর পরিমল দেবী, প্রভা, কঙ্কাবতীও শিশিরকুমারের সঙ্গে কলকাতা থেকে আমেরিকা যাবার জন্য রওয়ানা হয়েছিলেন।

স্ত্রীকে বলিলেন, "গোপনে এমন প্রেম করিয়া লাভ কি? যাহাতে অর্থ আসে এবং তোমার কামনাও সিদ্ধ হয়—চল তাহাই করি।" স্ত্রী ইহাতে খুব সুখী হইলেন। তাঁহারা সোনাগাছি অঞ্চলে গৌরীশঙ্কর লেনের এক বাড়িতে দুইখানা ঘর ভাড়া নিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। তাহাদের দুইটি ছোট যমজ পুত্র ছিল, ইহাদিগকেও সঙ্গে নিলেন। স্বামী সংসারের কাজকর্ম করিতেন ও ছেলে রাখিতেন। গুণেন্দ্রের কথা আমার বিশ্বাস হইল না, বলিলাম—"আমাকে ওই সরলার নিকট পরিচয় করাইয়া দিতে হবে।" গুণেন্দ্র আমাকে লইয়া তাহার নিকট গেল। আমি যেদিন প্রথম তাহার নিকট গেলাম, সেদিন সাহিত্যিক উকিল সুরেন মুখার্জিকে সেখানে পাইলাম। আমাকে দেখিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। আমি সরলার ঘরে বসিয়া মদ খাইতে লাগিলাম এবং গুণেন্দ্রের কথা সত্য কিনা তাহা পরীক্ষা করিতেছিলাম। গুণেন্দ্র যাহা বলিয়াছিল, সরলাও তাহাই বলিল। রাত্রি তখন প্রায় ১১।।০টা, সরলা বলিল যে ১২টার পর সে অন্য লোক স্থান দেয় না, তখন স্বামীর ঘরে যায়। আমি তো অবাক, বেশ্যার আবার স্বামী কি! প্রশ্ন করিলাম,—"আপনার ওই স্বামী আপনাকে কী দেন এবং কতদিন রখিয়াছেন?" সরলা বলিল—"উনি আমার বিবাহিত স্বামী, দেনাপাওনা আবার কি"! আমি বলিলাম—"তাহাকে রাখিয়া লাভ কি? তাড়াইয়া দিন ওকে।" ইহাতে সরলা বলিল—"আমি এত করা সত্ত্বেও যখন তিনি আমায় ত্যাগ করেন নাই, তখন আমি আর কি করিয়া তাড়াইব?" ক্রমে ইহার স্বামী অক্ষয়বাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। এক বৎসর হইল, কলেরায় ইহার স্বামী মারা গিয়াছে। জয় মিত্রের স্ট্রীটে (মাঠের পার্শ্বে) [সেই মাঠে এখন বাড়ি] থাকিবার সময় ইহাদের আর একটি ছেলে হইয়াছে। তিনটি সন্তানের জননী হইলেও তাহার রূপ অটুট ছিল। উকিল দত্ত-মুখার্জি লিমিটেড কোং করিয়া ইহাকে এখন স্থানান্তরে লইয়া গিয়াছেন। ইহার নিকট এখন ঝুনা সাহিত্যিকের আড্ডা।

কোন সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম, রবিন্‌সন্‌ নামক এক আমেরিকান আপনার স্ত্রীকে কোন ভারতীয় স্বাধীন নৃপতির লালসাভোগের জন্য অর্পণ করিয়া পরে আদালতের সাহায্যে বহু টাকা আদায় করিয়াছিল। কাগজে পড়িয়াই আশ্চর্য হইয়াছিলাম—কিন্তু এই ঘটনা তাহা হইতে আশ্চর্য। কলিকাতা আজগুবি দেশই বটে।

এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকজন বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমাকে পরাস্ত হইতে হইয়াছিল তাহারই নিকট যাহাকে পাইবার জন্য আমার প্রথম আগ্রহের সৃষ্টি হওয়ায় আমি এ-দলে প্রবেশ করিয়াছিলাম।

আমি লীলার কথা বলিতেছি। সেদিনের কথা আমার এখনো স্মরণ আছে, যেদিন আমি লীলার নিকট প্রকাশ্য প্রেম জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। লীলার বাড়িতে অধ্যাপক মহাশয় নীচে কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিলেন, অধ্যাপক পত্নী সেদিন অসুস্থ বলিয়া শয়ন ঘরে আবদ্ধ ছিলেন। আমি লীলাকে একটা নূতন গানের সুর শিখাইতে ছিলাম।

লীলা চুপ করিয়া আমার কথা শুনিল, তারপর বলিল,—"রমেশবাবু! আপনি আমাকে

ভালবাসেন এতো আমার সৌভাগ্য! কিন্তু একথা আপনি আমাকে না বল্লেই ভাল করতেন। আপনি হিন্দু, আমি ব্রাহ্ম, আপনার সঙ্গে আমার বিবাহ হওয়া তো সম্ভব নয়।"

বিবাহের চিন্তা এক মুহূর্তের জন্যও আমার প্রাণে জাগে নাই, সুতরাং আমি থমকিয়া গেলাম কিন্তু একটু পরেই বলিলাম—"লীলা আমি ওসব কথা শুনতে চাই না। আমি শুধু তোমার কাছে জানতে চাই, তুমি আমাকে ভালবাস কি না। আমি যে প্রাণভরা ভালবাসা তোমার পায়ে ঢেলে দিচ্ছি, তার প্রতিদানে তোমার প্রাণেও ভালবাসার একটু উন্মেষ আমি করতে পেরেছি কিনা, এইটি শুধু আমাকে জানিয়ে দাও। অন্য ব্যবস্থার কথা পরে হবে।"

লীলা নতমুখে বলিল—"সে কথা শুনে কি লাভ হবে?"

আমি বলিলাম—"তোমাকে বলতেই হবে। আমি শুনবো।"

লীলা বলিল—"যদি শুনতেই চান তাহ'লে বলছি ; আমিও আপনাকে ভালবাসি। আজ নয় অনেক দিন থেকেই বাসছি কিন্তু"—

আমি বাধা দিয়া লীলার দু'টি হাত দু'হাতে চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম—"তবে আর কিন্তু কি লীলা! তুমি আমায় ভালবাস, আমি তোমায় ভালবাসি। হিন্দু ধর্মের বা ব্রাহ্ম ধর্মের লৌকিক কয়েকটা তুচ্ছ আচার আমাদের এই মিলনের মাঝখানে এসে দাঁড়াবে?"

নতমুখী লীলা সহসা উন্নতমুখী হইয়া দাঁড়াইল। তারপর অকম্পিত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিল,—"আপনি তাহলে কি করতে বলেন?"

মূর্খ আমি! লীলার প্রশ্নের অন্তরালস্থিত তীব্র বিদ্রূপ বুঝিতে পারিলাম না। তাহার দৃষ্টির কঠোরতাও আমার লক্ষ হইল না। ভাবিলাম কেবলমাত্র আমার খুলিয়া বলার অপেক্ষা, তাহা হইলেই অন্য সব কয়েকটির মত লীলাও আমার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিবে। তাই আমি একটু হাসিতে হাসিতে বলিলাম—"আমি কী করতে বলি? আমার নিজের ভাষায় বলব না, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি—

"বীণা ফেলে দিয়ে এস মানসসুন্দরী,
দু'টি রিক্ত হস্ত শুধু আলিঙ্গনে ভরি
কণ্ঠে জড়াইয়া দেও......
চুম্বন মাগিব যবে ঈষৎ হাসিয়া
বাঁকায়োনা গ্রীবাখানি ফিরায়োনা মুখ
রেখো ওষ্ঠাধরপুটে ব্যগ্র ভৃঙ্গ তরে
সম্পূর্ণ চুম্বন এক।"

পরমুহূর্তেই লীলার মুখের ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। লীলার চোখ দু'টি হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল। লীলা বলিল—"রমেশবাবু, আমি জানিতাম না আপনি এত নীচ! বেরিয়ে যান এখুনি এ বাড়ি থেকে—"

আমি কী যেন বলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু আমাকে বাধা দিয়া ক্রুদ্ধা সিংহিনীর মত গ্রীবা বক্র করিয়া লীলা বলিল—"কোন কথা নয়, আমি তা হলে এখনই বাবাকে ডাকব—বেরিয়ে যান—"

বেত্রাহত কুকুরের ন্যায় মাথা নিচু করিয়া আমি সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। পরদিনই যে কলেজে পড়িতাম, সেই কলেজ হইতে ট্রান্সফার লইলাম। পাছে অধ্যাপক মহাশয়ের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হয়, এই ভয়ে সেই হইতে যে সকল পরিবারের সহিত তাহার মেলামেশা ছিল সেই সকল পরিবারের দ্বার আমার পক্ষে রুদ্ধ হইয়া গেল। যদিও জানিতাম লীলা ইচ্ছা করিয়া কথাটা প্রকাশ করিবে না, তথাপি হঠাৎ কোথাও যদি লীলার সঙ্গে দেখা হয় এবং যদি আমার সহিত কথা না বলে, তাহা হইলেও অন্য লোক কি মনে করিবে, ইহা ভাবিয়া আমি নিজেই সেই সমুদয় স্থানে যাওয়া বন্ধ করিলাম।

ইহার পর রীতিমত বেশ্যাসক্ত হইয়া পড়িলাম। গুণেন্দ্র এবং আমি দুইজনে একত্রেই আমোদপ্রমোদ করিতে যাইতাম। তখন কেবল থিয়েটারের অভিনেত্রী নয়, অনেক সুবিখ্যাত এবং অবিখ্যাত বেশ্যার ঘরেই আমাদের গমনাগমন হইতে লাগিল। আমরা তখন একটু একটু মদ্যপানও আরম্ভ করিয়াছি। পূর্বেই গুণেন্দ্রের মাতার মৃত্যু হইয়াছিল। সে তখন একেবারেই স্বাধীন ; সে মেস ছাড়িয়া একটি ছোট বাসা করিয়া ঠাকুর চাকর রাখিল। আমাকে জোর করিয়া তাহার বাসায় লইয়া আসিল। সে পড়াশুনার নাম করিয়া কলিকাতায় থাকিত কিন্তু কলেজে নাম রাখা ভিন্ন সে পড়াশুনার বড় ধার ধারিত না। সে দুইবার বি-এ ফেল করিল। আমি একবার ফেল করিয়া দ্বিতীয়বারে পাশ করিয়া এম-এ পড়িতে লাগিলাম।

আমরা প্রায়ই নিত্য নূতন বেশ্যার বাড়িতে যাইতাম। একদিন আমরা উভয়ে এইভাবে এক বেশ্যার বাড়িতে উপস্থিত হইয়াছি, তাহার নাম কৃষ্ণভামিনী। বেশ্যা হইলেও তাহার চেহারায় একটু ভদ্রভাব ছিল। তাহার বয়স তখন ষোল সতের বৎসর। বেশ্যাজনোচিত হাব ভাবে সে তখনো যেন ভাল করিয়া অভ্যস্থ হয় নাই। একটা ম্লান ছায়া যেন তাহার মুখখানিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মেয়েটির ইতিহাস জানিবার জন্য আমার কেমন একটা আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগিয়া উঠিল। তাহার প্রতি কেমন আকর্ষণও অনুভব করিলাম। সে দিনের মত আমোদ-প্রমোদ করিয়া চলিয়া আসিলাম।

কৃষ্ণভামিনীর সহিত ঘনিষ্ঠতা হওয়ার কিছুদিন পরে তাহার জীবনের ইতিহাস তাহার নিকট শুনিলাম। ইহা পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

কৃষ্ণভামিনী ব্রাহ্মণের মেয়ে। তাহার পিতার নাম গণেশ গোস্বামী। পিতার বাড়ি ছিল বিখ্যাত তীর্থ তারকেশ্বরের অর্ধ মাইল দূরে, ভঞ্জিপুর, গ্রামে। ওই স্থানের নিকটবর্তী চাঁদুরগ্রামে তিনি ডাক্তারী ব্যবসা করিতেন। ঐ গ্রামের অপর এক পাড়াতে কৃষ্ণভামিনীর মাতামহের বাড়িও ছিল। ত্রিবেণীর নিকট পোলবা গ্রামের রজনী ঘোষাল নামক এক ব্যক্তির সহিত নয় বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের পর স্বামীসঙ্গ সে বেশী

দিন ভোগ করিতে পারে নাই। বয়স যখন প্রায় তের কি চৌদ্দ তখন সে বিধবা হয় এবং পিতা তাহাকে স্বামীর গৃহ হইতে লইয়া আসেন।

বিধবা কৃষ্ণভামিনী কখনো পিতার নিকট, কখনো মাতামহীর নিকট বাস করিত। দুই বাড়ির সামান্য ব্যবধানই ছিল। ভঞ্জিপুর গ্রামখানি ছিল তারকেশ্বরের স্বনামধন্য মোহান্ত সতীশচন্দ্র গিরির জমিদারির অন্তর্ভুক্ত। এই ভঞ্জিপুর গ্রামে কেদার গাঙ্গুলি নামক এক ব্যক্তির বাড়ি নীলামে খরিদ করিয়া সেখানে মোহান্ত তাঁহার হরিমতী নামক এক রক্ষিতাকে রাখিতেন। কৃষ্ণভামিনীর মাতামহের বাড়ি হইতে পাঁচ ছয়খানা বাড়ির পরেই এই বাড়ি। হরিমতীকে লোকে রাণি হরিমতী বলিত। ভঞ্জিপুর গ্রামের ইতর ভদ্র সকল শ্রেণির মেয়েরাই হরিমতীর বাড়িতে বেড়াইতে যাইত। মোহান্ত পাল্কী চড়িয়া দারোয়ান সঙ্গে লইয়া প্রকাশ্য ভাবেই হরিমতীর বাড়িতে যাইতেন। মোহান্তের প্রাসাদের পশ্চিমদিকস্থ্ বাগানের ভিতর দিয়া একটি সোজা রাস্তা ছিল, সেই রাস্তায় প্রাসাদ হইতে হরিমতীর বাড়ি যাইতে পাঁচ সাত মিনিটের বেশি সময় লাগিত না। কৃষ্ণভামিনী হরিমতীকে "পিসিমা" বলিয়া ডাকিত এবং অন্যান্য মেয়েদের ন্যায় তাহার বাড়িতেও যাইত।

একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে কৃষ্ণভামিনী গা ধুইতে যাইতেছে এমন সময় মোহান্তের পাল্কি আসিতেছে দেখিয়া রাস্তায় এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল, মোহান্তের দৃষ্টি হঠাৎ তাহার দিকে পড়িল, মোহান্ত পাল্কি থামাইয়া তাহাকে নিকটে ডাকিয়া তাহার নাম ও পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। সে ভয়ে ভয়ে নাম বলিল। মোহান্ত আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া চলিয়া গেলেন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পর বেলা প্রায় ২টার সময় হরিমতী কৃষ্ণভামিনীকে তাস খেলিতে ডাকিয়া পাঠাইল। কৃষ্ণভামিনী ও হরিমতী বসিয়া তাস খেলিতেছিল, হঠাৎ মোহান্ত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মোহান্ত ঘরে ঢুকিতেই হরিমতী কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। হরিমতী বাহির হইয়া যাইতেই মোহান্ত কৃষ্ণভামিনীর হাত চাপিয়া ধরিলেন। কৃষ্ণভামিনী চীৎকার করিয়া হরিমতীকে ডাকিল, কিন্তু হরিমতী হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। মোহান্ত সেইখানেই বলপূর্বক তাহার ধর্ম নষ্ট করিলেন। কৃষ্ণভামিনীর সর্বনাশ হইবার পর হাসিতে হাসিতে হরিমতী গৃহে প্রবেশ করিল।

হরিমতী কৃষ্ণভামিনীকে অন্য ঘরে লইয়া গেল এবং তাহাকে নানা প্রকার সান্ত্বনা দিতে লাগিল। কিছু মিষ্টান্নও তাহাকে জোর করিয়া খাওয়াইল। সে তাহাকে বুঝাইল, মোহান্তের ভালবাসা পাওয়া সৌভাগ্যের কথা।

ইহার পর মাঝে মাঝে মোহান্তের হরি নামক একজন খানসামা আসিয়া কৃষ্ণভামিনীকে মোহান্তের বাড়িতে লইয়া যাইত। মোহান্ত তাহাকে নানাপ্রকার অলঙ্কার ইত্যাদি দিবেন বলিয়া প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু একখানা শাড়ি ভিন্ন কিছুই দেন নাই।

হরিমতীর প্রভাব মোহান্তের উপর খুবই ছিল। মোহান্তের অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি সাময়িক আসক্তিতে সে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিত না ; কিন্তু একই স্ত্রীলোকের প্রতি অধিক

দিন মোহান্তের আসক্ত থাকা সে পছন্দ করিত না। কৃষ্ণভামিনীর প্রতি মোহান্তের আসক্তি হইবার রকম দেখিয়াই সে কৃষ্ণভামিনীকে তাড়াইল। কৃষ্ণভামিনীর পিতা এবং গ্রামের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন মোহান্তের ভয়ে কেহই কিছু বলিতে পারিতেন না। মোহান্তের অনুগ্রহ লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমাজের উদ্যত দণ্ড কৃষ্ণভামিনীর পিতা ও মাতামহীর উপর পড়িল। কৃষ্ণভামিনীকে বাধ্য হইয়া গৃহত্যাগ ও জীবিকা নির্বাহের জন্য বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইল।

ইহাই সংক্ষেপে কৃষ্ণভামিনীর ইতিহাস। ইতিহাস শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। আমিও লম্পট, আমিও পাপী ; কিন্তু তথাপি এই কাহিনি শুনিয়া আমারও শরীর শিহরিয়া উঠিল। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কুল-ললনার বলপূর্বক সর্বনাশসাধন এবং তাহারই পরিণামে আত্মীয়স্বজনের স্নেহময় কোল হইতে বিচ্যুত হইয়া বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন, যে নররাক্ষসদের অত্যাচারে এই প্রকার ঘটনা সম্ভব হইল সে আজও তীর্থ-গুরুর আসনে বসিয়া পূজা পাইতেছে, ইহা ভাবিয়া ক্রোধে আমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। আর মনে মনে সহস্র ধিক্কার দিলাম দাসমনোবৃত্তিযুক্ত সেই সকল সমাজপতিদের, যাহারা এই মোহান্তদের অনুগ্রহ লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই বালিকার উপর এমন নির্মম অত্যাচার করিতে লাগিল।

অবশ্য ভগবানের রাজ্যে অবিচারের প্রতিফল একদিন না একদিন ফলিবে, তাহা তখন না বুঝিলেও আজ বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। মোহান্ত সতীশচন্দ্র গিরির নানাপ্রকার অত্যাচারের কথা লোকমুখে প্রকাশিত হইয়া তারেকেশ্বরে সত্যাগ্রহের সৃষ্টি হয়। তাহার ইতিহাস বাংলার কাহারও জানিতে বাকি নাই। তাহাকে পদচ্যুত করিবার জন্য হুগলি জজকোর্টে মোকদ্দমা হয়। হুগলির জজ মিঃ কে. পি. নাগ সেই মোকদ্দমায় মোহান্তকে পদচ্যুত করিয়া নূতন মোহান্ত নিয়োগ করিবার এবং একটি কমিটি দ্বারা সমুদয় সম্পত্তি শাসিত হইবার আদেশ দিয়াছেন। সমুদয় সম্পত্তি এমন কি যাহা মোহান্ত তাঁহার ব্যক্তিগত (Personal) বলিয়া দাবি করিয়াছিলেন তাহাও তিনি দেবোত্তর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। অর্থশালী মোহান্ত হাইকোর্টে আপীল করিয়াছেন। এ সকল সংবাদ বাংলার পত্র পাঠকগণের অবিদিত নাই।

কৃষ্ণভামিনীর সহিত অনেক দিন আমার দেখাশুনা নাই। কৃষ্ণভামিনী তাহার পর হইতে একজন লোকের রক্ষিতা হিসাবে বাস করিতেছে এবং মোকদ্দমায় সে নাকি সাক্ষ্যও দিয়াছে শুনিয়াছি। এই মোকদ্দমায় মোহান্তের চরিত্র সম্বন্ধে আরও অনেক কেলেঙ্কারি প্রকাশিত হইয়াছে। হরিমতীর গর্ভজাত একটি সন্তান—যাহার নাম কাশীনাথ, তাহাকে তার ভগ্নীপতির পুত্র বলিয়া বাজারে চালাইয়াছে এবং সেই ভগ্নীপতি মহাবীর প্রসাদের নামে আড়া ও বলিয়া জেলায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি খরিদ করিয়া দিয়াছে ; এই প্রকার প্রমাণও উক্ত মোকদ্দমায় নাকি উপস্থিত করা হইয়াছে। হরিমতী এখনও কলিকাতায় স্বতন্ত্র বাড়িতে বাস করিতেছে। মোহান্তের প্রায় সত্তর বৎসর বয়স,

এখনও নাকি তিনি হরিমতীর প্রেমে মশগুল এবং তাহার সমুদয় খরচ বহন ও তথায় গমনাগমন করিয়া থাকেন, ইহাও শুনিতে পাইতেছি।

কৃষ্ণভামিনীর সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘদিন ছিল না। আমরা সুখের পায়রা ছিলাম। নিত্য নূতন উপভোগের আকাঙ্ক্ষাই আমাদের বলবতী ছিল। এই সময় কলিকাতায় আরও দু'চারটি বড় লোকের ছেলের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। তাঁহারাও আমাদের মতন কাপ্তেন ছিলেন এবং তাঁহাদের কাহারও কাহারও কলিকাতার নিকটে বাগানবাড়ি ছিল। সেই সকল বাগানবাড়িতে মাঝে মাঝে আমোদ করিতে যাইতাম। বাবুগণ, বাবুদের স্তাবকবৃন্দ, কতকগুলি সুন্দরী বেশ্যা, বাক্স বাক্স বিলাতি মদ এবং নানাপ্রকার আহার্য সেখানে যাইত, কোন সময় ক্রমাগত দুই তিন রাত্রি সেখানে হর্‌রা চলিত।

বন্ধুবর্গের আহ্বানে আমি ও গুণেন্দ্র মাঝে মাঝে এই সকল বাগান পার্টিতে যোগ দিতাম। একদিন গুণেন্দ্র আমাকে বলিল—"দেখ, রমেশ, আমরা তো প্রায়ই বাগান পার্টিতে নিমন্ত্রণ পাচ্ছি, কিন্তু আমরা একদিনও তাদের নেমন্তন্ন করিনি, এটা ভারী লজ্জার কথা নয়!"

আমি বলিলাম—"তোর বাগান কোথায় যে তুই পার্টি দিবি।" গুণেন্দ্র বলিল—"একটা বাগান ভাড়া নিয়ে বা কারুর কাছে যেচে নিয়ে একদিন একটা পার্টি দিতে হচ্ছে, নইলে লোকে ভারী নিন্দে কর্‌বে—"

আমি বলিলাম—"তা তো বুঝতে পাচ্ছি, কিন্তু একটু ভাল করে করতে গেলে দেড়টি হাজার টাকা লাগবে।"

গুণেন্দ্র বলিল—"কুচ্‌ পরোয়া নেই, লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।"

একটি বাগান বাড়ি চাহিতেই পাওয়া গেল। আমাদের দলের একজন সেই বাগানবাড়ির মালিক। একটা বাগানের অভাবে আমাদের এই মহৎ (?) উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না জানিয়া তিনি তাঁহার বাগানবাড়ি আমাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন।

গার্ডেনপার্টিতে আমাদের বহু বন্ধু নিমন্ত্রিত হইলেন। পূর্বেই স্থির হইয়াছিল যে, প্রত্যেকেই দু'টি একটি অবিদ্যা সঙ্গে আনিবেন। এতদ্ব্যতীত host (অতিথি সৎকারক) হিসাবে আমরা বাছা বাছা জন কয়েক বেশ্যা, যাহারা ভাল গাইতে ও নাচিতে পারে তাহাদিগকে নিয়াছিলাম। হুইস্কি ও ব্র্যাণ্ডি এবং সোডা প্রচুর পরিমাণে লওয়া হইয়াছিল। এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে আমি ও গুণেন্দ্র যদিও মদ খাইতাম, কিন্তু কখনও তেমন মাতাল হইতাম না। সামান্য গোলাপি নেশা করিয়া আর সকলে অতিরিক্ত নেশায় যে সকল অপূর্ব কীর্তি করিত, তাহা সজ্ঞানে দর্শন এবং উপভোগ করিতেই আমরা বেশি আমোদ পাইতাম।

বিকাল বেলা হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যার মধ্যেই বন্ধুবান্ধব এবং অবিদ্যাগণ সকলেই আসিয়া জুটিলেন। সেদিন চতুর্দশী কি পূর্ণিমা ছিল। রাত্রি জ্যোছ্‌নাময়ী। খাওয়ার জন্য

পোলাও-মাংস চপ-কাটলেট প্রভৃতির আয়োজন করা হইয়াছিল। প্রকাণ্ড হলের মধ্যে শতরঞ্চের উপরে চাদর পাতিয়া সকলে উপবেশন করিলেন, খানসামা কয়েকটা ডিকেণ্টারে তরল লোহিত সুরা আনিয়া দিয়া গেল, কতকগুলি সোডা আসিল। রন্ধনশালা হইতে কয়েকখানা প্লেট বোঝাই হইয়া চপ-কাটলেট প্রভৃতি আসিল। একটা ট্রেতে তবক দেওয়া পানের খিলি এবং কতকগুলি সিগারেট আসিল। যথারীতি উপচারে সুরাদেবীর অর্চনা আরম্ভ হইয়া গেল।

দশ বারো জন্য বাবু এবং পনের ষোল জন বেশ্যা, এতদ্ব্যতীত তবলাওয়ালা, হারমনিয়ম, মন্দিরা বাদক প্রভৃতি কয়েকজন ছিল।

গৃহস্বামী আমি ও গুণেন্দ্র প্রথমে সোডা মিশাইয়া এক এক গ্লাস মদ অতিথিগণকে স্বহস্তে প্রদান করিলাম।—কে বলে বাঙালি জাতি স্ত্রীলোকের সম্মান জানে না। যেভাবে বাবুরা উপস্থিত অবিদ্যাগণকে প্রথমত প্রসাদ করিয়া দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং তাহাদের মৃদু হাস্যরঞ্জিত অধর সংস্পর্শে পবিত্রীকৃত সুরা পান করিলেন, তাহা দেখিলে এই দুর্নাম কেহই করিতে পারিতেন না।

গানের হুকুম হইল। এদিকে মদ্যপান চলিতে লাগিল। সুবেশী সুকণ্ঠি গায়িকাগণের গান আরম্ভ হইল। গানের ফাঁকে ফাঁকে নানাপ্রকার গল্পগুজব চলিতে লাগিল। উহার সবগুলিই অবশ্য কালোপযোগী।

একজন ইহার মধ্যেই একটু মাতাল হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি পার্শ্ববর্তী একজনকে চুম্বন করিলেন। আর একজন বলিল—"এই বেয়াদপ—এত লোকের সামনে লজ্জাশীলতার হানি, দাঁড়া তোকে পুলিশে দিচ্ছি।" লোকটি জড়িতকণ্ঠে বলিল—"ঠিক বলেছিস্ বাবা। ওই এত লোকের সামনেই যা দোষ, লুকিয়ে করলে কোন দোষ নেই, নইলে আমাদের পাড়ার শালা কবিরাজের এত মাতব্বরি থাকতো না।"

আর একজন জিজ্ঞাসা করিল—"সে কিরে, ব্যাপার কি?—কবিরাজ তো খুব ভাল মানুষ বলেই জানি!" লোকটি ব্যঙ্গ সুরে উত্তর দিল—"ভাল মানুষইতো বটে বাবা। ডুব দিয়ে জল খেলে একাদশীর বাবাও জানতে পারে না। পাটের বেইলারের বিধবা স্ত্রীকে তোমরা জান কি? লোকটি যাহার নাম করিল তাহা শুনিয়া আমরা চমকিয়া উঠিলাম। আর একজন বলিল—"তুই বলিস কি? অবাক কল্লি যে?"

লোকটি হাসিতে হাসিতে বলিল—"ওই তো মজারে ভাই। চোর ধরা পড়েছি আমরা কয় শালা, আমরা মদ খাই সেটা বড় দোষ, আর সে শালা কি করে জানিস? সে খায় সঞ্জীবনী সুধা, আবার বাবাঠাকুর আর মাঠাকুরুণের নিষ্ঠাটুকুও বেশ আছে। জোড়ায় জোড়ায় রোজ গঙ্গাস্নান করেন।

সকলে হাসিয়া উঠিল। আর একজন একদিকে বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে মদ খাইতেছিল, সে এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই, "সে বলিল—ঠিক বলেছিস্ ভাই। শালারা বলে ইংরেজি পড়ে নাকি আমরা বয়ে গেছি। আর ওই যে ব্যাটা...পণ্ডিত আমাদের পাড়ার—সেই

ছোটজাতের মেয়েকে নিয়ে কি ঢলাঢলিটাই না চালাচ্ছে। ছোটজাতের হাতে ভাত খেলে জাত যায়, আর তাদের মেয়েছেলে নিয়ে থাকলে জাত যায় না, শালাদের বেড়ে শাস্তর—"

ইনি যে ব্যক্তির কথা বলিলেন তিনি বর্তমান সময়ে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত এবং মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত। সেই শূদ্রানী এখনো তাঁহার রক্ষিতা আছে বলিয়া জানিয়াছি। তাঁহার ছাত্রেরা সেই স্ত্রীলোকটিকে 'গুরুমা' বলিয়া ডাকিতে বাধ্য হয়—প্রতিবৎসর তাহাকে লইয়া পণ্ডিত মহাশয় নবদ্বীপ যাইয়া পুণ্যসঞ্চয় করিয়া আসেন।

বলা বাহুল্য এই সকল আলাপ সকলেরই বেশ শ্রুতিমধুর হইতেছিল। একজন বলিল—"আরে জোঁকের গায় জোঁক লাগে শুনেছিস্ কখনো।" একজন উত্তর দিল, "খুলেই বলনা।' সে বলিল—"ডাক্তার ভারসাস্ ডাক্তার, এক ডাক্তারের গিন্নির সঙ্গে আর এক ডাক্তার। আমরা সকলেই প্রশ্ন করিলাম—"ব্যাপারটা কি?"

সে উত্তর দিল—"চন্দ্রমাধব" ডাক্তারের স্ত্রীর সঙ্গে "কৃষ্ণমাণিক্য," ডাক্তার জুটে গেছে জানিস্ না। বেচারা চন্দ্রমাধব কিছুই বলতেও পারে না, সইতেও পারে না।"

আর একজন বলিল—"কৃষ্ণমাণিক্য তো পেয়াদাপুরের রাণির চিকিৎসকও হয়েছিলেন জানি। সেই যে স্বাধীন জেনানা।"

প্রথমোক্ত ব্যক্তি বলিল—"একটিতে কি তার মত লোকের পোষায়, এক "কৃষ্ণ" সহস্র গোপিনী নইলে কি করে চলে?"

একজন বলিল—"কৃষ্ণমাণিক্যের মেয়েটাও যে আবার 'চন্দ্র' তিলক পরছে।" একজন আলোকপ্রাপ্ত ভ্রাতা তখন বলিলেন—"আমাদের সমাজের কুৎসা করোনা—আমাদের সমাজে এমন দুষ্ট লোক থাকিতে পারে না।"

উত্তরে অনেকে বলিলেন—"বেড়ে সমাজতো ভাই, দুনিয়ায় এমন জাত নেই, যে সমাজের মেয়ে দুষ্ট বা বেশ্যা নাই। তবে তোমাদের দেখছি ভারি মজা।"

আবার একটা হাসির হর্‌রা উঠিল। আমরা এই আখ্যায়িকায় ছদ্মনাম ব্যবহার করিলাম বটে কিন্তু এই দুই ডাক্তার এবং এই রানির ঘটনা যে প্রকৃত, তাহাও আমি অনুসন্ধানে জানিয়াছিলাম। ক্রমে ক্রমে সকলেরই অবস্থা সঙিন হইতে লাগিল। হলঘরের পার্শ্বে ছোট ছোট যে সকল কক্ষ ছিল মধ্যে মধ্যে উঠিয়া কেহ কেহ সেই সকল কক্ষে আনাগোনা করিতে লাগিলেন। কোন কোন রসিক আবার অতর্কিতে সেই সময় গৃহে প্রবেশ করিয়া নূতন রসের সৃষ্টি করিলেন।

এই মজলিসে একজন উপস্থিত ছিলেন তাঁহার নাম পদ্মরঞ্জন সরকার। ইনি আমারই একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তখন তিনি সামান্য বেতনে চাকুরি করিতেন। বর্তমান সময়ে অবশ্য তিনি নয়জনের একজন। বাংলায় তাঁহাকে না চেনে এমন লোক খুব কম। ইহার জীবনকথা স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ে বলিব ইচ্ছা আছে। ইনি তখন বেশ মাতাল হইয়াছেন, মাতাল হইয়া অপর একজনকে লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিলেন। সেই ব্যক্তিও

মাতাল হইয়াছিল। দুজনে প্রায় মারামারির উদ্যোগ হইল। আমরা মাঝে পড়িয়া ছাড়াইয়া দিলাম।

তখন বেশ জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। রাত্রি প্রায় এগারটা, আহারের জন্য সকলকে ডাকা হইতেছে। কিন্তু মদ ছাড়িয়া কেহ উঠিতে রাজি নহেন। এমন সময় একজন প্রস্তাব করিল বাগানের পুকুরে যে নৌকা বাঁধা আছে তাহাতে এই জ্যোৎস্নালোকে বেড়ান যাক। কয়েকজন মাতাল, "বাহবা, চমৎকার" বলিয়া তখনই উঠিল, বেশ্যা যাহারা ছিল, তাহারা অনেকে যাইতে রাজি হইল না ; দু' তি নটি মাত্র চলিল। সকলে যাইয়া নৌকায় উঠিয়াছে, এমন সময় পদ্ম সরকার টলিতে টলিতে যাইয়া পুকুরের ধারে দাঁড়াইয়া "বাবা আমাকে তোরা নিলিনে, যাঃ না নিলি শালীরা, আমি তো পদ্মফুল, পুকুরেই ফুটে থাকব" বলিয়া ঝাঁপাইয়া জলে পড়িল এবং হাবুডুবু খাইতে খাইতে নৌকার একদিক ধরিয়া ফেলিল। নৌকাখানি একেই অতিরিক্ত বোঝাই হইয়াছিল, তাহার পর একদিকে পদ্মবাবুর ভার পড়ায় ডুবিয়া গেল। আমি ও গুণেন্দ্র ঘাটেই দাঁড়াইয়াছিলাম। জলে নামিয়া সকলকে টানিয়া উঠাইলাম। সৌভাগ্যক্রমে নৌকা বেশিদূর যায় নাই, জলও কম ছিল, সুতরাং কাহারও প্রাণহানী হইল না। বেশ্যাকয়টি পদ্মবাবুকে অকথ্য ভাষায় গালি দিতে লাগিল। পদ্মবাবু জড়িতস্বরে বলিলেন—"গালাগালি কচ্ছো কেন চাঁদ, নেশা ছুটে গেছে তাই, চল না সব শালীকে"—বলিয়া একটা অকথ্য উক্তি করিলেন। সিক্ত বস্ত্রে সকলকে বাগানবাড়ির বৈঠকখানায় আনান হইল। তারপর আহারের ব্যবস্থা। সকলেই টলিতে টলিতে আহারে চলিলেন। আহার যাহা হইল, তাহা না বলিলেও চলে। কেহ কেহ আসনে বসিয়া নাক ডাকাইতে লাগিলেন, অধিকাংশ বাবুই দু'চার গ্রাস মুখে দিয়া থালার উপরেই "ওয়াক্-ওয়াক্" করিয়া বমি করিতে লাগিলেন। খানসামা কতকগুলি নিযুক্ত ছিল, তাহারা বাবুদের সরাইয়া নিয়া ফরাশে শোয়াইয়া দিল। বেশ্যাগুলিরও প্রায় ওই দশা হইয়াছিল। কেবল ভাড়া করিয়া আনা নাচওয়ালি এবং বাদকগুলি ঠিক ছিল। তাহারাও মদ খাইয়াছিল, কিন্তু বেসামাল হয় নাই। আমি ও গুণেন্দ্র তাহাদের যত্ন করিয়া খাওয়াইলাম। আমরাও খাইলাম। তারপর একবার বন্ধুবর্গের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিলাম। সেই প্রকাণ্ড ফরাশের উপর অনেকে বিপর্যস্ত পোশাকে পড়িয়া আছে, অধিকাংশই প্রায় অর্ধ উলঙ্গ, কেহ অজ্ঞান অবস্থাতে ওই ফরাশের উপরই বমি করিতেছেন। কেহ অন্যকে জড়াইয়া ধরিতেছে। আমাদের পদ্মরঞ্জন বাবু পার্শ্বে শায়িত দীর্ঘশ্মশ্রু বিশিষ্ট একটি বাবুকে জড়াইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিতেছিলেন আর জড়িত স্বরে বলিতেছিলেন—

"কলিকালে কি হ'লো বাবা, মেয়েমানুষেরও দাঁড়ি গজায়।"

দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ এই দৃশ্য দেখিলাম, মনে হইল, বুদ্ধদেব এই প্রকার দৃশ্য দেখিয়াই বোধ হয় গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন।

এই বাগানবাড়ির ব্যাপারটা যে আমি বিশদভাবে বর্ণনা করিলাম, তাহার কারণ এই যে এসব স্থানে যে সকল বীভৎস অভিনয় হয় তাহার প্রকৃত চিত্র সমাজের মঙ্গলের জন্য

প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। মানুষের মধ্যে সুপ্ত পশুত্ব এই সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই নগ্ন চিত্র আমার পাঠকগণকে যদি সজাগ করিয়া তুলিতে পারে তাহা হইলেই আমার লেখা সার্থক হইবে।

আমার কলেজ জীবনের মোটামুটি পরিচয় পাঠকগণকে উপহার দিলাম। এইভাবে জীবনযাপন করিয়াও আমি এম. এ. পাশ করিলাম। আমার M.A. উপাধি দুইপ্রকারেই সার্থক (Significant) হইয়াছিল। আমি কেবলমাত্র Master of Arts হইয়াছিলাম না, Master of Adultry অর্থাৎ ব্যভিচারেরও মাস্টার হইয়া কলেজ হইতে বাহির হইলাম।

পারিবারিক জীবন

আমার কলেজ জীবনের কথাই এ পর্যন্ত বলিয়াছি। এই সময়ের মধ্যে আমার পারিবারিক জীবনের কথা কিছুই বলি নাই। সেই সম্বন্ধেও কতকগুলি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

পূর্বেই বলিয়াছি পিতাঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে নানা ছুতায় অর্থ আনিতেছিলাম। পিতাঠাকুর মহাশয়ও বিনা আপত্তিতে সরল বিশ্বাসে সেই অর্থ জোগইতেন। কিন্তু পর পর দুই তিন বৎসর আমাদের দেশে অজন্মা হওয়ায় আমাদের অবস্থা খুব শোচনীয় হইয়া পড়িল। পিতাঠাকুর মহাশয় সাংসারিক ব্যাপারে অনেকগুলি বিষয়ে ব্যয় সংক্ষেপ করিলেন, কিন্তু পারিলেন না কৃপণতা করিতে আমার খরচ সম্বন্ধে এবং বাড়িতে বার মাসে যে তের পার্বণ হইত সেই সম্বন্ধে। তাঁহার নিষ্ঠাবান আস্তিক হৃদয় দেবপূজা সম্বন্ধে কোন প্রকার ব্যয় সংক্ষেপে সায় দিল না, ইহার ফলে তাঁহার কিছু টাকা ঋণ হইল। দুইটি অবিবাহিতা ভগ্নীর বিবাহ দিতে এবং আমার খুড়তুতো ভ্রাতার বিবাহ উৎসবেও কতকগুলি টাকা তিনি ঋণ করিতে বাধ্য হন। দুর্ভাগ্যক্রমে ভগ্নী দু'টির একটি বিবাহের ছয় মাস পরে এবং একটি বিবাহের একবৎসর পরেই বিধবা হয়। চরিত্রবান এবং আচারনিষ্ঠ দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে কেবলমাত্র সৎপাত্র দেখিয়া কন্যা দু'টির বিবাহ তিনি দিয়াছিলেন। সুতরাং বিধবা হওয়ার পর ভগ্নী দু'টির ভার আমাদেরই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই সকল কারণে যে দেনা হইয়াছিল তাহার সুদ চালাইতে বাবা অক্ষম হওয়ায়, সুদে আসলে দেনা ভীষণ আকার ধারণ করিতেছিল।

আমি ছুটিতে যখন বাড়িতে যাইতাম বাবা তখন এই সকল অবস্থা আমাকে বলিতেন। তাঁহার আশা ছিল আমি উপযুক্ত হইয়া বড় একটা চাকুরি লইলে এই সকল দেনা তিনি শোধ করিতে পরিবেন। আমাকেও যথাসম্ভব ব্যয় সংকোচ করিতে উপদেশ দিতেন। কিন্তু "চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি।" আমার বিলাসিতা সমান ভাবেই চালাইয়াছিলাম।

এম-এ পাশ করিবার অব্যবহিত পরেই বাবা আমার বিবাহ দিলেন নয় কি দশ বৎসরের একটি বালিকার সঙ্গে। বাবা পণ-প্রথার বিরোধী ছিলেন ; নিজের কন্যার বিবাহে বাধ্য হইয়া পণ দিতে হইলেও দাদার (খুড়তুতো ভ্রাতার) অথবা আমার বিবাহে তিনি পণ নেন নাই। আমার বিবাহ উৎসবে আরও কিছু দেনা হইল।

আমার (খুড়তুতো) দাদার ইতিমধ্যে দুইটি ছেলে হইয়াছিল। তিনি বাড়িতেই থাকিতেন এবং টোল করিয়া বিদ্যাদান করিতেন। ৬/৭টি ছেলে বাড়িতে রাখিয়া খাইতে দিয়া তিনি অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বাবার ইহাতে সম্মতি এবং খুব উৎসাহ ছিল। তিনি বলিতেন—"যোগেশ আমার বংশের নাম উজ্জ্বল করেছে। ব্রাহ্মণের প্রকৃত কাজ

কচ্ছে। আমার সব খরচ যদি চলে এই পাঁচটা সাতটা ছেলেকেও আমি খেতে দিতে পারব।" দাদা যখন যাহা পাইতেন বাবাকে আনিয়া দিতেন এবং দু'টি পয়সার প্রয়োজন হইলেও বাবার নিকট চাহিয়া লইতেন।

পূর্বেই বলিয়াছি দাদাকে আমি মানুষ বলিয়া গ্রাহ্য করিতাম না। তাঁহার সাদাসিদা চাল চলন দেখিয়া তাঁহাকে একটা আহাম্মক বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁহাকে কোন দিন অসম্মান করিতে সাহসী হইতাম না। কারণ, তাহা হইলে আমি জানিতাম যে পিতা কখনো আমাকে ক্ষমা করিবেন না।

এই প্রকার অবস্থায় আমার বিবাহের দুই তিন মাস পরে হঠাৎ আমার পিতার মৃত্যু হইল। আমরা চতুর্দিক অন্ধকার দেখিলাম। পিতার শ্রাদ্ধ যথাযোগ্যভাবে সম্পাদন করিতে আরও কিছু দেনা হইল। পিতার মৃত্যুর পর দাদার সহিত সাংসারিক বিষয় লইয়া অনেক আলোচনা হইল। আমি দাদাকে টোল উঠাইয়া দিয়া কতকগুলি অযথা খরচ বন্ধ করিতে বলিলাম। তিনি তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। উভয় ভ্রাতাতে এই লইয়া যথেষ্ট মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল। তখন বাবা ছিলেন না। সুতরাং আমার প্রত্যেক কথায়, তাহার প্রতি আমার এত দিনের সঞ্চিত ঘৃণা এবং অশ্রদ্ধা প্রকাশিত হইতে লাগিল। আমি তাহাকে এমন সব অসম্মানসূচক কথা বলিলাম—যাহা স্মরণ করিতেও এখন আমার লজ্জা বোধ হইতেছে। আমি এত সব অন্যায় কথা বলিবার পরও দাদা আমাকে শান্তভাবে কেবলমাত্র ইহাই বলিলেন—"আমি বুঝতে পাচ্ছি রমেশ, তুমি খুব উত্তেজিত হয়েছ। যে সব কথা তুমি আমাকে আজ বল্লে এর জন্য তুমি একদিন অনুতপ্ত হ'বে এ কথা আমি জানি।"

আমার ক্রোধ বাড়িয়া গেল। আমি প্রস্তাব করিলাম যে তাহার সহিত আমি একত্র থাকিতে ইচ্ছুক নই। টোল চালাইতে হয় তিনি নিজে চালাইতে পারেন। দাদা উত্তর করিলেন—"একথা তুমি অবশ্য বলিতে পার। আমি জীবনের ব্রত হিসাবে ইহা বেছে নিয়েছি, এই চতুষ্পাঠী করেই আমাকে এর ব্যয় চালাতে হবে। তোমার পক্ষে এর ব্যয় বহন করিবার কোন সংগত কারণ নেই, কারণ আমি যে চোখে এই জিনিসটাকে দেখছি তোমার সেই চোখে জিনিসটাকে দেখা সম্ভব নয়। কাজেই তুমি যদি পৃথক হতে চাও স্বচ্ছন্দে হতে পার।"

তাহার পরদিন গ্রামের দশজনকে ডাকিয়া আমাদের হাঁড়ি পৃথক করা হইল। চাষের যে জমি ছিল তাহাও গ্রামের দশজন মিলিয়া উভয়ের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন।

আমাদের পৃথক হওয়ার কয়েকদিন পর, বাবার উত্তমর্ণ আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং টাকা পরিশোধ করিতে বলিলেন। হিসাব করিয়া দেখা গেল সুদে আসলে প্রায় বার হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। আর একটি বিষয় দেখিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, বাবা তাঁহার নিজের অংশের সম্পত্তি রেহানাবদ্ধ রাখিয়া এই দেনা করিয়াছেন। দাদার অংশ আবদ্ধ নাই। আমি মনে মনে বাবার নির্বুদ্ধিতার জন্য তাঁহাকে অনেক দোষারোপ করিলাম। আমার তখন মনে হইল—আমার পৃথক হওয়ার প্রস্তাবে দাদা এত সহজে যে সম্মতি দিয়াছিলেন

তাহার কারণ আর কিছুই নহে, দাদা একথা জানিতেন। শ্রীরামপুর আসিয়া দুই চারজন উকিলের পরামর্শ লইলাম। তাঁহারা বলিলেন, আমি নিজের পায়ে কুঠার আঘাত করিয়াছি। একান্নবর্তী পরিবারের খরচ নির্বাহের জন্য দেনা হইয়াছে, ইহা প্রমাণ করিতে পারিলে একজনের কৃত দেনার জন্য অপর শরিকও দায়ী হইয়া থাকেন। উত্তমর্ণ মহাশয়ের নিকট আবার গেলাম এবং উকিল বাবুর পরামর্শ অনুসারে উভয় ভ্রাতার নামে তাঁহাকে নালিশ করিতে বলিলাম। তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন।

আমার মনে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে ন্যায়ত ধর্মত যাহাই হউক, যদি আইনে ফাঁক থাকে তাহা হইলে দাদা সেই সুযোগ লইয়া এই দেনার দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে চেষ্টার ক্রটি করিবেন না। পৃথক হওয়ার পর হইতেই দাদার সহিত আমার কথাবার্তা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। আদলতে নালিশ হইতে না দিয়া আপশে যাহাতে অনুগ্রহ পাইতে পারি তাহারই চেষ্টা করা উচিত মনে করিয়া উত্তমর্ণ মহাশয়ের বাড়িতে দু'চার জন লোক লইয়া অনেকবার যাতায়াতের পর স্থিব হইল যে, আমার অংশের সম্পত্তি কেবলমাত্র বাড়ির সংলগ্ন পাঁচ বিঘা ব্যতীত তাঁহাকে কবালা করিয়া দিতে হইবে। বাড়িখানা এবং পাঁচবিঘা জমি মাত্র রক্ষা পাইবে। আমি তাহাতেই সম্মত হইলাম। স্ট্যাম্প খরিদ করিয়া লেখাপড়ার দিন স্থির হইল ; নির্দিষ্ট দিনে আমি যথাসর্বস্ব লিখিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়া উত্তমর্ণ মহাশয়ের বাড়িতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। লেখাপড়া আরম্ভ হইবে এমন সময় দাদা সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমার আপাদমস্তক রাগে জ্বলিয়া উঠিল। বুঝিলাম আমি যে পথের ভিখারি হইতেছি তাহা দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে দাদা সেখানে গিয়াছেন। উপস্থিত দুই চারিজন এবং আমার মহাজন দাদাকে আসিতে দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইয়াছিলেন। দাদা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া ফরাসের এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া আমার মহাজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"গাঙ্গুলি ম'শায়! জ্যেঠা মহাশয়ের মোট দেনা কত দাঁড়িয়েছে? গাঙ্গুলি মহাশয় কাগজপত্র নাড়া চাড়া করিয়া বলিলেন—সুদে আসলে এগার হাজার পাঁচশ কুড়ি টাকা।" দাদা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—"রমেশের সঙ্গে কি রকম বন্দোবস্ত হলো।"

বন্দোবস্ত যাহা হইয়াছিল গাঙ্গুলি মহাশয় তাহা বুঝাইয়া বলিলেন—আমার অংশের সম্পত্তির আয় ৬০০্ শত টাকা, ইহার মূল্য নয় হাজার পাঁচশত সত্তর টাকা সাব্যস্ত হইয়াছে। আমার অংশের পঁচিশ বিঘা জমির মধ্যে বাড়ির সংলগ্ন পাঁচ বিঘা বাদ রাখিয়া অবশিষ্ট বিশ বিঘার মূল্য চৌদ্দশত টাকা স্থির হইয়াছে। মোট দশ হাজার নয় শত সত্তর টাকা মূল্যের সম্পত্তি লইয়া তিনি আমাকে অব্যাহতি দিতেছেন। তাঁহার সুদে আসলে প্রাপ্য মোট টাকা হইতে এই টাকা গেলে পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা তথাপি তাঁহার প্রাপ্য থাকে, তা' আর কি করিবেন। বাধ্য হইয়াই টাকাটা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইতেছে—দাদার (আমার পিতা) পুত্রকে তো আর তিনি ভিটে ছাড়া করিয়া পথে বসাইতে পারেন না ; ইত্যাদি ইত্যাদি।

গাঙ্গুলি মহাশয়ের এই মহানুভবতায় আমার মনের যে ভাব হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করা সম্ভব নহে। চক্রবৃদ্ধি হারে সুদে, আসল চারি হাজার টাকায় বার হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। সেই অবস্থায় পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা ছাড়িয়া দিয়া মহানুভবতা প্রকাশ করিতে দেখিয়া আমার নরমেধ যজ্ঞ নাটকের রত্নাকরের কথা স্মরণ হইল। কিন্তু কি করিব, চুপ করিয়া এই সব কথা শোনা ভিন্ন আমার গত্যন্তর ছিলনা।

দাদা একটা কাগজে কয়েকটা হিসাব করিলেন, তারপর যে কথা বলিলেন তাহা শুনিয়া শুধু আমি কেন সেখানে যাঁহারা ছিলেন সকলেই অবাক হইয়া গেলেন। দাদা বলিলেন—"গাঙ্গুলি মহাশয়! জ্যেঠা মহাশয় এ দেনা করিয়াছিলেন আমরা যখন একান্নবর্তী ছিলাম সেই সময় ; রমেশের সঙ্গে যদিও পৃথক হয়েছি তথাপি আইনত হোক না হোক ন্যায়ত ধর্মত এই দেনার অর্ধাংশের জন্য আমি দায়ী। আমাদের দুই ভাই-এর সম্পত্তির আয় দুই শত ত্রিশ টাকা বাদে অবশিষ্ট সম্পত্তি আপনি কিনে নিন। তার দাম দাঁড়াবে পনের হাজার ছয়শ' নব্বুই টাকা। আপনাকে সুদ মাফ দিয়ে অনুগ্রহ কত্তে হবে না। আপনার এগার হাজার পাঁচশত কুড়ি টাকা সম্পূর্ণ ওই দাম থেকে কেটে নিয়ে অবশিষ্ট টাকা আমাদের দুই ভাইকে দিন।"

গাঙ্গুলি মহাশয় বোধ হয় প্রথমে কথাটা বিশ্বাস করিতেই পারিলেন না। যেখানে আইনে ধরিতে পারে না সেখানে স্বেচ্ছায় এতবড় স্বার্থত্যাগ ন্যায় ও ধর্ম—গাঙ্গুলির অভিধানে যাহার কোন অর্থই নাই—শুধু তাহারই জন্য, ইহা বুঝিবার উপযুক্ত মনোবৃত্তি গাঙ্গুলি মহাশয়ের মোটেই ছিল না। শুধু গাঙ্গুলি মহাশয় কেন অনেকেরই ছিল না। দাদার এই স্বার্থত্যাগ বেকুবিরই নামান্তর বলিয়া অনেককে বলিতে শুনিয়াছি। আমি লম্পট বেশ্যাসক্ত যাহাই হই, আমি সেই দিন বুঝিতে পারিলাম যে, আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার তুলনায় দাদার শিক্ষা দাদাকে গড়িয়াছে শিব, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আমাকে গড়িয়াছে বানর।

আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। কোন কথাও বলিতে পারিলাম না, যেখানে বসিয়াছিলাম সেখান হইতে ছুটিয়া যাইয়া দাদার পা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম ; এই দেবতুল্য দাদাকে কি না আমি বলিয়াছি! দাদা আমার দুটি হাত ধরিয়া তুলিয়া আমাকে পাশে বসাইলেন এবং এক হাতে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া, অন্য হাতে তাঁহার চাদর দিয়া আমার চোখ মুছাইয়া দিলেন।

কিছুক্ষণ তর্কবিতর্কের পর গাঙ্গুলি মহাশয় দাদার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন ; সম্পত্তিটি সম্পূর্ণ লাভ করিবার জন্য তাঁহারও আগ্রহ ছিল। দলিল লেখাপড়া হইল। কেবলমাত্র বাড়ি ও পাঁচ বিঘা জমির পরিবর্তে, আমার বাড়ি, পঁচিশ বিঘা জমি এবং গ্রামের মধ্যে একশত পনের টাকা বাৎসরিক আয়ের সম্পত্তি আমার রহিল। তাহার উপর নগদ প্রায় দুই হাজার টাকা আমি পাইলাম। দাদারও ঠিক ওই পরিমাণ সম্পত্তি এবং টাকা থাকিল। পৈত্রিক সম্পত্তি অবশিষ্ট বিসর্জন দিয়া দুই ভাই বাড়ি ফিরিলাম।

বাড়িতে বসিয়া থাকিবার অবস্থা আমার ছিল না। সুতরাং আমি চাকরির চেষ্টায় কলিকাতা আসিলাম। বাড়িতে মা'র নিকট খরচ পত্রের জন্য পাঁচশত টাকা রাখিয়া নগদ দেড় হাজার টাকা লইয়া আমি কলিকাতা ফিরিলাম। পিসিমার প্রদত্ত তিন হাজার টাকার মধ্যে আমার প্রায় দেড় হাজার টাকা এতদিনের বিলাসিতায় খরচ হইয়া গিয়াছিল ; সেই দেড় হাজার টাকা পুনরায় ব্যাঙ্কে রাখিলাম। এই সময় আমি মানদার পিতার বাড়িতেই প্রথম উঠিলাম এবং তঁহাকেই আমার জন্য চাকুরি করিয়া দিতে বিশেষ ভাবে ধরিলাম। তাঁহার চেষ্টায় লালবাজারের গ্রেস্ ব্রাদার্সের অফিসে মাসিক দুইশত টাকা বেতনে আমার চাকুরি হইল। মানদা তাহার আত্মচরিতে লিখিয়াছে যে আমি কোন অফিসের বড়বাবু হইয়াছিলাম, এ কথা সে ভুল লিখিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে উচ্চপদস্থ একজন কেরানির কার্যে আমি নিযুক্ত হইয়াছিলাম।

মানদা ও আমি

মানদার সহিত অবৈধ সংসর্গের কথা মানদা তাহার "শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত" নামক পুস্তকে ঢাক ঢোল বাজাইয়া প্রচার করিয়াছে। বাংলার অনেক পাঠকই তাহা অবগত আছেন। সে সম্বন্ধে আমি বেশি কোন কথা বলিব না। কয়েকটি কথা কেবল বলা প্রয়োজন বোধ করিতেছি। মানদা আমার সম্বন্ধে কতকগুলি মিথ্যা কথা বলিয়াছে এবং নিজের কতকগুলি কথা গোপন করিয়াছে। ইহার কারণও যে আমি না বুঝিতে পারিতেছি তাহা নহে। তাহার পুস্তকের প্রথম সংস্করণের "আমার কৈফিয়ৎ" শীর্ষক বিজ্ঞাপনের শেষ ভাগে সে লিখিয়াছে—

'এই জীবনীতে আমার ফটোচিত্র দিতে ইচ্ছা করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু আমায় ভূতপূর্ব শিক্ষক মুকুলচন্দ্র বানার্জি উকীল মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে তাহা দেওয়া হইল না।'

ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে শ্রীমান্ মুকুলচন্দ্রই তাহাকে এই জীবনচরিত প্রকাশ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। এই জীবনচরিতের খুবই কাটতি হইয়াছে, পর পর চার পাঁচটি সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। গ্রন্থখানি হিন্দিতে এবং ইংরাজিতেও অনুবাদিত হইয়াছে শুনিয়াছি। মুকলচন্দ্রের ন্যায় মক্কেলহীন উকিল এই সুযোগে বেশ একটি দাও মারিয়াছেন, তাহাও আমি বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু এই মুকুলচন্দ্র আমাকে মানদার সর্বনাশের কারণ স্বরূপ লোকসমাজে প্রচার করিয়া এক ঢিলে দুই পাখি মারিয়াছেন। নিজেকে সাধু বলিয়া বাজারে জাহির করিয়াছেন এবং আমার দুর্নীতি প্রকাশ করিয়া আমার সহিত তাঁহার পুরাতন শত্রুতার প্রতিশোধ লইয়াছেন।

মুকুলের সহিত আমার শত্রুতার কারণ আমি সংক্ষেপেই বলিব। ব্যারিস্টার কন্যা উষার কথা আমি পূর্বে বলিয়াছি। মুকুলচন্দ্র উষার প্রণয়-প্রার্থী ছিল। সেই সমাজে অনেক সান্ধ্য সম্মিলনে মুকুলের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। কিন্তু উষা তাহাকে মোটেই দেখিতে পারিত না। তাহার যে পোশাক ও হাবভাবের চিত্র মানদা তাহার পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দিয়াছে তাহার একবর্ণও অতিরঞ্জিত নহে। উষা মুকুলের ওই প্রকার সাজগোজটাই সকলের চেয়ে বেশি অপছন্দ করিত। মুকুলের অসাক্ষাতে অনেক দিন আমাকে বলিয়াছে—"ওটা একটা সং"। কবিতা লেখার বাই মুকুলের খুবই ছিল, আমরা জানিতাম তাহার অধিকাংশেরই ভাব এবং অনেক স্থলে ভাষা পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণের কবিতা হইতে চুরি করা। উষার উদ্দেশে লিখিত অনেক কবিতা উষা আমাকে পরে দেখাইয়াছিল। মলয় বাতাস, চাঁদনী রাত, কুঞ্জবন আর বাঁশির গানে সেই সব কবিতা পরিপূর্ণ ছিল। আমরা ইহা লইয়া অনেক হাসাহাসি করিয়াছি। মুকুল টের

পাইয়াছিল যে উষা আমার প্রতি অনুরাগিনী এবং সে সন্দেহ করিয়াছিল উষার সহিত আমার গুপ্ত প্রণয়ের কথা ; সেই জন্যই সে আমার প্রতি তখন মর্মান্তিক চটিয়াছিল।

তৎপর আরও কতকগুলি স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপারে তাহার সহিত গুণেন্দ্রের বিশেষ মতান্তর ঘটে। মুকুলও আমাদের মত চরিত্রহীন ছিল। এই সকল স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপারে আমি গুণেন্দ্রের সাহায্য করিয়াছিলাম এবং আমার সাহায্যে গুণেন্দ্র তাহার দুই একটি মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছিল। সেজন্যও আমার এবং গুণেন্দ্রের উপর তাহার বিশেষ ঈর্ষার কারণ ঘটিয়াছিল।

আমি প্রথম যেদিন মানদাদের বাড়িতে মুকুলকে দেখিলাম, সেইদিন অবশ্য তাহার সহিত খুব ভদ্রভাবেই আলাপ করিয়াছিলাম। সেইদিনই আমার মনে গুরুতর সন্দেহ হইল। মানদার ন্যায় প্রাপ্ত যৌবনা সুন্দরীর প্রাইভেট মাস্টার আমাদের মুকুলচন্দ্র ! আমি খুব সতর্ক ও গোপনে তাহাদের আচার ব্যবহারের প্রতি লক্ষ রাখিতে লাগিলাম। প্রায় মাসাধিক কাল তাহাদের বাড়িতে থাকিয়া পরে বোর্ডিং-এ গিয়াছিলাম। এই সময়ের মধ্যেই জানিতে পারিলাম যে মানদার কুমারীধর্ম অক্ষত নাই। মুকুলই তাহার গুপ্ত প্রণয়ী। দ্বিতীয় পক্ষের যুবতী পত্নীর প্রেমে মত্ত মানদার পিতার অন্য কোন দিকে লক্ষ করিবার অবকাশ নাই। যদি না জানিতাম যে মানদা পতিতা হইয়াছে, তাহা হইলে হয়ত মানদার সর্বনাশ করিবার প্রবৃত্তিই আমার প্রাণে জাগিত না। মানদার অসামান্য সৌন্দর্য এবং যৌবনের প্রথম উন্মেষে তাহার পরিপূর্ণতা আমাকে আকর্ষণ করিলেও সে নিজের সঙ্গে সম্পর্কিত বলিয়া আমি খুব সম্ভব আপনাকে সম্বরণ করিয়াই চলিতাম, যদি না জানিতাম যে সেই সৌন্দর্য মুকুল উপভোগ করিতেছে। একজনের নিকট যে আত্মদান করিয়াছে আমার নিকটও সে সহজ লভ্য, এই জ্ঞানই আমাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। মানদা কিন্তু মুকুলের সঙ্গে তাহার সম্পর্কের কথা একেবারেই চাপিয়া গিয়াছে।

"মানদা বলিয়াছেন, আমার সঙ্গে রমেশদার প্রণয়ের কথা মুকুলদার নিকট গোপন ছিল না—এই উপলক্ষে তাঁর নূতন কবিতার বই রচিত হইয়া গেল।" গোপন ছিল না একথা সত্য, কিন্তু কবিতা রচনার কথা আমি ঠিক বলিতে পারি না। গোপন ছিল না, তাহার কারণ এই যে মুকুলের প্রেমে তখন ভাটা ধরিয়া আসিয়াছিল। মানদার বন্ধু কমলার প্রতি তাহার আকর্ষণ বাড়িয়া উঠিয়াছিল এবং কি করিয়া সে মানদার কবল হইতে অব্যাহতি পাইয়া, কমলা লাভের জন্য সর্বপ্রযত্নে চেষ্টিত হইতে পারে তাহারই সুযোগ খুঁজিতেছিল। সুতরাং আমি যখন আসরে নামিলাম, তখন সে দুঃখিত না হইয়া স্বস্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল এবং পূর্ব শত্রুতা তৎকালের জন্য বিস্মৃত হইয়া মানদাকে লইয়া আমার পলায়নের সাহায্য করিয়াছিল।

মানদা আমার নামে চোর অপবাদ দিয়াছে ইহাও আর একটি মিথ্যা কথা। আমি অফিসের ক্যাস ভাঙিয়া টাকা লইয়া যাই নাই। পিসিমার প্রদত্ত ও সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া

যে তিন হাজার টাকা ব্যাঙ্কে রাখিয়াছিলাম তন্মধ্যে হাজার টাকা উঠাইয়া সেই টাকা খরচ করিয়া আমি মানদাকে লইয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেছিলাম। কমলা যে পত্র মানদাকে লিখিয়াছিল, তাহা পরে আমি জানিতে পারিয়াছিলাম যে উহা মুকুলেরই কারসাজি। মুকুল ওই প্রকার মিথ্যা কথা কমলার নিকট বলায়, তাহা বিশ্বাস করিয়া ওই পত্র লিখিয়াছিল।

মানদাকে ছাড়িয়া আসিলাম কেন, সে সম্বন্ধেও মানদা মিথ্যা লিখিয়াছে। আমি যে চিঠি লিখিয়া মথুরায় তাহাকে ফেলিয়া পলায়ন করি বলিয়া সে প্রকাশ করিয়াছে তাহাও সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। ওই চিঠিখানা আমাকে লোকচক্ষে হীন করিবার জন্য শ্রীমান মুকুলচন্দ্রের ওকালতি সেরেস্তা হইতে রচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। [দ্র. পৃ-৪৬] আমি লম্পট হইলেও এমন পাষণ্ড ছিলাম না যে একটি রমণীকে বিপদে ফেলিয়া চলিয়া আসিব।

প্রকৃত পক্ষে মথুরায় যেদিন মানদা কমলার পত্র পাইয়া আমাকে চোর জোচ্চোব ইত্যাদি বলিয়াছিল, তার পরদিন হইতেই তাহার সহিত আমার ছাড়াছাড়ি হয়। নেশার মুখে মানদার ওই প্রকার মিথ্যা গালাগালিতে আমি উত্তেজিত হইয়া মানদাকে দু'এক ঘা বসাইয়া দিয়াছিলাম একথা সত্য, কিন্তু আমি লাথি মারি নাই। পরদিন অনুতপ্ত হইয়া আমি তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনাও করিয়াছিলাম কিন্তু সে আমাকে বলিয়াছিল—"আমি আর তোমার মুখ দেখতে চাই না। আমি নিজের পথ নিজেই বেছে নেবো—"

আমি তাহাকে অনেক বুঝাইলাম কিন্তু সে কিছুতেই আমার সঙ্গে থাকিতে চাহিল না, বাধ্য হইয়া আমি তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া আসিলাম।

আমি কলিকাতাতেই ফিরিয়া আসিলাম। একটা মেসে থাকিয়া চাকুরির চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু ভাগ্যে চাকুরি মিলিল না। ব্যাঙ্কে যে পাঁচশত টাকা ছিল তাহার অধিকাংশ এই চাকুরির চেষ্টায় খরচ হইয়া গেল। শুধু চাকুরির চেষ্টায় বলিলে অন্যায় বলা হইবে—আমি তখন রীতিমত মাতাল ছিলাম। দৈনিক মদ ছাড়া চলিত না। পূর্ব-পরিচিত দু'চারটি বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়াতে তাহাদিগকে লইয়া মাঝে মাঝে মজলিস, বেশ্যালয়ে গমন প্রভৃতিও চলিতে লাগিল।

এই সময় আমাদের গ্রামে ভীষণ কলেরার প্রাদুর্ভাব হইল। আমাদের গ্রামের বহুলোক এই ভীষণ ব্যাধির আক্রমণে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আমার বাড়িতে প্রথম আমার মাতাঠাকুরাণী, তারপর আমার স্ত্রী, একটি বোন এবং ছোট ভাইটি মৃত্যুমুখে পতিত হইল। দশ দিনের মধ্যে আমার গৃহ শ্মশানে পরিণত হইয়া গেল। সংসার বন্ধন বলিতে আমার কিছু রহিল না। একটি মাত্র বিধবা ভগ্নীকে দাদার বাড়িতে রাখিয়া আমি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

দশদিনের ভিতর এই প্রকার ভীষণ আঘাত পাইয়া আমি কেমন যেন হইয়া গেলাম। মানসিক অশান্তি ভুলিবার জন্য কেবলই বেশ্যালয়ে পড়িয়া মদ খাইতে লাগিলাম। জমি

বাড়ি আবার গাঙ্গুলি মহাশয়ের নিকট রেহানে আবদ্ধ রাখিয়া টাকা আনিলাম। এই সময় আমি একপ্রকার পাগল হইয়াছিলাম, চৈতন্য হারাইয়াছিলাম। বোধ হয় দুই তিন বৎসর এইভাবে চলিবার পর যখন আমার চৈতন্য হইল, দেখিলাম আমি পথের ভিখারি হইয়াছি।

ভিখারি হইলাম কিন্তু মদ ছাড়িতে পারিলাম না। নানা স্থানে কাজকর্মের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ঠিকা কেরানিগিরি মাঝে মাঝে জুটিত, আবার কিছুদিন জুটিত না। বন্ধুবান্ধবগণের কাহারও কাহারও নিকট হাওলাত চাহিয়া কিছুদিন চলিল, তারপর হাওলাতও মিলিত না! বিলাতি মদের পরিবর্তে স্বদেশি 'ধান্যেশ্বরীর' আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। অবশেষে এমন হইল তাহাও জুটিত না, তখন সস্তার এক পয়সার নেশা গঞ্জিকাই সম্বল হইয়া দাঁড়াইল।

বড় ঘরের কথা

দুরবস্থার চরম অবস্থায় পড়িয়াছিলাম, এমন সময় হঠাৎ আমার ভাগ্যাকাশ সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। একদিন কাগজে একটি বিজ্ঞাপন দেখিলাম—

"Wanted a smart man for confidential works, should be intelligent, up to date and obedient. Pay Rs. fifty Per month, besides free board and lodging. Apply to Box No. 2930 Statesman.

একখানা দরখাস্ত করিলাম। অবশ্য এমন দরখাস্ত অনেকই করিয়াছি। কিন্তু কোনটারই উত্তর পাই নাই। হঠাৎ ইহার একটা উত্তর পাইলাম। দর্জিপাড়া অঞ্চলের এক এটর্নির (তাঁহার নাম আমরা য়ক্ষ বাবু বলিব) নাম স্বাক্ষরিত একখানা পত্র পাইলাম, তাহাতে তিনি আমাকে তার পর দিন রাত্রি নয়টার সময় দেখা করিতে লিখিয়াছেন। যথা সময়ে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। সুসজ্জিত কক্ষে বাবু একাকী বসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে বাবু নেশা করিয়াছেন। কণ্ঠস্বর ঈষৎ জড়িত, চক্ষু দুটি প্রকাণ্ড দেখিয়া বুঝিলাম কেবলমাত্র আমোদ আরম্ভ হইয়াছে। বাবুর সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে অমি লুকাইয়া সতৃষ্ণ নয়নে ডিকেণ্টারের দিকে তাকাইতে ছিলাম। কারণ অর্থের অভাব হওয়ার সঙ্গে "ধান্যেশ্বরীই" [আগের পৃষ্ঠায় 'গঞ্জিকাই সম্বল হইয়া দাঁড়াইল। আবার এখন ধান্যেশ্বরী' সংকলক] আমার সম্বল হইয়াছিল, ওই প্রকার মদের সঙ্গে অনেক দিন পরিচয় ছিল না।

বাবুর সঙ্গে আমার যে সকল কথা হইল তাহার বিস্তারিত বিবরণ দিবার আবশ্যকতা নাই। এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বাবু আমাকে জানাইয়া দিলেন যে তাঁহার একটি রক্ষিতা আছে তাহাকে তিনি স্বতন্ত্র স্থানে রাখিয়াছেন, আমাকে তথায় থাকিতে হইবে। সেখানে পাচক ব্রাহ্মণ ও চাকর আছে, সেইখানেই আমার খাওয়া চলিবে। বাজার করা, রক্ষিতাটির আদেশ অনুসারে জিনিসপত্র ক্রয় করিয়া দেওয়া, এক কথায় বাজার সরকারের কার্য আমাকে করিত হইবে। সর্বোপরি গো পনে গোপনে লক্ষ রাখিতে হইবে যে অন্য কেহ তাহার মাথায় হাত বুলাইতে চেষ্টা করে কি না। আমার তখন এমন অবস্থা যে আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে এই ঘৃণিত কার্য করিতেই প্রস্তুত হইলাম।

বলা বাহুল্য, বাবু একেবারে সোজাসুজি ভাবে এই প্রস্তাব আমার নিকট উপস্থিত করেন নাই ; আমাকে অনেক জেরা করিয়া আমার পূর্ববর্তী জীবনের অনেক সংবাদ বাহির করিয়া লইয়া, তাহার পর ঘুরাইয়া কথাটি উপস্থিত করিয়াছিলেন। যখন কথাবার্তা স্থির হইল তখন বাবুর নেশা বেশ জমিয়াছে। কারণ কথাবার্তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মদও চালাইতে ছিলেন। কথাবার্তা শেষ হইলে তিনি একটি গ্লাসে মদ ঢালিয়া তাহাতে সোডা মিশাইয়া আমার দিকে সরাইয়া দিলেন এবং বলিলেন—"Let us dirnk for our future good

understanding"—অর্থাৎ "আমরা ভবিষ্যতে পরস্পরের সহিত প্রীতি রক্ষা করিতে পারিব, তাহার সূচনা স্বরূপ এসো একত্র পান করা যাক।" আমি একটু ইতস্তত করিতেছি দেখিয়া হাসিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিলেন—"আর ন্যাকাম কচ্ছ কেন বাবা? লুকিয়ে যে ভাবে বোতলটার দিকে তাকাচ্ছিলে, মনে করেছ আমার চোখে তা পড়েনি—কুচ পরোয়া নেই—খেয়ে ফেল। আমার কাছে যদ্দিন থাকবে অন্নবস্ত্রের অভাব হতে পারে—কিন্তু এ জিনিসটার অভাব হবে না"—বলিয়া নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া গ্লাসটি হাতে করিয়া একটু আড়ালে যাইয়া এক নিশ্বাসে সাবাড় করিয়া আসিলাম। বাবু আবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—"বাঃ বাঃ, এটিকেট দুরস্ত আছে ত!"

তাহার পরিদন হইতেই আমি আমার নূতন কার্যে ব্রতী হইয়া আমার কর্ত্রী ঠাকুরানির সন্দর্শন লাভ করিলাম। জানিতে পারিলাম তাঁহার নাম "কমলা"। এইখানে কমলার একটু বর্ণনা করা প্রয়োজন। আমি যখন তাহাকে দেখিলাম, তখন তাহার যৌবন স্রোতে প্রায় ভাটা ধরিয়াছে, কিন্তু তাহার রূপে, তাহার চলাফেরায়, তাহার চটুল কটাক্ষে এমন একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল, যাহা অনেক পূর্ণ যুবতীর মধ্যেও নাই। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম, কমলা তখন তিনটি কন্যার জননী কিন্তু তাহার স্বাস্থ্য, দেহ-সৌন্দর্য, চমৎকার বেশভূষা এবং সজীবতা দেখিলে কেহই সে কথা অনুমান করিতে পারিত না। তাহার সৌন্দর্য ছিল সেই প্রকার, যে সৌন্দর্য শ্রদ্ধার উদ্দীপক নহে, কেবল মাত্র কামোদ্দীপক।

আমি কাজে ভর্তি হইলাম। কমলা মনিব আমি ভৃত্য, এই সম্বন্ধ রক্ষা করিয়াই আমি কাজ করিতে লাগিলাম কিন্তু আমার মনের ভিতর কামনার অগ্নিতে ইন্ধন প্রদান করিতে লাগিল। সে মাঝে মাঝে এমন ভাবে আমার সহিত কথা বলিত, এমন ভাবে আমার দিকে তাকাইত, যাহাতে আমার মধ্যে একটা ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হইত। আমার যেন মনে হইত, আমিও যেমন কমলাকে চাই, সেও তেমন বোধ হয় আমাকে চায়। কিন্তু আমি সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছিলাম না, কারণ যে চাকুরিটি অনশনে মৃত্যুর দরজা হইতে আমাকে ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহা খুয়াইবার ইচ্ছা ছিলনা। যদি আমি অগ্রসর হই আর কমলা চটিয়া যক্ষ বাবুকে তাহা বলে, তাহা হইলে সেই দিনই আমার চাকুরিটার দফারফা হইবে এই জ্ঞান আমার ছিল।

যক্ষবাবু প্রায় প্রত্যহই আসিতেন, কোন দিন সম্পূর্ণ রাত্রি, কোনদিন নয়টা দশটায় ফিরিয়া যাইতেন। মাঝখানে একবার তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। প্রায় দশদিন আসিতে পারিলেন না। আমি দৈনিক তাঁহার বাড়ি যাইয়া সংবাদ লইয়া আসিতাম। এই সময়ে একদিন রাত্রি প্রায় দশটার সময় আমি আমার ঘরে বসিয়া আছি, আহারাদি শেষ হইয়াছে, এমন সময় কমলা আমাকে ডাকিয়া পাঠাইল। আমি কমলার ঘরে যাইয়া দেখিলাম সে বিছানায় শুইয়া আছে। আমাকে দেখিয়া বলিল—"রমেশ বাবু! আমার মাথাটা বড় ধরেছে, স্থির থাকতে পাচ্ছিনে, কি করি বলুন তো?"

আমি বলিলাম—"ঘরে অডিকলোন আছে কি? মাথায় দিলে বেদনাটা কমে যাবে'খন।"

কমলা দেখাইয়া দিল, একটা ড্রেসিং টেবিলের উপর অডিকলোন ছিল, আমি জল মিশাইয়া তাহা কমলার মাথায় দিতে লাগিলাম এবং বিছানার একপার্শ্বে বসিয়া একখানা পাখা লইয়া আস্তে আস্তে বাতাস করিতে লাগিলাম। কমলা ছটফট করিতে করিতে এক একবার আমার কোলের উপর মাথা রাখিতে লাগিল। সেদিনও সন্ধ্যার সময় অন্যান্য দিনের মত মদ খাইয়াছিলাম। নেশাও বেশ জমিয়াছিল, হিতাহিত জ্ঞান খুব ছিল না, কমলার মাথা ও কপালে অডিকলোন দিতে দিতে আমি জল মুছাইবার ছলে তাহার গাল টিপিয়া দিলাম। কমলা অমনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে কমলা আমাকে যাহা বলিল, তাহাতে আমি বুঝিতে পারিলাম যে আমার মতন সেও আমার প্রতি মনে মনে তীব্র আকর্ষণ অনুভব করিতেছিল। মাথার বেদনা তাহার একটা ভাণ মাত্র। আমাকে প্রলোভিত করিবার জন্যই তাহার মাথা বেদনার সৃষ্টি। আমিও অকপটে স্বীকার করিলাম যে কেবলমাত্র তাহার ভয়েই আমি অগ্রসর হইতে সাহসী হই নাই। নতুবা আমার আগ্রহও তাহার অপেক্ষা কম ছিল না। প্রকাশ্যে আমরা উভয়ই সাবধানতা অবলম্বন করিয়া থাকিতাম।

ইহার কিছুদিন পর তাহার জীবনের কাহিনি আমাকে সম্পূর্ণ খুলিয়া বলিয়াছিল। তাহার ইতিহাস শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম। কমলা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার জমিদার প্রসিদ্ধ ঠাকুর বংশে। তাহার বিবাহও হইয়াছিল ইটালীর [এন্টালী] কোন প্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায় বংশে ; তাঁহার স্বামীটি, এল. মুখার্জি বেশ সুন্দর ও সুপুরুষ ছিলেন। স্বামীর ঔরসে কমলার গর্ভে তিনটি কন্যা হয়। তাহাদের নাম যথাক্রমে সাবিত্রী, সুকৃতি ও সুপ্রভা। পিত্রালয়ে গেলে কমলা মাঝে মাঝে তাহার দাদা মহাশয় সম্পর্কিত জনৈক শিক্ষিত রাজপ্রদত্ত উচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত জমিদারের বাড়িতে বেড়াইতে যাইত। জমিদার মহাশয় কমলাকে স্নেহ প্রদর্শন করিয়া নানাপ্রকার দ্রব্যাদি দিতেন। আত্মীয়ের দান বলিয়া কমলা তাহা লইতে কোন দ্বিধা বোধ করে নাই, তখন সে বুঝিতে পারে নাই যে এই দানের অন্তরালে কোন অসদভিপ্রায় লুক্কায়িত ছিল। কিন্তু একদিন সে তাহা জানিতে পারিল। দাদামহাশয় একদিন তাহার নিকট অসৎ প্রস্তাব করিলেন। কমলা ঘৃণা ভরে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু দাদামহাশয় বলপূর্বক তাহার সতীত্ব নষ্ট করিলেন। তাহার পর নানাপ্রকার প্রলোভনে এবং দাদামহাশয়ের নানাপ্রকার চেষ্টার ফলে সে নিয়মিতভাবে তাঁহার কামনা চরিতার্থ করিয়াছে। এমন কি তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বাগান বাড়িতেও গিয়াছে। কমলার স্বামী জাহাজে স্টোরকিপারের কার্য করিতেন। একযোগে চার পাঁচ মাস কাল অনুপস্থিত থাকিতেন। এই সমুদয় ব্যাপার সেই সময়ই সংঘটিত হইত।

এদিকে নানাপ্রকার কাণাঘুষার ফলে, তাহার স্বামীর মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। একবার বিলাত হইতে আগত জাহাজ হইতে নামিয়াই কমলার পিত্রালয়ে যাইয়া তিনি তাহার

অনুসন্ধান করেন। সেখানে তাহাকে না পাইয়া তিনি ঐ দাদামহাশয়ের নিকট যান। সেখানে যাইয়া তিনি সংবাদ পান যে দাদামহাশয় বাগানবাড়িতে গিয়াছেন এবং কমলাও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে। তাঁহার সন্দেহ তখন দৃঢ়ীভূত হয়। তিনি সরাসরি সেই বাগান বাড়িতে যাইয়া বিনা সংবাদে ভিতরে প্রবেশ করেন এবং উভয়কে একত্র দেখিতে পান। কমলা তখন স্বামীর সহিত চলিয়া আসিতে বাধ্য হয় এবং স্বামীর নিকট হইতে যথেষ্ট তিরস্কার, অবশেষে বিষম প্রহার পর্যন্ত লাভ করে।

কথাটা তখন তাঁহাদের পারিবারিক গন্ডির ভিতরে প্রকাশিত হইয়া যায়। স্বামীর গৃহে কমলার আর স্থান হয় না। ভ্রাতার বাড়িতে বাস করিতে থাকে। তাহার ভ্রাতা যাহার নাম আমরা শ্যামানন্দ বলিব, তিনি ঘৃণায় এবং লজ্জায় পাথুরিয়াঘাটার বাস পরিত্যাগ করিয়া মাক্‌লয়েড স্ট্রীটে উঠিয়া আসেন। অপর ভ্রাতা (?) উৎফুল্ল পাথুরিয়াঘাটার বাড়িতেই থাকেন। ভ্রাতার বাড়িতেও কমলার জীবন দুর্বিসহ হইয়া উঠে। সর্বদা তিরষ্কার গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়। কমলা যখন দাদামহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার বাগান বাড়িতে যাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাঁহার দুটি অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে তিনি কমলার পরিচয় করাইয়া দেন। তাহার একজন আমার বর্তমান মনিব য়ক্ষবাবু, দ্বিতীয়টি কলিকাতার উত্তর অঞ্চলের কায়স্থবংশীয় এক রাজকুমার, তাঁহাকে আমরা কুমার অনঙ্গনাথ বলিয়া উল্লেখ করিব। ইহারা দুইজনই কমলার রূপে আসক্ত হইয়াছিলেন। কমলার ভ্রাতা ম্যাক্‌লয়েড স্ট্রীটে উঠিয়া যাওয়ার পর ইহারা দু'জনই চেষ্টা করিতে লাগিলেন—যাহাতে কমলাকে কুলের বাহির করিতে পারেন। ঝি চাকরানির হাত দিয়ে চিঠিপত্রাদি আদান প্রদান চলিতে লাগিল। কমলাও ভ্রাতার গৃহে একপ্রকার অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব হইতে যোগাযোগ করিয়া বাড়ির দারোয়ানকে সরাইয়া দিয়া য়ক্ষ বাবুর মোটরে একদিন সে গৃহ ত্যাগ করে, তদবধি সে য়ক্ষ বাবুর রক্ষিতা রূপে বাস করিতেছে।

কমলার জীবনের ইতিহাস শুনিয়া মনে অনেক কথাই উদয় হইয়াছিল। যে অপরাধে অপরাধী হইয়া আমি আত্মীয়স্বজনের নিকট ঘৃণিত তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইয়াও রাজা মহারাজা রাজকুমার এটর্নি উকিল দেশনেতা প্রভৃতি আজ সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া শত শত স্তাবক পরিবেষ্টিত হইয়া পূজা পাইতেছে। আমার নিজের অদৃষ্টকেই আমি ধিক্কার দিলাম, তখনও আমার লাম্পট্যের উপর কোন ঘৃণার ভাব আসে নাই ; বরং এই ইতিহাস শুনিয়া মনে মনে একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়াছিলাম এই ভাবিয়া যে—এই সকল বিখ্যাত লোকও যখন এই সব কার্যে ব্রতী তখন আমার আর অপরাধ কি? গল্পে শুনিয়াছিলাম কোন এক পণ্ডিত ধার্মিক গুরুদেব তাঁহার এক মদ্যপ বেশ্যাসক্ত এবং লম্পট শিষ্যকে তাহার এই সকল কুঅভ্যাস পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেছিলেন এবং তাহা না করিলে পরলোকে তাহার অনন্ত নরকভোগ হইবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেছিলেন। শিষ্য অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া গুরুর বক্তৃতা শুনিতেছিল, অবশেষে

জিজ্ঞাসা করিল—"প্রভু—আমাদের পাড়ার মেজবাবু তো খুব মদ খান, আমোদ করেন, তিনিও নরকে যাবেন?" প্রভু উত্তর করিলেন—হ্যাঁ নিশ্চয় যাবে।"

আবার প্রশ্ন হইল—"ও পাড়ার শ্যামা, কেবলা, ফট্‌কে মেধো এরাও তো মদ খায়—এরাও নরকে যাবে?" প্রভু কহিলেন "নিশ্চয়—কোন ভুল নেই।"

শিষ্য আবার জিজ্ঞাসা করিল—"পট্‌লী, খেঁদি, সুহাসিনী, বিমলী এরাও নরকে যাবে?"

প্রভু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"এরা বেশ্যা—এরা নরকে যাবে না তো যাবে কে?"—

শিষ্য তখন লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—"তবেতো নরক গুলজার। স্বর্গে তাহলে কোন শালা যেতে চায়! আমিও নরকেই যাব।"

আমার মনের ভাবও গল্পোক্ত ওই শিষ্যের মতনই অনেকটা হইয়াছিল, একথা বলা যাইতে পারে।

যাহা হউক কমলার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এদিকে কমলার প্রতি য়ক্ষ বাবুব আকর্ষণ যেন কমিয়া আসিতে লাগিল। টাকা পয়সা দিতে তিনি কৃপণতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একই রমণীতে বহুদিন উপগত হওয়ার ফল, লম্পট-স্বভাব-সুলভ ভোগাবসন্নতা (Setiety) তাঁহার আসিয়া পড়িয়াছিল। কমলাও তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল এবং আমার নিকট সে কথা প্রকাশ করিয়াছিল।

আমি ও কমলা অনেক পরামর্শ করিলাম। য়ক্ষ বাবু ছাড়িয়া দিলে কমলার কি দশা হইবে, আমারই বা কি হইবে তাহা লইয়া অনেক আলোচনা হইল। কমলা বলিল—"তোমাকে আমি ছাড়তে পারব না। স্বামী সঙ্গ করেছি লৌকিক প্রথার অনুরোধে। দাদামহাশয় জোর করে আমার সঙ্গ করেছেন, তার সঙ্গে এবং য়ক্ষ বাবুর সঙ্গে থেকেছি স্বার্থের খাতিরে কিন্তু তোমায় আমি ভালবাসি ; এমন ভাল কাউকে বাসিনি, তুমি আমাকে ছাড়তে পারবে না।"

ছাড়িতে আমিও ইচ্ছুক ছিলাম না। কমলার স্কন্ধে ভর করিয়া আমার দিন বেশ সুখেই কাটিতেছিল। মাসিক বেতন ছাড়া যখন যাহা চাহিতাম, কমলার নিকট তাহাই পাইতাম। কিন্তু আমি কমলাকে প্রতিপালন করিব কি করিয়া? কমলাকে লইয়া দারিদ্র্য বরণ করিবার উপযুক্ত নভেলি প্রেম আমার ছিল না। অবশ্য সে কথা তাহাকে বলিলাম না। নাটকীয় ভাষায় আমার প্রেমই জ্ঞাপন করিলাম। শেষ পরামর্শ স্থির হইল যে কমলা সেই কুমার অনঙ্গনাথের স্কন্ধে চাপিতে চেষ্টা করিবে এবং আমাকেও তাহার সঙ্গে রাখিবে। হইলও তাহাই, আমারই হাতে কমলার পত্র পাইয়া কুমার বাহাদুর গোপনে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দুই চার দিন রাত্রিতেও তাঁহার যাতায়াত হইল। আমিই তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া মিলন করিয়া দিলাম। একদিন কমলা চমৎকার অভিনয় করিল। য়ক্ষ বাবু কুমারের আগমন জানিতে পারিয়া তাহাকে মারধর করিয়াছেন এবং আমি তাহার সহায়তা করিতেছি জানিতে পারিয়া আমাকেও জবাব দিয়াছেন—কাঁদিতে কাঁদিতে এই সকল কথা কুমার বাহাদুরকে বলিল। কুমার বাহাদুর সেই দিনই আমাকে নিযুক্ত করিলেন এবং একদিনের ভিতর একটি বাড়ি খুঁজিয়া নানা প্রকার আসবাব দ্বারা তাহা সাজাইবার আদেশ দিয়া

আমাকে একতাড়া নোট দিয়াছিলেন। পরদিনই পাখি যক্ষ বাবুর পিঞ্জর হইতে উড়িয়া গিয়া কুমার বাহাদুরের কুঞ্জে প্রবেশ করিল, পাখির পরিচারক হিসাবে আমিও প্রবেশ করিলাম।

কিছুদিন বেশ চলিল, এই সময় কমলার স্বামীর মৃত্যু হইল। কমলা সে সংবাদ পাইয়া বিশেষ কোন দুঃখ প্রকাশ করিল না, কিন্তু কুমার বাহাদুরের সঙ্গে কমলার বেশি দিন বনিবনাও হইল না। এবারে কমলা যাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, তিনি বাংলা দেশে সুপরিচিত—গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুগৃহীত এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী। তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়া কমলার আসবাব সাজসজ্জা ইত্যাদি সকলই উন্নত হইল। কমলা এখানেও আমাকে সঙ্গে আনিল, এখানকার বাড়িতে কর্মচারীরূপে আমি নিযুক্ত হইলাম, আমাদের মিলনে কোন বাধা হইল না।

কমলার এবারে আশ্রয়দাতা যিনি, আমরা তাঁহার নাম সংক্ষেপে এই আখ্যায়িকায় বিভাষচন্দ্র বলিয়া উল্লেখ করিব। কমলাকে তিনি প্রকৃতই খুব ভালবাসিতেন। কমলার পূর্ব প্রণয়ীগণের মত ইহার ভালবাসা ক্ষণস্থায়ী হয় নাই এবং ইনি কেবল মাত্র কমলাকে লইয়াই ব্যস্ত না থাকিয়া তাহার কন্যাগুলিকে মানুষ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কমলা নানা প্রকার কলা-কৌশল করিয়া কন্যা তিনটিকে তাহার নিকটে আনিয়াছিল। কমলা সাধারণ বেশ্যার ন্যায় থাকিত না। আধুনিক শিক্ষিতা প্রগতিপ্রাপ্তা মহিলা হিসাবে থাকিত। যখন যেখানে বাড়ি লওয়া হইয়াছে, তাহা তাহার নামেই লওয়া হইত। তাহার প্রণয়ী যাঁহারা আসিতেন, তাঁহারা বন্ধু হিসাবে আসিতেন, প্রকাশ্যে কেহ কোন দোষণীয় ব্যবহার দেখিতে পাইত না। কন্যা তিনটিকে আনিয়া তাহাদিগকে ডায়সেসন স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল। বিভাষচন্দ্র তাহার সমস্ত ব্যয় এবং মেয়েদের বোর্ডিংএ থাকার সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করিতে লাগিলেন। রবিবারের ছুটিতে মেয়েরা বাড়িতে আসিত।

বিভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার অনেক বন্ধু-বান্ধব কমলার বাড়িতে বেড়াইতে আসিতেন, তাহার মধ্যে জনৈক দেশনেতাও আসিতেন। ইনি প্রকৃত ব্যাপার বুঝিয়াছিল, তাহাদের পরবর্তী ব্যবহারে ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। প্রসিদ্ধ নেতার নাম আমরা মনতোষ বাবু বলিব।

পূর্বেই বলিয়াছি, কমলার মেয়ে তিনটি রবিবারের ছুটিতে বাড়িতে আসিত। ওই সময় বিভাষচন্দ্রের কোন বন্ধু-বান্ধব উপস্থিত থাকিলে মেয়েরা তাঁহাদের সঙ্গে গল্প গুজব করিত। মনতোষবাবু সাবিত্রীর সহিত একটু বেশি ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করিতে লাগিলেন। ইহা আমার এবং কমলার চক্ষু এড়াইল না ; কিন্তু বিভাষচন্দ্র কিছু টের পাইলেন না। কমলার ইহাতে আপত্তি লক্ষ করিলাম না, বরং সে উভয়ের নির্জনে মিশিবার সুযোগ ঘটাইয়া দিতে লাগিল। পশ্চাৎ জানিতে পারিলাম কমলা মনতোষবাবু হইতে যথেষ্ট টাকা লইয়া তাহার বিনিময়ে কন্যার রূপ-যৌবন বিক্রয় করিয়াছিল। সাবিত্রীর সঙ্গে মনতোষবাবুর মিলনের সুযোগ করিয়া দেওয়ার জন্য কমলা তাহাকে স্কুল ছাড়াইয়া বাড়িতে আনিল। কিছু দিন পর মনতোষবাবুর অভাবে কমলার চেষ্টা রহিল কন্যার জন্য একটি শিকার সংগ্রহ করা।

এখানে একথা বলা সঙ্গত যে, কন্যার সম্বন্ধে এই ব্যবহারের প্রতিবাদ আমি গোপনে কমলার নিকট না করিয়া পারি নাই। চরিত্রহীন হইলেও কন্যার সতীত্বের বিনিময়ে মাতার অর্থ উপার্জন, এই ব্যাপারটি আমার নিকট বড়ই বিসদৃশ এবং ঘৃণিত মনে হইয়াছিল। কিন্তু কমলা আমার কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছিল। কমলার প্রতি আমার যে আকর্ষণ, আসঙ্গ-লিপ্সাই তাহার একমাত্র কারণ, তাহাতে ক্রমেই ভাটা পড়িয়া আসিয়াছিল। এই ব্যাপারে তাহার প্রতি একটা ঘৃণার ভাব হওয়ায় আমার সেই আকর্ষণ যেন আরও একটু শিথিল হইয়া আসিল।

এমন সময় কমলার চরিত্রের আর একটা দিক—এক অভূতপূর্ব ব্যাপার আমার চোখে পড়িল। দুইটি মুসলমান নেতার সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যাপার লইয়া বিভাষচন্দ্রের হঠাৎ গুরুতর মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়া উঠিল। সংবাদপত্রের স্তম্ভ হইতে এই মনোমালিন্যের ব্যাপার আমরা কতকটা জানিতে পারিয়াছিলাম। বিভাষচন্দ্রের মুখেও কিছু কিছু জানিতে পারিয়া কমলা আমাকে বলিয়াছিল।

তাহার পর এই দুইটি মুসলমান নেতার লোক যখন বিভাষচন্দ্র উপস্থিত না থাকিতেন তখন আসিয়া কমলার সহিত দেখা করিতে লাগিলেন। কমলার সঙ্গে গোপনে তাঁহাদের কি কথাবার্তা হইতে লাগিল। কমলা সে সব কথা আমার নিকটও গোপন রাখিত। উক্ত দুই একজন মুসলমানের সহিত দুই চার দিন অন্য একজন মুসলমান আসিলেন—শুনিলাম তাঁহার নাম মৌলবী আবু হোসেন খাঁ, বনাম গারনার কি এমনই একটা ইংরাজি নাম। তিনি পেটেণ্ট ঔষধের ব্যবসা করিতেন। গর্ভ নিবারক এবং অন্যান্য অনেক প্রকার ঔষধ তাহার ছিল। ইতিমধ্যে কমলা দুই চার দিন কোথাও বাহির হইয়া গেল, বাড়ির গাড়ি না লইয়া ভাড়াটে ট্যাক্সি ডাকিয়া। এই সকল রকম-সকম দেখিয়া আমার খুব সন্দেহ হইতে লাগিল। আমি কমলাকে অনেক জেরা করিলাম। কমলা কোন উত্তর দিল না, কেবল হাসিতে লাগিল। শেষটায় এই বলিয়া আমাকে থামাইয়া দিল যে—সময় হইলে সবই জানতে পারবে। যাতে আর কারোর উপর নির্ভর না করে তোমায় আমায় স্বাধীনভাবে থাকতে পারি তারই ব্যবস্থা কচ্ছি। আমি আর কিছু বলিতে সাহস করিলাম না।

ইহার কিছুদিন পর এক রবিবার দুপুরবেলা বিভাষচন্দ্র কমলার শয়ন ঘরে ঢুকিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় হঠাৎ উপরের ঘরে একটা গোলমাল শুনিতে পাইয়া আমি দৌড়াইয়া উপরে গেলাম। যাইয়া দেখি বিছানার একপার্শ্বে বিভাষচন্দ্র বিস্ময়াবিষ্টের ন্যায় বসিয়া আছেন, অপর পার্শ্বে কমলা মাথা হেঁট করিয়া আছে, সম্মুখে গারনার ও অন্য কয়েকজন লোক ও একজন মৌলবী এবং আরও দুইজন মুসলমান ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছেন। আমি যাইয়া শুনিতে পাইলাম গারনার বলিতেছে—'আপনারা প্রমাণ থাকুন, বিভাষচন্দ্র আমার বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত অবৈধ সহবাস করিয়াছেন। আমি এজন্য আদালতে বিচারপ্রার্থী হইব।—"

আমি শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। কমলা গারনারের বিবাহিতা স্ত্রী? আমি ব্যাপার

কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। উপস্থিত দুইজন মুসলমানের মধ্যে একজন বলিলেন—"ইনি যে আপনার বিবাহিতা স্ত্রী তাহার প্রমাণ কি? " গারনার উত্তর করিল—"এই দেখুন প্রমাণ।" এই বলিয়া বিবাহের যে দলিল হইয়াছিল তাহাও সকলকে দেখাইল।

গারনারের দল চলিয়া গেল, তারপর বিভাষচন্দ্রও চলিয়া গেলেন। কমলার সহিত আর একটি কথাও তিনি বলিলেন না এবং সেই ভবনে তাঁহার সেই শেষ পদার্পণ।

ইহার পর যে সকল ঘটনা ঘটিল তাহা আমি কমলার নিকটই জানিতে পারিয়াছিলাম। বিভাষচন্দ্রের উচ্চ পদ-মর্যাদা, দেশব্যাপী খ্যাতি এবং বংশ গৌরব রক্ষা করিবার জন্য তিনি বাধ্য হইয়া দশ হাজার টাকা দিয়া প্রকাশ্য আদালতে এই ব্যাপার যাহাতে না গড়ায় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এ পক্ষের দাবী ছিল এক লক্ষ টাকা ; কিন্তু খুব বড় এক ব্যারিস্টার মাঝে পড়িয়া দশ হাজারে রফা করিয়া দেন। শুনিয়াছি, এই টাকাটা পূর্বোক্ত ওই মুসলমান, মৌলবী গারনার এবং কমলা ভাগ করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু কমলা যে আশা করিয়া এই ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়াছিল তাহার সে আশা পূর্ণ হইল না। এই টাকার অতি সামান্য অংশই মাত্র সে পাইয়াছিল। কমলার জাতও গেল পেটও ভরিল না। বিভাষচন্দ্রের আশ্রয়ও হারাইল, স্বাধীনভাবে থাকিবার উপযুক্ত যে অর্থের আশা সে করিয়াছিল তাহাও পাইল না। গারনারের দ্বারা ভবিষ্যতে আর ওই প্রকার মিথ্যে দাবী যাহাতে না হয় তজ্জন্য একখানা "তালাক নামা" লেখাইয়া লওয়া হইয়াছিল। পাপের ফল গারনারকে পরে ভুগিতে হইয়াছিল। যাঁহারা সংবাদ-পত্রের নিয়মিত পাঠক তাঁহারা মৌলবীর মোকদ্দমার খবর রাখেন। মৌলবী গারনার বহুদিনের জন্য কয়েকবার কারাবরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহার পর কমলার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল। রেস্ খেলার বাতিকই তাহার সর্বনাশের প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইল। গোলদিঘি অঞ্চলের জনৈক ডাক্তার এবং পর্যটকের ভ্রাতা—যিনি আংটি বাবু বলিয়া খ্যাত, তাঁহার রক্ষিতা হিসাবে সে কিছুদিন রহিল ; কিন্তু কমলার খরচ যোগান আর প্রবাদোক্ত শ্বেতহস্তী পালন করা প্রায় এক প্রকার সমস্যাই ছিল। সুতরাং কিছুদিন পরে এই বেল্লিক বাবু পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন বলিলে ঠিক বলা হইল না, কমলাই তাহাকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে বাধ্য করিল—কারণ তাহার পোষাইতেছিল না। ইহার পর কমলা এক নূতন ফন্দি আবিষ্কার করিল। টেলিফোনে এক এক দিন এক একজন কাপ্তেন গোছ লোককে ডাকিয়া, তাহার মনোরঞ্জন করিয়া কিছু টাকা আদায় করিয়া লইত।

এই সময়ে একদিন কমলার বাড়িতে হঠাৎ পদ্মরঞ্জন সরকারের আবির্ভাব হয়। পদ্মবাবু সন্ধ্যার পর কমলার গৃহে আসেন। হঠাৎ পদ্মবাবুর সঙ্গে সাক্ষাত হওয়ায় তিনি ও আমি উভয়েই বিস্ময়াপন্ন হইয়া পড়িলাম ; কারণ আমরা পূর্ব-পরিচিত ছিলাম। ইতিপূর্বে পাঠকগণকে পদ্মরঞ্জন বাবুর কিছু পরিচয় দিয়াছি ; কিন্তু এই সময়ে তিনি আর সেই অখ্যাতনামা পদ্ম সরকার নহেন। এখন তিনি অনেক উচ্চপদস্থ। পদ্মরঞ্জনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের কাহিনি এবং তাঁহার কীর্তিকাহিনি স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ে পাঠকগণকে বলিব। পদ্মরঞ্জনের দুর্ভাগ্য কমলা তাহাকে আমল দিল না,—'অপমান করিয়া তাড়াইয়া

দিল। আমি যখন কমলাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম এবং বেশ একটা মোটা দাও ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য তাহাকে আহম্মক বলিয়া ঠাট্টা করিলাম, কমলা তখন বলিল—"আমি বাজারের বেশ্যা নই, ওসব সরকার ফরকার আমার কাছে আসতে পারবে না।" এই অবস্থাতেও কমলার আভিজাত্য গৌরব দেখিয়া আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না। ইহার পর কমলা ইটালী অঞ্চলের একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী, যাঁহার নাম আমরা কানাকড়ি ঘোষ বলিব, তাঁহার রক্ষিতা হয়। কয়লা ব্যবসায়ী কানাকড়ি বাবু একটি স্বতন্ত্র বাগান বাড়িতে দারোয়ান প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়া খুব জাঁকজমকে কমলাকে রাখিলেন—বলা বাহুল্য আমি সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। কিন্তু কিছুদিন পর আংটিবাবু, যাঁহাকে কমলা তাড়াইলেও তিনি কমলার মোহ ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তিনি কয়েজন বন্ধু এবং অন্যান্য লোক লইয়া বাগান বাড়িতে প্রবেশ করেন। কানাকড়ি বাবুও কয়েকজন বন্ধুসহ তখন বাগান বাড়িতে ছিলেন। উভয় পক্ষে ভীষণ মারমারি হয় এবং থানায় উভয় পক্ষই ডায়েরি করেন। উভয় পক্ষেই কলিকাতার সম্ভ্রান্ত বংশের অনেক লোক ছিলেন। পরিশেষে কোন বিশিষ্ট ইংরেজ ভদ্রলোকের মধ্যবস্থায় ওই গোলামাল আর আদালত পর্যন্ত গড়াইতে পারে নাই। ওই ইংরেজটি নাকি 'স্যার' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কমলার ইতিহাস আমি আর বাড়াইতে চাই না। তাহার কন্যাদের সম্বন্ধে গোটা কতক কথা বলিয়াই আমি এই কাহিনি শেষ করিব। কমলার ইচ্ছা—তিনটি কন্যাকেই তাহার কাছে টানিয়া লইয়া, তাহাদের উপার্জন দ্বারা নিজের বিলাসিতার ব্যয় নির্বাহ করে। সাবিত্রীকে সে সেই পথে লইয়াও ছিল। তাহার পর সাবিত্রীকে কমলা একজন দেশিয় বৃদ্ধ এবং ধনী খ্রিস্টানের সঙ্গে কল কৌশল করিয়া বিবাহ দেয়। তাহার আশা ছিল বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা হইলে, সে ভার্যার মাতা হিসাবে বৃদ্ধ জামাতার সিন্ধুকের উপর তাহার অপ্রতিহত ক্ষমতা থাকিবে। কিন্তু বিবাহের পরে দেখা গেল, কমলা হিসাবে ভুল করিয়া বসিয়াছে। জামাতা বাবাজি শাশুড়িকে মোটেই আমল দিতে ইচ্ছুক নহেন। তখন সাবিত্রীকে ফুসলাইয়া বাহির করিয়া আনিয়া সে করপোরেশন স্ট্রীটে অনিল মারের সুড়োর বাগানে কিছু দিন রাখিল। জামাতা বাবাজিও ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। তিনি কমলার নামে মোকদ্দমা করিলেন। কিন্তু মোকদ্দমায় কমলাকেই হারিতে হইল। সাবিত্রী তাহার স্বামীর ঘরে ফিরিয়া গেল। ইহার পরও কমলা আর একবার সাবিত্রীকে আনে ; কিন্তু বৃদ্ধ খ্রীস্টান ওয়ারেণ্ট দ্বারা তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়। বার বার কমলার এই সকল ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া বৃদ্ধ শেষে "যঃ পলায়তি সঃ জীবতি" নীতির অনুসরণ করিতে বাধ্য হয় এবং কলিকাতার বাস উঠাইয়া স্ত্রীকে লইয়া মধুপুর চলিয়া যায়। সেখানেই তাহারা এখনও বাস করিতেছে।

গোবরেও পদ্ম ফুল ফুটে—দৈত্যকুলেও প্রহ্লাদ জন্মিয়া থাকে। কমলার ছোট কন্যাটি হইয়াছিল তাহাই। সে অত্যন্ত তেজস্বিনী ছিল। কমলা বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাকে বিপথে টানিতে পারে নাই। মাতার চেষ্টার সঙ্গে আরও বহু কাপ্তেনবাবুর চেষ্টা তাহার সর্বনাশের

জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল। কিন্তু সে আপন তেজস্বীতায় নিজের চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। কলিকাতার কয়েকজন অল্প-বয়স্ক ব্যারিস্টার তাহার নিকট অসৎ প্রস্তাব করিয়া পাদুকা প্রহারে আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। ইটালী অঞ্চলের জনৈক রায়বাহাদুর, যাঁহার নাম আমরা দেবেশচন্দ্র বলিয়া উল্লেখ করিব, তাঁহার উপযুক্ত লায়েক পুত্র একদিন প্রাচীর টপকাইয়া প্রেম করিতে যাইয়া কানাকড়ি ঘোষের হাতে বেদম প্রহার লাভ করেন। পরে পরিচয় পাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কন্যাটি এই সকল অত্যাচারে অতিষ্ঠা হইয়া মাতৃগৃহ পরিত্যাগ করে এবং তাহার পিতৃবংশের বন্ধু, জনৈক কায়স্থ-বংশীয় সচ্চরিত্র যুবকের সঙ্গে বিবাহিত হয়। এই ব্যক্তি মাসিক দেড়শত টাকা বেতনে চাকুরি করিত। অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। কায়স্থ কন্যা বলিয়া পরিচয় দিয়াই যুবক নব বধূকে বাড়িতে লইয়া যায়। যুবকটির মাতা বধূর গৃহকার্য এবং চরিত্রে মুগ্ধা হইয়াছিলেন। বধূর গুণে প্রতিবেশীরা পর্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু তাহার অদৃষ্টে এই সুখ শান্তি, এই আদর যত্ন, স্বামীর এই প্রাণভরা ভালাবাসা বেশি দিন ভোগ করা ঘটে নাই। সকলকে কাঁদাইয়া যক্ষ্মা রোগে সে অকালে প্রাণ বিসর্জন করে।

কমলার অপর কন্যা সুকৃতির কথা এখন বলিব। এই কন্যাটির পরিচয় দিবার পূর্বে আর এক ব্যক্তির পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। ইনি দক্ষিণ কলিকাতার সম্ভ্রান্ত অর্ধ-ব্রাহ্মণ বংশের এক চরিত্রবান যুবক। কমলার স্বামী ও পিতার বংশের সহিত ইহার বন্ধুত্ব ছিল। ইনি মাঝে মাঝে কমলার খোঁজ খবর লইতেন। ইহার চেহারাটি যেমন সুন্দর, স্বভাবটিও তেমনি মধুর এবং নম্র ছিল। আমি ভদ্রলোকের ছেলে, এম. এ. পাশ করিয়া নিতান্ত অভাববশত এই চাকুরি করিতেছি মনে করিয়া ইনি আমার সঙ্গে একটু সহানুভূতিসূচক ব্যবহার করিতেন। কমলা যখন অভাবে পরিত, তখন ইনি তাহাকে অনেক টাকা ধার বলিয়া দিতেন, প্রকৃত পক্ষে তাহা দান, ধার নহে। কমলার কন্যা সুকৃতিও ডায়সেসন স্কুলে পড়িত। সুকৃতি যখন জুনিয়র কেম্‌ব্রিজ পাশ করে, তখন খরচ চালান অসম্ভব বলিয়া কন্যা দ্বারা অর্থোপার্জন করিবার ইচ্ছায় কমলা তাহাকে পড়া ছাড়াইয়া আনিতে চায়, কিন্তু সুকৃতি এই যুবককে তাহার পড়ার খরচ চালাইতে অনুরোধ করায় তিনি সেই খরচ চালাইতে ছিলেন। এই যুবকটি যেমন অর্থশালী, তেমনি কবি ও সুসাহিত্যিক ছিলেন। কয়েকখানা মাসিক ও সাপ্তাহিক কাগজের তিনি সম্পাদকতা করিয়াছেন। সুন্দর সুন্দর কবিতা তিনি লিখিতে পারেন [?]। সুকৃতি তাঁহার কবিতার খুব ভক্ত ছিল। সুকৃতি অসামান্য সুন্দরী। তাহার শরীরের রং ইউরোপীয় মহিলাদের ন্যায়। কলিকাতার কয়েকটি একজিবিশনে (কার্নিভ্যাল এবং ফ্যান্সি ফেয়ার) সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় সে অনেকবার প্রথম পুরস্কার পাইয়াছে। সুকৃতির ফটো-চিত্র পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল, তাহা দেখিলেই বোঝা যাইবে যে সে নিখুঁত সুন্দরী। এই যুবক—যাহাকে আমরা কবি বলিয়া উল্লেখ করিব—প্রকৃতপক্ষে সচ্চরিত্র ছিলেন এবং সুকৃতিকে ভগ্নীর ন্যায় ভালবাসিতেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল সুকৃতি লেখাপড়া শিখিয়া উপযুক্ত পাত্রে বিবাহিত হয়।

কিন্তু কমলার ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। সে হঠাৎ একদিন সুকৃতিকে কলেজ হইতে নাম কাটাইয়া বাড়িতে লইয়া আসে এবং কয়েকদিন পরেই কোন একজন কাপ্তেন বাবুর সহিত তাহাকে জুটাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করে, সুকৃতি তাহাতে অস্বীকৃত হয়। কমলাও কাঁদাকাটি, লোভ প্রদর্শন, পরিশেষে উৎপীড়ন করে, কিন্তু কিছুতেই মেয়ের মন টলাইতে পারে নাই। কমলার অপর দুই কন্যার প্রতি ব্যবহারেই তাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা কমিয়া আসিয়াছিল, পূর্বেই তাহা বলিয়াছি। এই সুন্দরী কন্যাটিকেও নষ্ট করিবার চেষ্টা দেখিয়া মর্মাহত হইলাম এবং কমলার সহিত এই ব্যাপার লইয়া আমার বেশ একটা ঝগড়া হইয়া গেল। সুকৃতি সেই ঝগড়ার ফলে বুঝিতে পারিল যে আমি তাহার পক্ষে। তখন গোপনে কবিকে সংবাদ দিলাম। কবি আসিয়া তাহাকে অনেক বুঝাইলেন, পুনরায় মেয়েকে কলেজে দিতে জেদ করিলেন। কিন্তু কমলা তাঁহার কোন কথা শুনিল না। কবির নিকট প্রাপ্ত এতদিনের উপকার বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে এমন অপমানজনক কথা শুনাইয়া দিল, যাহাতে কবি তৎক্ষণাৎ সেই বাড়ি ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কিছুদিন এই ভাবে চলিবার পর কমলার উৎপীড়নের মাত্রা বাড়িয়া গেল। সে প্রত্যহ সুকৃতিকে মারধর করিতে লাগিল। সুকৃতি যাহাতে পলাইতে না পারে সেজন্য কমলা একজন হিন্দুস্থানি ঝি নিযুক্ত করিল। সুকৃতি আমার দ্বারা কবির নিকট গোপনে তাহার অবস্থা বর্ণনা করিয়া আর একখানা পত্র পাঠাইয়া দিল। তাহার শেষ অংশে লেখা ছিল, ‘‘আমাকে এই নরক হইতে রক্ষা করুন।” কবি আবার আসিলেন, কমলাকে আবার বুঝাইলেন। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি আটটা পর্যন্ত অনেক তর্কবিতর্ক হইল, কবি অনেক অপমানসূচক কথা সহ্য করিলেন, অবশেষে বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় আমাকে বলিলেন—‘‘আমি আর কি করিতে পারি বলুন?” আর বিলম্ব করিবার সময় নেই,—আমার বন্ধু গ্রে স্ট্রীটের অমুক দেবের বাড়িতে আজ নিমন্ত্রণ, সেখানে এখনই যেতে হবে। আর একদিন এসে আবার চেষ্টা করব। যে বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণের কথা বলিলেন তাহা আমাদের বাড়ি হইতে বেশি দূরে নহে। আমি কবিকে বিদায় দিয়া সুকৃতি যে ঘরে ছিল তথায় গিয়া তাহাকে সকল কথা বলিলাম।

রাত্রি প্রভাত হইলে সুকৃতিকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ক্রোধে কমলা যেন রাক্ষসীর মূর্তি ধারণ করিল, নিজে গাড়ি লইয়া নানাস্থানে খুঁজিতে বাহির হইল। আমাকে কবির বাড়িতে অনুসন্ধান করিতে পাঠাইল।

আমি কবির বাড়িতে যাইয়া তাঁহার নিকট যে কথা শুনিলাম তাহাতে বিস্মিত ও আনন্দিত দুইই হইলাম। তিনি বলিলেন যে, সে দিন দেব-বাবুর বাড়ির নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া গাড়িতে উঠিতেই দেখেন গাড়ির মধ্যে সুকৃতি বসিয়া আছে।

তিনি সুকৃতিকে তাহার মাতার নিকট লইয়া যাইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু মা'র বাড়িতে ফিরিয়া না যাওয়ায় তিনি বাধ্য হইয়া দমদমের বাগান বাড়িতে রাখিয়াছেন। সুকৃতি এক কাপড়ে বাহির হইয়াছিল সুতরাং সেই রাত্রেই তাহার আবশ্যকীয় কতকগুলি

জিনিসপত্র কিনিয়া তাহাকে বাগানে রাখিয়া তবে রাত্রি প্রায় দু'টায় কবি গৃহে ফিরেন। তিনি বলিলেন—"আমি তাহাকে নিজ বাড়িতেই আনিতাম কিন্তু আমার স্ত্রীর, মন অত্যন্ত সন্দিগ্ধ তাই সাহসী হই নাই।"

আমি চলিয়া আসিলাম ; কোন খবর পাওয়া গেল না বলিয়াই কমলার নিকট প্রকাশ করিলাম। কমলা ক্রুদ্ধা সিংহিনীর ন্যায় গর্জন করিতে লাগিল এবং পুলিশে কবির নামে ডায়েরি করিল যে তাহার নাবালিকা কন্যাকে কবি ফুসলাইয়া বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছেন। আমি কোন ছুতা করিয়া বাগান বাড়িতে যাইয়া কবি ও সুকৃতিকে দেখিতে পাইলাম। ডায়েরির কথা তাঁহাদের দু'জনকেই বলিলাম। কবি অত্যন্ত ভয় পাইলেন বটে, কিন্তু সুকৃতি ছিল নির্ভীক। সে ম্যাজিস্ট্রেটের বরাবর একখানা দরখাস্ত লিখিয়া পাঠাইল। তাহার মর্ম এই প্রকার ছিল—

"আমার বয়স আঠার বৎসরের উপর। আমার মাতা অসৎ কার্য দ্বারা অর্থোপার্জন করাইতে আমাকে তাঁহার নিকট রাখিতে চান ; তাহাতে আমি রাজি না হওয়ায় আমার উপর শারীরিক নির্যাতন করেন ; তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া আমি স্বেচ্ছায় তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। আমি স্বাধীন ও সদ্ভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিবার জন্য স্বেচ্ছায় চলিয়া আসিয়াছি ; ইহার জন্য অপর কেহ দায়ী নহেন, আমি নিজেই দায়ী। আমি যে লেখাপড়া শিখিয়াছি, তদ্দ্বারা আমার নিজের জীবিকা উপায়ের ক্ষমতা আমার আছে।"

পত্রখানা ইংরাজিতেই লিখিল। আমরা তিনজনে পরামর্শ করিলাম যে কমলা যখন সন্দেহ করিয়াছে, তখন আজ হোক আর কাল হোক, কি দু'দিন পরেই হোক—এই বাগান বাড়িতে সে সুকৃতির অনুসন্ধানে নিশ্চয়ই আসিবে ; সুতরাং বাগান বাড়ি সেই দিনই ত্যাগ করা উচিত। সেই দিনই কবি বৌবাজার স্ট্রীটে একটি প্রকাণ্ড বাড়ির একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করিয়া সুকৃতিকে সেখানে লইয়া গেলেন।

তাহার পরদিন কমলা সকাল বেলা বাহির হইয়া গেল এবং ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিল—"সুকৃতিকে কবিই লইয়া গিয়াছে। আমি বাগানে গিয়াছিলাম—সেখানে মালি দারোয়ান যাহারা ছিল, তাহারা অস্বীকার করিল বটে, কিন্তু সেখানে সুকৃতির পরিহিত কাপড়খানা শুকাইতেছিল—সুকৃতিকে তাড়াতাড়ি অন্যত্র সরাইয়াছে ; কিন্তু ভুলে কাপড়খানা তথায় ফেলিয়া গিয়াছে—তাহা দেখিয়াই আমি টের পাইয়াছি। দারোয়ান এবং মালি সুকৃতির বিষয় অস্বীকার করায় সঙ্গের লোক দ্বারা তাহাদের বেশ দু'ঘা দিয়াও স্বীকার করাইতে পারি নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি এখন কি করিতে চাও?"

কমলা বলিল—"চল আজই এর একটা হেস্তনেস্ত করব।"—এই বলিয়া আমাকে এবং রাস্তা হইতে চারিজন গুণ্ডা সঙ্গে লইয়া রাত্রি প্রায় দশটার সময় সে কবির বাড়িতে যাইয়া উপস্থিত হইল। কবি উপরে ছিলেন, সংবাদ দেওয়ায় নীচে আসিলেন। তিনি ব্যাপার

বুঝিতে পারিলেন কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া কমলাকে বলিলেন—"একি, আপনি এত রাত্রিতে হঠাৎ কি মনে করে?"

কমলা সক্রোধে ব্যঙ্গ সুরে বলিল—"আহা ন্যাকা আর কি? কি মনে করে? কিছুই যেন জানেন না। সুকৃতিকে কোথায় রেখেছ বল?"

কবি সে সম্বন্ধে কিছুই জানেন না বলিলেন—কমলার সঙ্গে কবির ভীষণ বচসা আরম্ভ হইল। কমলা উত্তেজিত হইয়া তাহার হস্তস্থিত রাইডিং চাবুক দ্বারা কবিকে প্রহার করিতে গেল। আমি তাহার হাত চাপিয়া ধরায় ব্যাপারটা অতদূর গড়াইল না। কবি এই ব্যাপারে বেশ ধৈর্য রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি কেবল মাত্র বলিলেন—"আপনি স্ত্রীলোক এবং আমার বাড়িতে এসেছেন, সেই জন্যই আপনি আমাকে যে অপমান করলেন সেটা আমাকে সইতে হ'লো। আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। যদি ভেবে থাকেন যে আপনার মেয়ে আমার কাছেই আছে তা হ'লে আইন মত যা করতে পারেন করবেন।"

কমলা গর্জন করিতে করিতে চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল—"আমি তোমাকে বিশেষ শিক্ষা দিব।"

ইহার পর হইতে কবির বাড়িতে যাইয়া কমলা মাঝে মাঝে উৎপাত করিতে আরম্ভ করিল। গুণ্ডা দিয়া কবিকে প্রহার করিতেও চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। আমিই সময় থাকিতে গোপনে কবিকে সতর্ক করিয়া দিতাম। অনেক দিন কবি বাড়ি হইতে বাহির হইলে কমলা মোটরে তাহার পশ্চাদানুসরণ করিত ; কবি খুব সাবধানে থাকিতেন। কমলা বৌবাজারের বাসার ঠিকানা আবিষ্কার করিতে পারিল না।

সুকৃতি নাকি বউবাজারে ওই ফ্ল্যাটে এককিনী থাকিতে ভয় পাইত। একদিন আমি যখন গোপনে ঐ ফ্ল্যাটে গিয়াছি তখন কবি আমাকে এই কথা বলিলেন—পরামর্শ করিয়া স্থির হইল, ঐ ফ্ল্যাটের উপরের ফ্ল্যাটে একটি মেম সাহেব থাকিতেন তিনি সুকৃতির নিকট থাকিবেন।

কয়েকদিন মেম সাহেব থাকিবার পর সুকৃতির একছড়া মূল্যবান হার চুরি গেল। সুকৃতি মেম সাহেবকে সন্দেহ করিল। মেম সাহেবের রাত্রিতে থাকা বন্ধ হইয়া গেল। এদিকে কমলা থানায় যে ডায়েরি করিয়াছিল তাহা লইয়া পুলিশ কোন প্রকার গোলামাল না করে তজ্জন্য পুলিশের মুখ বন্ধ করিতে কবি পাঁচশত টাকা ব্যয় করিলেন।

কমলার দৈনিক অত্যাচার, অপর দিকে অর্থ ব্যয়, তারপর বাড়িতেও সন্দেহের ফলে অশান্তি—এই ত্র্যহস্পর্শ যোগে কবির প্রাণান্ত হইয়া উঠিল। কবি তখন পর্যন্ত লম্পট ছিলেন না, কাজেই কেবল একটি মেয়ে, সে যতই সুন্দরী হউক না কেন, কেবল তাহার উপকারের জন্য এত অশান্তি তিনি ভোগ করিতেছেন, ইহা জানিয়া আমি তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারি নাই।

কিছু দিন পর কবি হঠাৎ একদিন সুকৃতিকে লইয়া তাহার মাতার নিকটে উপস্থিত হইলেন। সুকৃতি কাঁদিতেছিল—কবি কমলাকে বলিলেন—"আপনার কন্যাকে আমি জোর

করিয়া লইয়া আসিয়াছি। আমি ইহাকে ভগ্নীর মত ভালবাসি, তাই ইহার জন্য এতদিন যথেষ্ট করিয়াছি কিন্তু সমাজে আমার একটু সম্মান প্রতিপত্তি আছে, এই ভাবে আমি ইহাকে রাখিতে পারি না। লোকে আমার প্রকৃত মনের ভাব বুঝিবে না, আমার দুর্নাম রটনা করিবে। আপনি একে রাখুন এবং এখনও আমার অনুরোধ, আপনি ইহাকে কলঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিবেন না। ইহাকে লেখাপড়া শিখাইয়া সদ্ভাবে জীবনযাপনের পথ করিয়া দিন।"

এই কথা বলিয়া কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া কবি চলিয়া গেলেন। কমলা মেয়েকে খুব আদর যত্ন করিল কিন্তু মেয়ে কেবলই কাঁদিতে লাগিল। দুইদিন চলিয়া গেল। সুকৃতি বহু সাধ্যসাধনাতেও জল গ্রহণ পর্যন্ত করিল না। সে বলিল, কবির নিকট তাহাকে থাকিতে না দিলে সে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে।

কমলা ভয় পাইয়া গেল। আমাকে পাঠাইয়া কবিকে আবার ডাকাইয়া আনিল। কবি আসিয়া অনেক বুঝাইলেন। কমলা প্রতিশ্রুতি দিল যে সুকৃতি তাহার বাড়িতে থাকিলে সে কোন অসৎ কার্য করিতে বলিবে না। সুকৃতি বলিল, তিনি যদি তাহাকে লইয়া না যান তাহা হইলে যে অনাহার সে আরম্ভ করিয়াছে, সেই অনাহারেই প্রাণত্যাগ করিবে।

উপায়ন্তরহীন হইয়া কবি আবার সুকৃতিকে লইয়া গেলেন। এবার সুকৃতির মাতা আর আপত্তি করিল না। সুকৃতি বাগান বাড়িতেই থাকিতে লাগিল। কমলা ও আমি মাঝে মাঝে যাইয়া দেখিয়া আসিতাম। কবির সহিত এই সময় আমার হৃদ্যতা খুবই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তিনি অকপটে বলিলেন—"রমেশবাবু, আমি কি করবো বলুন তো? হৃদয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমি ক্ষত বিক্ষত হয়ে পড়েছি। আমি ভগবান সাক্ষী করে বলতে পারি, সুকৃতিকে ত আমি ভগ্নীর মতই দেখতাম, সেও আমাকে ভায়ের মতই ভালবাসে, আমার এই ধারণা ছিল। কিন্তু এখন আমি বুঝতে পাচ্ছি ব্যাপারটি তা নয়! সে আমাকে অন্যভাবে ভালবাসে, আকার ইঙ্গিত হাবভাবে প্রত্যহ সে কথা বুঝিয়ে দিচ্ছে এবং সে-কথা বোঝাবার পর থেকে আমিও নিজের অজ্ঞাতে পূর্বভাব ভুলে গিয়ে তা'র দিকে সেই ভাবে আকৃষ্ট হচ্ছি। প্রত্যহ তার সঙ্গে এ ভাবে সাক্ষাৎ হ'লে আমাকে মনুষ্যত্ব হারাতে হবে। কি করে তাকে দূরে রাখতে পারি আমায় বলুন।"

আমি আর কি বলিব! সুকৃতির হাবভাব দেখিয়া আমি অনেক পূর্বেই বুঝিয়াছিলাম। ইহার পরিণাম যে এই প্রকার দাঁড়াইবে তাহা আমার বুঝিতে বাকি ছিল না। কয়েকদিন পর কবি ও সুকৃতির সঙ্গে দেখা করিতে গেলে কবি বলিলেন—সুকৃতিকে তাহার মাতুল ও খুড়ার নিকট রাখিবেন বলিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, সে-চেষ্টাতেও বিফল মনোরথ হইয়াছেন। সুকৃতি বিশুদ্ধ চরিত্র আছে একথা তাঁহারা কেহই বিশ্বাস করেন নাই। সুকৃতিকে স্থান দিলে তাঁহাদের নিজেদের অবিবাহিতা কন্যাদের তাঁহারা বিবাহ দিতে পারিবেন না, এই কথাই বলিয়া দিয়াছেন এবং কবিকে কিছু অপমানজনক কথাও

বলিয়াছেন। সুকৃতি বলিল—"আমি ওকে আগেই নিষেধ করেছিলাম। উনি আমার কথা না মেনে মিছামিছি অপমানিত হলেন।"

যাহা হউক সুকৃতিকে অন্য কোথাও রাখিবার চেষ্টা সেই হইতেই শেষ হইল। কমলার সঙ্গেও এ বিষয় আমার মাঝে মাঝে আলাপ হইত। কমলা বলিত—"মেয়ে আমার সতী হয়েছেন। আমিও দেখছি সতীপনা ক'দিন থাকে, ওই পোড়ার মুখোর রাঙা মুখ দেখে মজেছে। পোড়ামুখীর একটু লজ্জাও নেই। কত লোক টাকা পয়সা ঢেলে খোশামোদ কচ্ছে তাদের দিকে তাকাবেও না। যে ফিরেও চায় না, তার গায়ে পড়া হয়ে থাকবেন।"

তারপর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল—"তুমি দেখে নিও আমি বলে রাখছি—ওই পোড়ামুখোর এমন ভাব আর বেশি দিন থাকবে না। বেহায়া মেয়েটা যে ভাব আরম্ভ করেছে তাতে যাদুধনকে তার খপ্পরে পড়তেই হবে।"

আমি ঠাট্টা করিয়া বলিলাম—"না পড়ে কি উপায় আছে? তোমারই মেয়েতো। তা তুমি এত চটছো কেন, তুমিও তো তাই চাও।"

কমলা বলিল—"চাই—কিন্তু ও পোড়ারমুখোর সঙ্গে চাই না। যাদের কাছে গেলে ও সুখে থাকতে পেত, আমিও দুপয়সা করে নিতে পারতুম, তাদের সঙ্গে ও জুটতো—আমি তাই চেয়েছিলুম।"

আমি বলিলাম—'তা আর কি করবে বল? "যাতে যার মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম। আর দেখ—যদি একজনের কাছে চিরদিন ভদ্র ভাবে থাকতে পারে সেইতো ভাল।"

কমলা গর্জিয়া উঠিয়া বলিল—"তুমি একটা আস্ত বেকুব, একজনের কাছে ও থাকবে—তেমন রক্তেই ওর জন্ম নয়। তুমি দেখে নিও, এখন একটা চোখের নেশায় ওকে চাচ্ছে, বাছাধনকে হাত করে নিক, তখন দেখবে আর ভাল লাগবে না। তখন আবার অন্যলোক খুঁজবে। লাভের মধ্যে রোজগারের সময় ক্রমেই ফুরিয়ে আসবে।"

কমলার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইল। কিছুদিন পরেই কবি আমার নিকট স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে সুকৃতির সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক নির্দোষ নহে। ক্রমে সুকৃতির নেশা ছুটিয়া আসিল। তাহার গর্ভে একটি কন্যা জন্মিল। এই মেয়েটির নাম পূর্ণিমা সেন, এখন তাহার বয়স ৮।৯ বৎসর, সে স্কুলে পড়ে, দেখিতে বেশ সুশ্রী। কমলা এই সময় চেষ্টা করিতে লাগিল কন্যার মন বিগড়াইয়া দিতে। সুকৃতির নেশা এই সময় কমিয়া আসিতেছিল বটে কিন্তু কবির নেশা বাড়িয়া উঠিতেছিল। সুকৃতির সংবাদ তাঁহার বাড়িতে পৌঁছিয়াছিল এবং বাড়িতে সন্দিগ্ধচিত্তা স্ত্রীর নিকট হইতে তিনি যথেষ্ট গঞ্জনা ভোগ করিতে লাগিলেন। শান্তির আশায় তিনি সুকৃতির নিকট ছুটিয়া আসিতেন কিন্তু সুকৃতি এখন প্রায় সময়ই তাহার মাতার নিকট যাইত, তিনি সুকৃতিকে বাড়িতে পাইতেন না। এই সময় সুকৃতির জন্য কলিকাতাতেই একখানা বাড়ি করা হইয়াছিল।

সুকৃতির মাতা সুকৃতিকে নানাপ্রকার কুপরামর্শ দিতেছিলেন, একথা আমি কবিকে না জানাইয়া পারি নাই। কবি সুকৃতিকে তাহার মাতার বাড়িতে যাওয়া নিষেধ করিয়া দিলেন।

সুকৃতি প্রথমত স্বীকৃত হইল কিন্তু লুকাইয়া আসিতে লাগিল। কবির তখন ধৈর্যের সীমা অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। তিনি সুকৃতিকে জানাইয়া দিলেন যে তাঁহার সহিত তাহার সম্পর্ক শেষ হইল। সুকৃতি তখন তাহার অপরাধের জন্য মার্জনা চাহিয়া একখানা পত্র আমার দ্বারা কবির নিকট পাঠাইয়া দিল। কবি জানিতে পারিয়াছিলেন যে তাহার মাতার চেষ্টায় সে বিখ্যাত আইন ব্যবসায়ী 'বলটু বাবুর' অঙ্কশায়িনী হইয়াছে। তিনি সুকৃতির পত্রখানি পড়িয়া রাগে আমার গায়ে ছুড়িয়া মারিয়া আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলেন। আমি পত্রখানা কুড়াইয়া লইয়া চলিয়া আসিলাম। সেই পত্রখানা এখনও আমার নিকট আছে। এই পুস্তকে তাহা ব্লক করিয়া দেওয়া হইল। [বর্তমান সংস্করণে কোনও চিঠির ব্লক নেই।]

সুকৃতির কথা এখন আমি সংক্ষেপেই শেষ করিব। সুকৃতি তাহার মাতৃপদানুসরণ করিয়াছে। বলটু বাবুর নিকট কিছুদিন থাকিবার পর বাবা ভোলানাথের কৃপায় সে এক বৃদ্ধ ধনীর অঙ্কশায়িনী হইয়াছিল। ধনীটি বড় কৃপণ ছিলেন—তিনি যে টাকা দিতেন তাহাতে কন্যা ও তাহার মাতা সন্তুষ্ট হইতেন না, এজন্য সুকৃতি তাহাকে ছাড়িয়া কিছুদিন সোনাগাছিতে ছিল। কবি ব্যতীত অপর দুইজন বৃদ্ধ বলিয়া বর্তমানে সুকৃতি সেন শর্মা বংশীয় 'গোপীকা' নামক এক যুবকের নিকট আছে।

গোয়ালিয়র এস্টেটের টী, প্রধান, নামক এক ইন্‌জিনিয়ার তাহার এক বন্ধুর সাহায্যে সুকৃতিকে দেখিয়া মোহিত হন এবং সুকৃতিকে গোয়ালিয়র লইয়া যাইবেন স্থির হয়। তিনি সুকৃতিকে মাসিক অর্থ পাঠাইতেন এবং সুকৃতির সঙ্গে প্রেমালাপ করিবার জন্য বাংলা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুকৃতি তাঁহার টাকাই লইয়াছিল কিন্তু প্রতিদান কিছুই দেয় নাই। প্রতিদানের ইচ্ছাও ছিল না কিন্তু অর্থ গ্রহণ করিত। এইভাবে কত লোক যে প্রতারিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

সুকৃতির কথা এইখানেই শেষ করিব। কবির কথা এখন আর একটু বলা প্রয়োজন! কবির সহিত আমার এখনও বন্ধুত্ব আছে এবং তাঁহার জন্য আমার বাস্তবিক দুঃখ হয়।

আমি নিজে জন্মাবধি অসৎ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ; কিন্তু এই বেচারাকে দশচক্রে ভগবানভূত হইতে হইয়াছিল। চরিত্রহীনতার প্রতি বাল্য হইতে অশ্রদ্ধা থাকিলেও সময়চক্রে তাহাকে চরিত্রহীন হইতে হইয়াছে। আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি সন্দিগ্ধচিত্তা অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রী গৃহে না থাকিয়া যদি সরলা সুশীলা এবং প্রেমময়ী স্ত্রী তাঁহার ভাগ্যে ঘটিত তাহা হইলে তাঁহার আত্মরক্ষা করা কঠিন হইত না। একদিকে বাক্য জ্বালা অন্যদিকে সুন্দরী রমণীর প্রেমপূর্ণ আত্মদান, এই দুইটির মধ্যে মানুষের ঠিক থাকা খুবই কঠিন। কবির সতী সাধ্বী স্ত্রীর জন্যও আমরা দুঃখিত, তিনি স্বামীকে ভাল করিবার চেষ্টাই করিয়াছেন কিন্তু কোন ফল হয় নাই।

সুকৃতিকে তাড়াইয়া কবি কিছুদিন বড়ই উন্মনস্ক ভাবে ছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি গৃহে তাঁহার শান্তি ছিল না, কিন্তু তিনি শান্তি পাইয়াছেন জানিয়াছি। তাঁহার অপর প্রিয়ার নাম

গৌরী দেবী, ইনিও পরমা সুন্দরী। ইনি বৈদ্যবংশীয় এক উচ্চ পদস্থ চাকুরের কন্যা, বেথুন কলেজের ছাত্রী ও শিক্ষিতা। পিতামাতার একপ্রকার সম্মতি অনুসারেই ইনি কবির সঙ্গে মিলিতা হইয়াছেন। পিতা মাতার বাড়ির অতি নিকটে স্বতন্ত্র বাড়ি করিয়া কবি ইহাকে রাখিয়াছেন। কবি এবং ইনি উভয়েই বলেন যে তাঁহাদের বিবাহ হইয়াছে। সেটা কি জিনিস তাহা আমার ধারণা নাই, পণ্ডিতগণ তাহা বিচার করিবেন।

কবির পর-পর কয়েকটি রমণীর সঙ্গে ভালবাসা হয় এবং বর্তমানে রেণু দেবী নাম্নী এক ব্রাহ্মণ কন্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। এই দেবীটি কালু ঘোষের লেনে আছেন। অনেক সময় কবির মোটর এই রাস্তায় দেখা যায়।

কবির কথা এখানেই শেষ করিলাম। কমলার ফটো হইতে ব্লক করিয়া তাহার প্রতিমূর্তিও আমি এই পুস্তকে দিয়াছি। কমলার হস্ত লিখিত একখানা পত্রও ব্লক করিয়া দিলাম। এই পত্রখানার সঙ্গে একটা ইতিহাস জড়িত আছে। কাণাকড়ি ঘোষের রক্ষিতা অবস্থায় উত্তর বঙ্গের জনৈক রাজা বাহাদুর কমলার ইতিহাস শুনিয়া তাহাকে পাওয়ার জন্য লালায়িত হন। তাঁহার একজন কর্মচারী আমার নিকট আসে। কমলার রূপের জন্য যতটা নহে, কমলা কলিকাতার একটি বিখ্যাত বংশের কন্যা, তাহাকে অঙ্কশায়িনী করিতে পারিলে লম্পট জগতে খুব বড় একটা কীর্তি (Achievement) হইবে, এই ধারণা হইতে রাজা বাহাদূর কমলার দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। কমলা প্রকৃতই ঐ বংশের কন্যা কিনা অনুসন্ধান করিবার জন্য কর্মচারীটিকে পাঠাইয়াছিলেন। সেই সময় কমলা এই পত্রখানা লিখিয়া আমার দ্বারা রাজাবাহাদুরকে পাঠাইয়াছিল। দুঃর্ভাগ্যক্রমে যে দিন আমি ওই পত্র লইয়া রাজা বাহাদুরের নিকট গিয়াছিলাম সেই দিন প্রাতঃকালে তাঁহার পুত্রের অসুস্থতার টেলিগ্রাম পাইয়া রাজাবাহাদুর চলিয়া যান, পত্রখানা আর আমি কমলাকে ফিরাইয়া দেই নাই, আমার নিকটেই ছিল। রাজাবাহাদুর কিছুদিন পরে ফিরিয়া আসিয়া কমলার সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি রক্ষিতাভাবে কমলাকে রাখেন নাই। দুই তিন দিন বাড়িতে ও বাগানে লইয়া গিয়াছিলেন।

কমলার সঙ্গে আমার ক্রমে বনিবনাও কম হইতে লাগিল, তাহার ব্যবহারে আমি শ্রদ্ধা হারাইয়াছিলাম। কমলা প্রথমে যতই আমার প্রতি ভালাবাসা দেখাক না কেন, তাহার আকর্ষণে ভাটা পড়িয়া আসিতেছিল। কমলার নিকট কয়েক বৎসর থাকিয়া আমার বেতনের টাকা সবই আমি ব্যাঙ্কে জমাইয়াছিলাম, কারণ আমার মদ ও পোশাক পরিচ্ছদের টাকা কমলাই দিত। উপরি পাওনাও মন্দ ছিল না। আমি ও কমলা পরস্পরের সম্মতি ক্রমেই ছাড়াছাড়ি হইলাম। অবশ্য কিছু দিন পূর্বেও কমলার সহিত আমার মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ হইত। দূরে আসিলেও তাহার শিকার সংগ্রহে আমি সাহায্য করিতাম এবং মাঝে মাঝে কমিশন স্বরূপ কিছু কিছু লাভও হইত। এই প্রকার ঘৃণিত কার্যেও আমার অরুচি ছিলনা—অসৎসঙ্গের কি ভয়াবহ পরিণাম!

নারী-নৃত্য ও অবাধ মেলামেশা

যে সকল কারণে আমার মত লম্পট পতিতের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যশ্লোক সতী সাবিত্রীর স্বদেশীয়া ও স্বজাতীয়া বলিয়া পরিচিতা মহিলাগণের মধ্যে পাতিত্যের বিষ ছড়াইয়া পড়িতেছে, অবাধ মেলামেশা, ভদ্রমহিলার থিয়েটার ও নৃত্য তাহার মধ্যে প্রধান। এই থিয়েটার ও নৃত্যের সংস্পর্শে আসিয়া এ সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহার একটু বর্ণনা বোধ হয় আমার পতিত জীবনের কাহিনির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া অপ্রাসাঙ্গিক হইবে না।

বাংলার ভদ্রমহিলার নৃত্য-নাট্যাভিনয়ের প্রবর্তক কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি নিজ পরিবারের মহিলাদের লইয়া সর্বপ্রথম "বাল্মিকী প্রতিভা" অভিনয় করেন। এই নাটকে সরস্বতীর ভূমিকা অভিনয় করিয়া কবিবরের ভ্রাতুষ্পুত্রী—পরে স্বর্গীয আশুতোষ চৌধুরীর স্ত্রী 'প্রতিভা দেবী নাকি অজস্র সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন ;'' ইহার পরও কবিবর তাঁহার নিজ পরিবারের মহিলাদের লইয়া আরও অনেকগুলি নাটক ও নাটিকার অভিনয় করেন। ওই সকল পারিবারিক নাট্যাভিনয় ও নৃত্যগীত প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য অবশ্য আমার হয় নাই ; কিন্তু শুনিয়াছি প্রকাশ্যে টিকিট বিক্রয় না হইলেও ঠাকুর পরিবারে মহিলা ও পুরুষগণের বন্ধু এবং অনুগৃহীত শত শত ব্যক্তি ওই অভিনয় দর্শন করিয়াছেন।

নিজ পরিবারের মহিলাদের লইয়া নাট্যাভিনয় করিবার বিষময় ফলের কথা ঠাকুর পরিবারেরই পথভ্রষ্টা কন্যা কমলার নিজমুখে শুনিয়াছি, সে পরিষ্কার বলিয়াছে—"আমার চটুল নৃত্যাভিনয় দেখিয়া দর্শকগণ বিশেষ আকৃষ্ট হইত, তাহাই আমার পতনের অন্যতম কারণ—।" জানি না ইহার পরও কি সাহসে অথবা কোন গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার থিয়েটারের পরিসর নিজ পরিবার হইতে শান্তিনিকেতনে "আশ্রমবাসিনী" মহিলাদের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করিয়াছেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমটি বহু লোকের দানে প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহা তাঁহার নিজ সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত কিনা জানিনা, কিন্তু আশ্রমবাসিনী বালিকা ও তরুণীদের অভিভাবক এবং অভিভাবিকাগণও কি তাঁহাদের মেয়েদের দ্বারা থিয়েটার করাইবার জন্য কবিবরকে ভার দিয়াছেন? তবে ইহা ঠিক যে ভদ্রমহিলার সংগীত ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত—নুপুর নিক্কনে মুখরিত—নৃত্য-চপল অঙ্গভঙ্গির ললিত লীলায় লীলায়িত শান্তিনিকেতনে এমন কোন আকর্ষণ আছে—যাহার লোভে কুচবিহারের স্বামীত্যাগিনী রাণি নিরুপমা দেবীও আজ রাজঐশ্বর্য ছাড়িয়া সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করিতে অভিলাষিণী হ'ন।

শান্তিনিকেতনের তরুণীদের লইয়া কবিবর যে নাট্যাভিনয় করিয়াছেন তাহার মধ্যে শারদোৎসব, বর্ষামঙ্গল, নটরাজ, নটীর পূজা, সুন্দর [য], হইতে আরম্ভ করিয়া 'তপতী' পর্যন্ত অনেকগুলি আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি কিন্তু অনেক চেষ্টা ও পরিচয়পত্র দেখাইয়াও 'সবুজঘরে' (গ্রীন রুম) প্রবেশের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি নাই। প্রবেশ করিতে আমি পারি নাই বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে সেখানে পর্দার বড় ঘনঘটা! মূল রহস্যটি হইতেছে এই যে—ঠাকুর বাড়ি ও শান্তিনিকেতনকে ঘিরিয়া আভিজাত্যের এক ঘন ও দুর্ভেদ্য বেষ্টনী রহিয়াছে। এই আভিজাত্য শিক্ষা দীক্ষার, বংশ মর্যাদার, বা নিছক অর্থসম্পদের নহে—ইহা সুশিক্ষিত, (well-trained) সুসংস্কৃত একটি বিরাট চাল বা ধাপ্পাবাজি মাত্র।

শান্তিনিকেতনের মেয়েদের লইয়া রবীন্দ্রনাথ যে নাট্যাভিনয় করেন তাহাতে নায়কের অংশ গ্রহণ করেন তিন নিজেই। চুল দাড়িতে কলপ মাখিয়া 'কচি' সাজিয়া তিনি কখনো কখনো কিশোরী-কুমারীর সঙ্গে নাট্যাভিনয় করেন।

অভিনয়ে কখনো বা উদ্ভিন্নযৌবনা মহিলাকে অভিনেতার বাহুপাশে আবদ্ধ ও আলিঙ্গন করিতে হয় কিন্তু কুমারী মহিলার সঙ্গে এভাবে অভিনয় করিয়া কোন সূক্ষ্ম রসতত্ত্বের বিশ্লেষণ যে করা হয়, তাহা আমার ন্যায় লম্পটও বুঝিতে সক্ষম হয় নাই। অবাধ মেলামেশার পূর্ণ স্বার্থকতা বোধ হয় এই সকল অভিনয়। অবাধ মেলামেশা ও অবরোধ প্রথা এক জিনিস নহে। অবরোধ প্রথা তুলিয়া দিলেও অবাধ মেলামেশা না করিলে চলিতে পারে। নারীনৃত্য ও অবাধ মেলামেশার বিষময় ফলের বহু দৃষ্টান্ত আছে কিন্তু একটু পুরাতন না হইলে অর্থাৎ খাতায় নাম না লেখান পর্যন্ত ছাপার অক্ষরে বাহির করা চলে না। পাঠক—ধৈর্যংরহু।

কবিবর যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন—সেই পথে চলিবার মত লোকের অভাব হয় নাই। সংক্রামক ব্যাধির মত এই নারী নৃত্য গোটা দেশকে ছাইয়া ফেলিয়াছে এবং অল্প কাল মধ্যেই ইহার বিষময় ফল ফলিতেছে। দেশে স্থায়ী ও অস্থায়ী ভদ্রমহিলার বহু নাট্য-সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে, তাহারই দুই একটির কথা বলিব। পূর্বেই বলিয়া রাখি কোথাও সামান্য চেষ্টায় এবং কোথাও-বা বহু চেষ্টায় এই সম্প্রদায়গুলির অধিকাংশেরই অন্তরঙ্গ রূপে প্রবেশ করিতে এবং মহলা কালে মহলা গৃহে ও অভিনয় কালে গ্রীনরুমে স্থান লাভ করিতে পারিয়াছি ; সুতরাং এগুলি সম্বন্ধে যাহা বলিব তাহাও আমার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা বলিয়া আখ্যাত করা অসংগত হইবে না।

দেববালা দেবী নাম্নী বেহালার হালদার পরিবারের কন্যা পলাতকা শান্তির (ডাক নাম) উপপতি ও তাহারই দেহতটকে বিবিধ পটে অনুরঞ্জনকারী বাঙাল আর্টিস্ট মহাশয়ের নাম বাংলা দেশে সুপরিচিত। কোন বিশেষ সৎকার্য (?) উপলক্ষে যখন এম্পায়ার থিয়েটারে বৃন্দাবনলীলার অভিনয় করিবার জন্য মহিলা সংগ্রহ করিতে (পাঠকের কাছে বিনীত নিবেদন তাঁহারা যেন বসুমতীর 'রাণী ইউজিনীর বৈঠকের' বিজ্ঞাপনে লিখিত—'অরুচি

ধরা রাজকুমারের পল্লীবাসিনী অনভিজ্ঞা কুমারী ধরার জন্য যাত্রার" সহিত তুলনা না করেন) নৃত্যকুশলা বালিকাদের অভিভাবকদের দ্বারস্থ হইলেন তখন অভিভাবকেরা জানিয়া শুনিয়াও ইহার হস্তে বালিকাদের সমর্পণ করিলেন। অভিনয়ে সংগৃহীত অর্থ কোন্ সৎকার্যে ব্যয় হইয়াছে তাহাও আমরা জানি।

আর এক নাট্য সম্প্রদায় ছিল আমহার্স্ট স্ট্রীটে। একবার লীলাবতী নাম্নী নৃত্যপটিয়সী এক বেশ্যাকে কুমারী লীলা মুখার্জি সাজাইয়া তাঁহাদের দলভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন এবং পরে ধরা পড়িয়া এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। এই সম্প্রদায় সম্বন্ধে আরও দু-একটি কথা বলিব। সম্প্রদায়ের কর্ণধার বা সেনাপতি মহাশয়ের এক বন্ধু—ফরিদপুর নিবাসী উচ্চ বংশের বিবাহিতা যুবতী শ্রীমতী চামেলীকে কুলের বাহির করিয়া আনিয়া তাঁহার নিকট রাখিয়াছিল, তিনি ওই যুবতীকে পাঠাইয়া বড়বাজারে মাড়োয়ারিদের নিকট বহু টাকার টিকিট বিক্রয় করাইয়াছিলেন। এই মেয়েটি থিয়েটারের অনেক অভিনেতার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে বাধ্য হইয়াছিল। কলিকাতার কোন পাবলিক থিয়েটারের প্রিয়দর্শন তরুণ অভিনেতাকে ইহারা মহলা শিক্ষক রাখিয়াছিলেন। এই শিক্ষক মহাশয় মদ্যপান করিয়া মহলা শিক্ষা দিতে আসিতেন ; কোথাও একটু বেফাঁস কথা হইয়া গেলেও দু'টি মিষ্টি বাক্যে তাহা শোধরাইয়া লইতেন—। অভিভাবকদের কাহারও কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি, তাঁহারা তাঁহাদের কন্যাদের ইহার নিকট শিক্ষা গ্রহণে আপত্তি করিবার কোন কারণ নাকি খুঁজিয়া পাইতেন না। তবে এই সকল মেয়েরা স্বভাবতই চতুরা ; অভিনেতাটির পরিহাসে তাঁহারা অস্বস্তি বোধ করে নাই, বাড়াবাড়ি দেখিলে কুটিল ভ্রূভঙ্গীতে একটু শাসাইয়াছে। অভিনেতাটি কাহারও হাত ধরিবার বা চুলের বেণি নাড়িয়া দিবার চেষ্টা করিলে সতর্কতার সহিত সরিয়া গিয়া আবার তাঁহার সহিত হাসিয়া কথা কহিয়াছে। একটা ঘটনা আমার বিশেষ মনে আছে ; একটি স্থূলকায়া যুবতী রামায়ণের ঘটনা সম্বলিত কোন নাটকে পুরুষের ভূমিকা গ্রহণ করিত, তখন তাহার বয়স আন্দাজ ষোল সতর, গৌর বর্ণ না হইলেও তাহাকে সুন্দরী বলা যায়। এই যুবতীটিকে পাশের ঘরে লইয়া নির্জনে বসিয়া তাহার একটি গান শুনিবার জন্য কত চেষ্টাই না তিনি করিয়াছিলেন। মেয়েটি কিন্তু নীচে উপরে ছুটাছুটি করিয়া বেচারিকে নাস্তানাবুদ করিয়া তবে ছাড়িয়াছিল—অবশ্য হাস্য ও অপাঙ্গদৃষ্টিতে কথঞ্চিৎ ক্ষতি পূরণ করিতে ছাড়ে নাই।

ভদ্রমহিলার থিয়েটার সম্পর্কে এক মিসেস সরকারের কথা না বলিলে নয়। ইনি যে কবে মিসেস হইয়াছিলেন জানি না, তবে যুক্ত প্রদেশের [বর্তমান উত্তর প্রদেশ] কোন ক্ষুদে নেটিভ প্রিন্সের জনৈক রক্ষিতা নারীর সহিত তাঁহার পূর্বজীবনের সম্পর্ক থাকা নাকি বিচিত্র নয়। ব্যারিস্টার-প্রিয়া এই মিসেসটির হৃদয়ে হঠাৎ ভদ্রঘরের মহিলাদের লইয়া নাচিবার শখ হইল—একদল বালিকাও জুটিয়া গেল। এম্পায়ার থিয়েটারে রাসলীলা শুরু হইল এবং লীলাবসানে রাসেশ্বরী শ্রীমতী কোন তরুণ বজ্রকিশোরকে কর্ণধার করিয়া অচেনা দেশের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন।

আর অয়ান ঘোষ? বেচারি অনেক হা হতোহস্মি করিয়া অবশেষে চটিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন—"মিসেস্...অমুকের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই।" বাংলা দৈনিকের পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন।

নারী নৃত্যের আর একটি আস্তানা এল্‌গিন রোডে। ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের পৌত্র কুনাল সেন, কুণাল সেনের স্ত্রী, নৃত্যফিল্ম বিশারদ মধু বোস[১৮], রেবা রায় প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন স্বর্গ হইতে নাতি নাত্‌বৌ'র নৃত্য দেখিয়া বোধ হয় আনন্দে ডুগডুগি বাজাইতেছেন। কুনাল যে কুণালে যায় নাই এজন্য তাঁহার বোধ হয় আনন্দের আর সীমা নাই। এই সম্প্রদায় স্ত্রী পুরুষে 'আলিবাবা' 'আবু হোসেন' প্রভৃতি নাটক অভিনয় করিয়াছেন। এক বিশিষ্ট অভিনেতা আলিবাবা নাটকে 'আবদালা' সাজিয়া 'মর্জিনা' রূপী নিজের ভাগিনেয়ীর সঙ্গে 'বাদশা-বেগমের' অভিনয় করিয়া দর্শকবৃন্দকে বিশেষ সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন।

এমন নৃত্য-গীত-বহুল নাটক অধুনা বিরল—আব্‌দালা ও মর্জিনার নৃত্য ও গীতের একটু নমুনা এখানে দেওয়া হইল।

গান ও নাচ

আব্‌দালা—আমি বাদ্‌শা বনেছি।
মর্জিনা—আমি বেগ্‌ম সেজেছি।
(উভয়ের হাত ধরাধরি করিয়া)
বাদ্‌শা বেগম ঝম্ ঝমাঝম্ চলছি মোরা—ইত্যাদি।

ভাগিনেয়ীকে বেগম সাজাইয়া [হাত] ধরাধরি করিয়া নাচিতে গাহিতে যে কি স্বর্গীয় আনন্দ তাহা সাধারণ লোক বুঝিতে পারে না বলিয়া নিন্দা করিয়া মরে। কবি রবীন্দ্রনাথও নিজে রাজার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র-বধূকে রানি সাজাইয়া অভিনয় করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, অন্য সকলে তাহাই অনুসরণ করিতেছে মাত্র।

সংগীত সম্মিলনীর মেয়েরাও প্রকাশ্যে নৃত্যাভিনয় করেন। তাঁহাদের সংগীত, নৃত্য ও অভিনয় একটু উচ্চতর শ্রেণির ; এজন্য তাহার পরিণামও উচ্চতর। বাংলার গীত-মৃণালে যুগল পদ্ম দিলীপকুমার রায়[১৯] ও কুমারী সাহানা দেবী[২০] এই সংগীত সম্মিলনীর ছাত্র ছাত্রী—বর্তমানে তাঁহারা অরবিন্দাশ্রমে গিয়া আধ্যাত্মিকতার গূঢ় সাধনায় মগ্ন হইয়াছেন।

ভদ্রমহিলার নৃত্যাভিনয়কে যিনি জাতে তুলিয়াছেন, সেই কুমার গোপীকারমণের কথা এবার বলিব।

কুমার বাহাদুরের কলানুরাগ সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে সে তাঁহার শ্রীহট্টের বাড়ির চারিদিকে কদলী বৃক্ষে পরিপূর্ণ। শ্রীহট্টে যাই নাই, সে সকল কদলী বৃক্ষও দেখি

নাই, তবে বালিগঞ্জে তাঁহার শ্বশুর গৃহে এবং ১৮নং গড়িয়াহাট রোডে তাঁহার ভাড়াটে বাড়িতে কলানুরাগের দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি বৃক্ষ আছে দেখিয়াছি। এই গোপীকারমণের নাট্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায় প্রথম যৌবনে—স্টারে। দুর্ভাগ্যবশত প্রথম জীবনে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ছিল না।

দেড় বৎসর পূর্বে কুমার গোপীকারমণ কলিকাতার বাজারে নিজেকে নাট্য-রসিক বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন এবং প্রথমে রাধিকানন্দ সম্প্রদায়ের সঙ্গে পাণ্ডব গৌরব, পরে স্বতন্ত্রভাবে আলমগীর নাটক অভিনয় করেন। আলমগীর নাটকে স্ত্রীভূমিকায় এবং নর্তকী সঙ্ঘে কলিকাতার কয়েকজন পেশাদারী বেশ্যা অভিনেত্রী যোগদান করিয়াছিল। বেশ্যা পরিপূর্ণ গ্রীনরুমে কুমারী কন্যা গৌরীর প্রবেশ সমর্থন করিয়া এবং সাকীবেশীনী অভিনেতৃর সংগীকালে উইংসের পাশে বসিয়া ওই কন্যা দ্বারা হারমোনিয়াম বাজাইয়া যে সাহসের পরিচয় তিনি দিয়াছেন তাহা তৎকালীন সাময়িকপত্রাদিতে প্রসংশিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শ্রীমতী কুসুমকুমারী[২১] ও আধুনিক যুগের অভিনেত্রীগণের অগ্রগণ্যা শ্রীমতী নীহারবালার[২২] কথা প্রসঙ্গে কুমার বাহাদুর, তাঁহার কনিষ্ঠা রানি সুরুচিবালা ও কুমারীগণের সুমিষ্ট আলাপ ও সদয় ব্যবহারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। এমন কি নীহারবালা একথাও বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের অভিনয় দেখিয়া মনে হইল যে, তাঁহারা যদি আমাদের মত দীর্ঘকাল অভিনয় করেন তবে য়ুরোপ আমেরিকার অভিনেত্রীদের ন্যায় প্রভূত যশ ও অর্থ উপার্জন করিতে পারিবেন।

কথাটা ঠিক ; উদিপুরী বেগমরূপে সুরচিবালাকে এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে প্রথম যখন দেখিয়াছিলাম, আমার মনের তখনকার সেই ছাপ এখনও দূর হয় নাই। উদিপুরী বেগমকে আমি অনেক দিন ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিয়াছি। অভিনয় ও নৃত্যের যথার্থ স্বার্থকতা সেইখানে, যেখানে উহা শ্রোতা ও দর্শকের মনে ছাপ রাখিয়া দিতে পারে। অভিনয়ের স্বার্থকতার ছাপ, ছাপ পাপ ও পুণ্য উভয় প্রকারই হয়। আমার ন্যায় ঝুনা লম্পট নাটকে পাপের ছাপযুক্ত না হইলেও যুবকগণের কি দশা ঘটে কে জানে! রানি সুরুচিবালাকে পর পর উদিপুরী, কুবেণী, মরিয়াম, আকবর মহিষী প্রভৃতি ভূমিকায় এবং কুমারী গৌরীকে নৃত্যগীতাভিনয়ে নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে দেখিয়াছি। গানে আমার বিশেষ অনুরাগ থাকিলেও অভিনয়কলার প্রতি অনুরাগের লেশ মাত্র আছে এমন অপবাদ পরম শত্রুও দিবে না—রানি, কুমারী ও অন্যান্য মহিলাদের লীলায়িত অঙ্গ-ভঙ্গীই আমাকে তাঁহাদের অভিনয়ের অনুরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

মনে পড়ে গড়িয়াহাট রোডের বাড়িতে এক দিন দিবাভাগে সিংহল বিজয় নাটকের অভিনয় হইতেছিল। কুমারী গৌরী সুললিত নৃত্যে সমবেত দর্শমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিতেছিলেন। নৃত্যের আবেশে কুমারী তন্ময়—উন্মত্তবৎ দর্শকমণ্ডলী ঘন ঘন করতালি ও জয়োল্লাসে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছিলেন। এমন সুঠাম অঙ্গ-ভঙ্গিযুক্ত নৃত্য আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। কুমার বাহাদুরের চেষ্টা ও অর্থ সাহায্যে এই প্রকার নারীনৃত্যের দল ক্রমে বর্ধিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শুনা যায়, কুমার বাহাদুর কলিকাতাব অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন মানসে সপরিবারে থিয়েটার করিয়া তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেন কিন্তু ওই সকল অভিজাতবর্গ কুমার বাহাদুরেব স্ত্রীর অভিনয় সম্ভোগ জন্য দলে দলে সমাগত হইলেও তাঁহার পরিজনবর্গের সহিত ঘনিষ্ঠতার কোন নিদর্শন তাঁহারা দেখান নাই। কৃতঘ্নতা আর কাহাকে বলে!

কলিকাতার মনোমোহন থিয়েটার "গোপীকারমণ শ্রীকৃষ্ণ" নামক একটি সারগর্ভ অভিনয় করায়, কুমার বাহাদুর ওই নাটক তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিয়া লেখা হইয়াছে, এই অভিযোগে থিয়েটার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আড়াই লক্ষ টাকার দাবীতে এক মানহানির মামলা দায়ের করিয়াছিলেন। বেশ্যাদের সঙ্গে যাহারা সপরিবারে থিয়েটার করিতে পারে এবং নিজের স্ত্রী কন্যাকে যাহারা সহস্র সহস্র লোকের লালসা উদ্দীপক নৃত্যগীতে প্রমত্ত হইতে দিতে পারে তাহাদের মানের মূল্য জানি না। হাইকোর্টে এই মূল্য নির্ণীত হইলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে বেশ্যার সঙ্গে অভিনয়ে মূল্য বাড়ে কি কমে!

শ্রীহট্টবাসী সম্বন্ধে এই বচনটি প্রচলিত আছে—

ভাইরে—কিবা দেশের কিবা গুণ,
একই গাছে পানসুপারি একই গাছে চুণ!

কোন শ্রীহট্টবাসী অশত্থ গাছের পাতাকে পান, লাল ফলগুলিকে সুপারি এবং গাছে শকুনের সাদা বিষ্ঠাকে চুন মনে করিয়া আশ্চর্য হইয়া ইহা বলিয়াছিল। কুমার বাহাদুরের অবস্থা দেখিয়াও আমাদের বার বার এই বচনটাই মনে হয়েছে। বাংলার আর কোন্ রাজকুমার বা বিশিষ্ট ভদ্র সন্তান স্ত্রী কন্যা লইয়া বেশ্যা ও পরপুরুষের সঙ্গে থিয়েটার করিয়াছে? কুমার বাহাদুর শ্রীহট্টবাসী তথা বাংলার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন—কুমার বাহাদুরের জয় হোক। "গোপীকারমণ শ্রীকৃষ্ণ" অভিনয় তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিয়াই অভিনীত হইয়াছে বলিয়া তিনি যখন মনে করেন তখন আমরা বলিতে বাধ্য যে এমন ঘৃণিত চিত্রেই তিনি চিত্রিত হইয়াছেন যে এই কলঙ্ক কালিমা দূর করিতে দুই এক শতাব্দী চলিয়া যাইতে ...বে।

...াহাট রোডের অভিনয়ে পূর্বোক্ত দেববালাকে ভদ্রমহিলার আসনে দেখা গিয়াছিল। এই ...েববালাদিগের কথা এখানেই কিছু বলিব। দেববালা, সুনীলা ও অনিলা তিন বোন, ... বেহালার প্রসিদ্ধ হালদার বংশের কন্যা। মাতা ও এক ভ্রাতা ইহাদের সঙ্গে আছেন। ...বালার বিবাহ হয় পুলিশের এক সব-ইনস্পেক্টারের সঙ্গে। সব-ইনস্পেক্টারটি তাঁহার স্ত্রীকে বন্ধুমহলে পরিচয় করাইয়া দেন, পরিচয় ক্রমে প্রেমে পরিণত হয়, তৎপর উধাও। ইহার দুইটি ছোট মেয়ে ছিল, তাহাদিগকে ফেলিয়াই চলিয়া আসে। বাজারে আসিয়া তাহার একটি ছেলে হইয়াছে। ছেলের নাম দেবকুমার মজুমদার, বয়স ৭—৮ বৎসর ; এ নামে স্বার্থকতা আছে বটে। সুনীলা বিধবা, বয়স ২০।২১, বেশ্যালয়ে একটি মেয়ে

হইয়াছে। এ মেয়ের নাম 'ঋষিকুমারী' রাখা উচিত—কলিকাতা হাইকোর্টের এক ঋষি-ব্যারিস্টারের ঔরষে ইহার জন্ম। মাতা কনিষ্ঠা কুমারী কন্যা অনিলাকে লইয়া ইহাদের সঙ্গে বাস করিতেছেন। একটি ভাইও সঙ্গে আছে। ইহাদের অপর দুই ভাই স্থানান্তরে চাকরি করেন। ইচ্ছা থাকিলে কনিষ্ঠা কন্যার পুত্রকে লইয়া মাতা সৎভাবে জীবন যাপন করিতে পারিতেন। অনিলাও পতিতা বৃত্তি অবিলম্বন করিয়াছে। ভদ্রবংশের কি শোচনীয় পরিণাম! এই তিনটি বোনই অবাধ মেলামেশার ফলে আজ পতিতা বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে।

পদ্মরঞ্জন

পূর্ব অধ্যায়ে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, পদ্মরঞ্জন সরকারের সহিত আমার পরিচয়ের বিশেষ বিবরণ পাঠকগণকে উপহার দিব। তাঁহার কথা একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছিলাম, কমলার কথা লিখিতে লিখিতে উহার কথা আবার মনে হইল, তাই পাঠকগণকে সেই অদ্ভুত কর্মী বাঙালির চরিত কথা শুনাইবার প্রেরণা আমার জাগিয়া উঠিয়াছে এবং মনে হইতেছে, আমার জীবন কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত, যদি এই কাহিনি ইহার অন্তর্ভুক্ত না করিতাম।

পদ্মরঞ্জন সার্থক নাম ; পদ্মকে যিনি রঞ্জন করেন তিনিই পদ্মরঞ্জন ; এই অর্থে পদ্মরঞ্জন বলিতে সূর্য অথবা ভ্রমরকে বুঝায়। যে অর্থই লওয়া যায় সেই অর্থেই পদ্মরঞ্জন সার্থক নাম তাহাতে সন্দেহ নাই। ভ্রমর যেমন নানা ফুলের মধু লুটিয়া বেড়ায়, আমাদের পদ্মরঞ্জনও তেমনি কত প্রেমমধু লুটিয়া লইয়াছেন তাহার সংখ্যা করা দুরূহ। ভ্রমরের বর্ণের সঙ্গে তাঁহার বর্ণের সাদৃশ্য না থাকিলেও ভ্রমরের হুলের মত তাঁহার হুলেও বিষ আছে, তাঁহার স্বার্থসিদ্ধির ব্যাঘাত করিলে সেই বিষাক্ত হুলে তিনি লোককে দংশন করিতেও ছাড়েন না, এমন কি জীবনান্ত করিতে পারেন। অপর দিকে সূর্যের ন্যায় তিনি সর্বজন পরিচিত, সূর্যের কিরণের ন্যায় তাঁহার যশোকিরণে (?) বাংলাদেশ উদ্ভাসিত। সূর্যের চতুর্দিকে যেমন নানা গ্রহ উপগ্রহ ঘুরিয়া বেড়ায় পদ্মরঞ্জনের চতুর্দিকেও তেমনি তাঁহার দলের কত গ্রহ উপগ্রহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহার সংখ্যা নাই। সূর্যের তেজে অবিরত মস্তিষ্কের পীড়া হয়, সর্দি গর্মি হয়, তাহা যেমন লোকে বলে না—সূর্যকে জগতজীবন বলিয়াই লোকে স্তুতি করিয়া থাকে, পদ্মরঞ্জনের দুশ্চরিত্রতার কথাও তেমনি লোকে বলে না ; দেশহিতৈষী উপনেতা বলিয়াই লোকে তাহাকে প্রশংসা করিয়া থাকে। পদ্মরঞ্জন ভাগ্যবান তাহাতে সন্দেহ নাই। চরিত্র হিসাবে পদ্মরঞ্জন আর রমেশচন্দ্র বস্তুবিশেষের এপিঠ আর ওপিঠ ; কিন্তু পদ্মরঞ্জন আজ দল বিশেষের ও অপরিচিতের নিকট পূজ্য (?) আর রমেশচন্দ্র আজ লোকচক্ষে ঘৃণিত লাঞ্ছিত। অদৃষ্টের কি পরিহাস।

পদ্মরঞ্জনের সহিত আমার প্রথম পরিচয় স্বদেশি যুগে। আমরা যখন স্বদেশি ভলাণ্টিয়ার হইয়া খুব হৈ চৈ করিতেছি। একদিন একজন দেশপূজ্য নেতা আমাকে ডাকিয়া চিৎপুরের একটি ঠিকানা দিয়া বলিলেন—"রমেশ তুমি এই ঠিকানায় একবার যাবে। একটি ছেলে নাম পদ্মরঞ্জন সরকার, সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে। ছেলেটি একজন ভলাণ্টিয়ার। কিছু সাহায্য চেয়েছে, তাকে দেখে আসবে এবং পঁচিশটি টাকা দিয়ে আসবে।" আমাকে টাকা দেওয়ার পর আমি সে কথা অন্যান্য কাজের ভিড়ে ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। দুই তিন দিন পর অন্য একটি কার্য শেষ করিয়া জোঁড়াসাঁকো হইতে চিৎপুর দিয়া ট্রামে ফিরিতেছি এমন সময় হঠাৎ কথাটা মনে পড়িল, তখন রাত্রি প্রায় দশটা। মনে খুব অনুশোচনা হইল, অসুস্থ অবস্থায় বেচারা সাহায্য চাহিয়াছে, আর সেই টাকা তিনদিন হইল আমার পকেটে

পকেটেই ঘুরিতেছে! রাত্রি বেশি হইলেও আজই তাহাকে টাকা দিতে হইবে, এই সংকল্প করিয়া আমি ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িলাম এবং অনুসন্ধান করিয়া সেই ঠিকানায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, একখানা খোলার ঘর, দরজা ভেজান ছিল, ঠেলিতেই খুলিয়া গেল, আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ঘরের কোণে একখানি তক্তপোশের উপর একটি রমণী পাশাপাশি বসিয়াছিলেন। হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে স্ত্রীলোকটি পুরুষের পার্শ্ব হইতে সরিয়া গেলেন। স্ত্রীলোকটি যুবতী, সুন্দরী, তাহার শূন্য হস্ত ও পরিধানে থান কাপড় দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে তিনি বিধবা। পুরুষটি রাগের বশে আমকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে মশাই আপনি? বলা নেই কওয়া নাই একেবারে ঘরের ভিতর এসে পড়েছেন।" আমি নিজেও একটু অপ্রস্তুত হইয়াছিলাম কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—" আপনারই নাম কি পদ্মবাবু"? তিনি সেই প্রকার ক্রুদ্ধস্বরেই উত্তর করিলেন—"হ্যাঁ কেন?"

আমি তাঁহাকে বলিলাম যে অমুক বাবুর নিকট তিনি অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করায় এবং প্রায় মৃত্যুশয্যায় পতিত হইয়াছেন, এই কথা লেখায় তিনি আমাকে আপনার অবস্থা দেখিতে এবং প্রয়োজন হইলে কিছু সাহায্য করিতে পাঠাইয়াছেন। তাহার পর একটু ব্যঙ্গের সুরে বলিলাম—"কিন্তু মশাই তো দেখছি বেশ সুস্থ শরীরে, বেশ মজাতেই আছেন। চিঠিখানা বোধ হয় আপনার নাম জাল করে কেউ লিখে থাকবে। আমি যাই, সেই কথাই তাঁকে বলিগে।" আমার এই কথা শুনিয়াই পদ্মবাবুর মেজাজ একেবারে বদলাইয়া গেল। কথার সুরও তারা পরদা হইতে একেবারে উদারায় নামিয়া আসিল। তিনি আমাকে যত্ন করিয়া বসাইয়া আত্মদোষ স্খালনের জন্য অনেক আবোল তাবোল বকিতে আরম্ভ করিলেন। আমি মনে মনে হাসিলাম, কিন্তু মুখে কিছু বলিলাম না। প্রায় ঘণ্টাখানেক বসিয়া গল্প করিয়া তাঁহাকে পনেরটি টাকা দিয়া আসিলাম।

পঁচিশ টাকার মধ্যে পনেরটি টাকা দেওয়ার কারণ ইহাই ছিল যে অবশিষ্ট দশটি টাকা দেওয়ার উপলক্ষ্য করিয়া আর একদিন আমি সেই বাসায় যাইব। আমার মনে পাপ-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল। ইনি যে আমার বাসনা সিদ্ধির অনুকূল হইবেন তাহাও আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

হইলও তাহাই। আর একদিন ওই দশটাকা লইয়া আমি সেই বাসায় গেলাম। তার পর আরও দুই চারি দিন গেলাম। নিজ হইতে কয়েকটি টাকাও দিলাম। তাহার ছেলের জন্য খেলনা জামা ইত্যাদি লইয়া দুই একদিন গেলাম। এই ভাবে কিছুদিন যাতায়াতের পর তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইল। বিধবাটি পদ্মবাবুর উপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিল না। অনেক আশা ভরসা বাবু তাহাকে দিয়াছিলেন কিন্তু তাহাকে যে প্রকার দুরবস্থায় তিনি রাখিয়াছিলেন তাহাতে তাহার মেজাজ বিগড়াইয়া গিয়াছিল। তাহার নিকট বাবুর পূর্ব জীবনের অনেক কথাই আমি জানিতে পারিয়াছিলাম।

ময়মনসিংহ জেলার (কোন মহকুমার এখন স্মরণ নাই, সম্ভবত কিশোরগঞ্জ হইবে।)*

---

* কিশোরগঞ্জ নয়—সজিউরার একটি গ্রামে।

একটি গ্রামে পদ্মরঞ্জনের জন্ম হয়। তাঁহার প্রকৃত এবং প্রাথমিক নাম ছিল রোহিণী সরকার। ময়মনসিংহের কোন মহকুমার এণ্ট্রান্স স্কুলে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন, কিন্তু কোন গুরুতর অপরাধের জন্য স্কুল হতে বহিষ্কৃত (Rusticated) হন। তাহার পর ময়মনসিংহ আসিয়া তিনি স্কুলে ভর্তি হন। যে প্রতিভার বলে লম্পট এবং সর্বপ্রকার প্রতারণায় সিদ্ধহস্ত পদ্মরঞ্জন আজ একজন উপনেতা বলিয়া পূজা (?) পাইতেছেন, সেই অপূর্ব প্রতিভার প্রথম উন্মেষ এই সময়েই দেখা গিয়াছিল। অন্য হইলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত কিন্তু ইনি তেমন পাত্রই ছিলেন না। রোহিণীকান্ত বেমালুম পদ্মরঞ্জনে পরিণত হইয়া ময়মনসিংহ স্কুলে ভর্তি হইয়া গেলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ময়মনসিংহে থাকাও তাঁহার বেশি দিন ঘটিল না। দরিদ্র পদ্মরঞ্জন অন্যের অনুগ্রহে এক বাসায় থাকিয়া স্কুলে পড়িতেন। সেই বাসার কর্তৃপক্ষ পদ্মরঞ্জনের চরিত্র সম্বন্ধে কতকগুলি কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বাসায় স্থান দিতে অস্বীকৃত হইলেন। স্কুলের কতকগুলি ব্যাপারে জাল জুয়াজুরি ধরা পড়ায়, স্কুল কর্তৃপক্ষও তাঁহাকে মানে মানে বিদায় লইতে আদেশ দিলেন। পদ্মরঞ্জনের ময়মনসিংহের পাঠ সাঙ্গ হইল। তাহার পর তিনি পড়িতে আসিলেন টাঙ্গাইলে। টাঙ্গাইল স্কুলের ডন-মাস্টারের বাসায় তিনি থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া লইলেন কিন্তু—'আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পস্যতি সঃ পণ্ডিত' [য]—এই নীতির অনুসরণ করিয়া পদ্মরঞ্জন উক্ত শিক্ষকের দোকান হইত না বলিয়া কিছু অর্থ গ্রহণ করায় এবং উক্ত শিক্ষক মূর্খতাবশত তাঁহার এই উদার বিশ্বপ্রেমের মূল্য বুঝিতে না পারায় চোর অপবাদ লইয়া তাঁহাকে তথা হইতেও তাড়িত হইতে হয়। কর্মজীবনের প্রারম্ভে পরের অর্থ আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে তাঁহার একবার 'শ্রীঘর' বাস হয় কিন্তু তিনি আপীলে নাকি খালাস পাইয়াছিলেন শুনিয়াছি।

স্বদেশি আন্দোলনের সময় মিটিং-এর টুল-টেবিল টানাটানি করিয়া, তৎকালীন নেতাগণের অভ্যর্থনার জন্য অনুষ্ঠিত শোভাযাত্রার নিশান হস্তে কাপ্তেনি করিয়া, "বন্দে মাতরম্" চিৎকারে গলার স্বর ভঙ্গ করিয়া এবং অন্যান্য অনেক প্রকারে নিজেকে জাহির করিয়া পদ্মবাবু একজন নামজাদা স্বদেশিওয়ালারূপে লোকচক্ষুতে পরিণত হন। ক্ষুদ্র মফসসলের গণ্ডিতে তাঁহার মত প্রতিভার যথোপযুক্ত বিকাশ হইতেছে না বুঝিতে পারিয়া, তিনি তখন মহানগরীর দিকে ধাবিত হইলেন। বাল্যকাল হইতেই অন্যের অভাব মোচনের জন্য আত্মত্যাগী পদ্মরঞ্জন কেবলমাত্র পরের দুঃখকাতরতার অনুরোধে এই বাল্যবিধবার অভাব মোচন করিয়াছিলেন। কিন্তু অভাব মোচন করিতে করিতে এমন অবস্থা উপস্থিত হইল যে বিধবাটির পুত্রের অভাবও মোচন হইবার উপক্রম হইল। পদ্মরঞ্জনের দুরদৃষ্ট, তাঁহার অপূর্ব পরোপকারবৃত্তির মর্ম কেহ বুঝিল না।

এই সকল কথা ক্রমে আমি ওই বিধবাটির নিকট জানিতে পারিয়াছিলাম। পদ্মরঞ্জনের সঙ্গেও আমার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতেছিল। বিধবাটির সহিত আমার ঘনিষ্ঠতাও পদ্মরঞ্জন অবগত হইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার বিশেষ কোন ক্ষোভের কারণও হয় নাই। বোধ হয় আমার দ্বারা তাঁহার বিশেষ আর্থিক সাহায্য তৎকালে হইত বলিয়া।

ইহার পর কিছুদিন পদ্মবাবুর কোন সংবাদ রাখিতাম না। আমার কলেজ জীবনে এবং

তৎপর বৈষয়িক জীবনে পদ্মবাবুর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হয়। কলেজ জীবনের ইতিহাস বাগানবাড়ির ব্যাপারে পাঠকগণ যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন। কিন্তু সত্যের অনুরোধে আমি বলিতে বাধ্য যে পদ্মরঞ্জন শেষ দিকে মদ্যপান ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং এখনও নাকি তিনি মদ্যপান করেন না। ময়মনসিংহ জেলার কোন সহৃদয় জমিদারের সুপারিশে প্রথমত কুড়ি টাকা কি পঁচিশ টাকা বেতনে তিনি একটি কোম্পানির কেরানি হইয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করেন। [১৯১১ সালে হিন্দুস্থান কো অপ ইন্সিওরেন্সে নামমাত্র বেতনে ঢুকেছিলেন] ১৯২৩ সাল পর্যন্ত তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইয়া মাসিক ৪০০ শত টাকায় পরিণত হয়।

কিন্তু বেতন ওই প্রকার হইলে কি হইবে! পদ্মবাবুর অর্থ ভূতে যোগাইত? সাধে কি আমি পদ্মবাবুর এত পক্ষপাতী? এমন অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন লোক আর দুটি ত আমি বঙ্গদেশে দেখিলাম না! পদ্মবাবু ওই তো বেতন পাইতেন কিন্তু তাঁহার ব্যয় কী প্রকার ছিল তাহা একবার শুনিবেন কি?

নবতারা, আসমান তারা, বিমলা, সুশীলা, মাখনবালা, রামবাগানের রানি, পিরালি মোনা, উমাদাস লেনের শ্রীমতী আরছেলা (উড়েনি) প্রভৃতি যে কোন বেশ্যাকে তিনি যখন রক্ষিতাস্বরূপে রাখিয়াছেন তখনই তাহাকে মাসিক এক শত হইতে তিন শত টাকা বৃত্তি স্বরূপে দিয়াছেন। অবশ্য প্রথম জীবনে উড়েনিকে মাত্র ২০৲ টাকা নাকি তিনি দিতেন। তিনি চিরদিন এক একটি মেয়েমানুষকে মাসিক মাসহারা দিয়া রাখিতেন। তাঁহার রাজনৈতিক দলের বন্ধুবান্ধব এবং আমার ন্যায় বাহিরের বন্ধুবান্ধব লইয়া সেই সব বেশ্যার গৃহে মাঝে মাঝে উৎসবে মদ্য মাংস এবং অন্যান্য উপকরণের জন্যও জলের মত অর্থ ব্যয় করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। ইহাতেও ২।৩ শত টাকা মাসিক তাঁহার ব্যয় হইত। পদ্মরঞ্জন তাঁহার দলের এবং তৎসঙ্গে নিজের স্বার্থের জন ইলেক্‌সন ব্যাপারে একবার প্রায় পঞ্চাশ হাজার, একবার বিশ হাজার, একবার প্রায় এক হাজার [টাকা] ব্যয় করেন ; তাহা বাংলা দেশের শিক্ষিত লোক কে না জানে? ময়মনসিংহে তিনি একখানা বাড়ি করিয়াছেন। তাঁহার মহকুমায় একখানা এবং নিজের দেশেও একখানা বাড়ি করিয়াছেন, তাহার ব্যয় যথাক্রমে প্রায় ত্রিশ হাজার, পনের হাজার এবং দশ হাজার। এতদ্ব্যতীত মোটা টাকা তিনি সুদেও খাটাইতেছেন, তাহার পরিমাণও নেহাৎ কম নয়। তাঁহার কলিকাতার বাসা খরচ নাকি মাসিক পাঁচশত টাকার ন্যূন নহে। কলিকাতাতেও তিনি বহু ব্যয়ে নূতন বাড়ি করিয়াছেন শুনিয়াছি। তাহার ব্যয় ৩০।৪০ হাজার টাকা হইবে। প্রায় পাঁচ হাজার টাকা দিয়া মটর কিনিয়াছেন।

পাঠকগণ হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করিতেছেন না ; তাঁহাদের মনে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে "কুড়ি টাকা বেতনের কেরানি হইতে যে ব্যক্তি দশ বার বৎসর ৪০০৲ টাকা বেতনে উন্নিত হয়, তাহার পক্ষে এই সময়ে এত টাকা ব্যয় করা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে! তিনি বর্তমান সময় উক্ত কোম্পানির এক প্রকার সর্বেসর্বা হইয়া যে বেতন পাইতেছেন প্রথম চাকরিতে প্রবেশ করার দিন হইতে যদি তিনি সেই বেতন পাইতেন তাহা

হইলেও তো এত ব্যয় সঙ্কুলান হইত না।

এ প্রশ্ন সংগত সন্দেহ নাই। আমার বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে এই প্রশ্ন লইয়া আলোচনাও হইয়াছে। আমার একটি দুর্মুখ বন্ধু এই প্রকার আলোচনা প্রসঙ্গে একদিন বলিয়াছেন—ভূপেন বাড়ুজ্জ্যের এত বিলাসিতার টাকা কোথা হইতে আসে, বি. কে. লাহিড়ীর বাবুগিরির টাকা কোথা হইতে জোটে, এই প্রশ্নও কিছুদিন আগে অনেকে করিত—কেহই উত্তর দিতে পারিত না—অল্পদিন হইল উত্তর পাওয়া গিয়াছে। তোমাদের পদ্মরঞ্জন সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরও অদূর ভবিষ্যতে ওই প্রকার ভাবে তোমরা পাইতে পার, তাহাতে বিচিত্র কি!"

যাহারা নিজে অর্থ ও যশ উপার্জন করিতে অক্ষম তাহারা অপরকে এইভাবে আক্রমণ করিয়াও বোধ হয় একটু শান্তি পায়। বলাবাহুল্য আমার বন্ধুর এই ইঙ্গিতে আমি কখনও বিশ্বাস করি নাই। আমি জানি পদ্মরঞ্জন—পদ্মরঞ্জন। নিধুবাবুর টপ্পা একটু পরিবর্তন করিয়া বলা যাইতে পারে—

—"তাহারই তুলনা সে—এ মহীমণ্ডলে"। তাঁহার অর্থাগমের উপায়ের কথা সাধারণ লোক কি করিয়া বুঝিবে!

তিনি কিছু কমিশনও পাইয়া থাকেন এবং অর্ডার সাপ্লাইয়ের যে খুব বড় কারবার আছে তাহা ইহারা জানিত না। আমি বলিলাম—অর্ডার সাপ্লাই কারবার হইতে ইনি যথেষ্ট টাকা পাইয়া থাকেন। ইহার উত্তরে তাঁহারা বলিলেন—ওইত চালাকি—উহা ত নামকাওয়াস্তে—নইলে যে উত্তর দিবার কিছু থাকে না।

পদ্মরঞ্জন কতবড় অদ্ভুত কর্মী, তাহার কিছু পরিচয় পাঠকগণকে দিতেছি। যখন কোন একটি বিশিষ্টপদের ধ্বংস করিবার জন্য তাঁহাদের দলের অধিনায়ক সংকল্প করিলেন, তখন সেই দলে তৎকালীন যিনি দলের সকলকে সম্মিলিত করিবার জন্য আহ্বান পত্র প্রেরকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং সকলকে একমত করিবার চেষ্টা করিবার ভার যাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল (তাঁহার নাম আমরা বসন্ত সরকার বলিয়া উল্লেখ করিব) তিনি চেষ্টা করিয়া অকৃকার্য হইলেন। হতাশভাবে তাঁহাদের অধিনায়ককে আসিয়া জানাইলেন যে দলের বহু সংখ্যক ব্যক্তি তবেই অধিনায়ককে সাহায্য করিতে স্বীকৃত আছেন যদি তাঁহাদিগকে তাঁহাদের ইপ্সীত রমণী লাভের সুযোগ দেওয়া যায়। বসন্ত সরকার বলিলেন যে তাঁহার দ্বারা এই ঘৃণিত কার্য হইবে না, সুতরাং তিনি তাঁহার পদত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন। দলের অধিনায়ক কথাটা ভাল বুঝিতে না পারিয়া, বসন্তবাবুকে কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে বলিলেন ; তখন বুঝিতে পারা গেল যে দলের বাবুদের অনেকে নিজের পয়সা খরচ করিবেন না, বিনা পয়সায় আমোদ করিতে চান, কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেককেই আমোদের জন্য নির্দিষ্ট স্ত্রীলোক আনিয়া দিতে হইবে। কেহ চাহিয়াছেন মেম, কেহ চাহিয়াছেন ইহুদী, কেহ চাহিয়াছেন পার্শি স্ত্রীলোক, কেহ কেহ বাঙালিতেই সন্তুষ্ট আছেন কিন্তু নাম করিয়া বলিয়া দিয়াছেন অমুক অমুককে চাই। দলের মধ্যে একজন ছিলেন যাঁহার প্রতিপত্তি অন্য অপেক্ষা বেশি ছিল, তিনি হুকুম করিয়াছেন যে তাঁহার একটিতে পোষাবে না। বাঙালি, ইহুদি, মেম, পার্শি সর্ব জাতীয় স্ত্রীলোক তাঁহাকে জোটাইয়া

দিতে হইবে। অধিনায়কতো মাথায হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। অথচ তখন এই সব লোককে হাত করিতে না পারিলে তাঁহার সম্মান প্রতিপত্তি সবই নষ্ট হয়। আমাদের পদ্মরঞ্জন এই কথাবার্তার সময় উপস্থিত ছিলেন, তিনি উঠিয়া টেবিলে এক চাপড় মারিয়া বলিলেন—"কুছ পরোয়া নেই—ওরা যা চাচ্ছে আমি তাই দেবো, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমি ভার নিচ্ছি"—বলা বাহুল্য, পদ্মরঞ্জন এই অসাধ্য সাধন করিতে পারিয়াছিলেন এবং অধিনায়কের সম্মান প্রতিপত্তি তাঁহার দ্বারাই সেবার রক্ষিত হইয়াছিল। গোবেচারা বসন্ত বাবুর পদচ্যুতি ঘটিল এবং সেই হইতে তাঁহার সম্মানজনক পদ পদ্মরঞ্জন অধিকার করিলেন।

বহু সাধারণ লোকের দ্রুত উন্নতির প্রধান কারণ আমি যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে আমার মনে হয় যে—সামাজিক সভ্যতার চাপে মানুষ যে প্রবৃত্তিগুলির পরিতৃপ্তি প্রকাশ্যে করিতে সাহসী হন না, সেই প্রবৃত্তিগুলিতে গোপনে ইন্ধন যোগাইয়া দিয়াই চতুর লোক সহজে বড় হইতে পারে।

অবশ্য পদ্মবাবুর উন্নতির একটি কারণ আছে, সেটি হইতেছে তাঁহার বুকের পাটা। যাহাদের সম্বন্ধে ইংরেজ কবি বলিয়াছেন—

"Fools rush in there where angels fear to tread" অর্থাৎ "দেবদূতেরা যেখানে সন্তর্পণে পা ফেলিতে কুণ্ঠিত হয় মূর্খেরা সেই স্থানে দৌড়াইয়া যাইতেও কুণ্ঠিত হয় না"—পদ্মরঞ্জন সেই শ্রেণির লোক। লেখাপড়া তেমন না জানিলেও পদ্মরঞ্জন বৈষয়িক ব্যাপারে মূর্খ নহেন। যেখানে স্বার্থের গন্ধ আছে সেখানে পদ্মরঞ্জন "কিল খাইয়াছি কিন্তু অপমানিত হই নাই"—একথা অম্লান বদনে বলিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার আটকায় না। শুনিয়াছি তারকেশ্বরের মোহান্তের পদ খালি হইলে তিনি ওই পদের জন্যও প্রার্থী হইবেন। বর্তমান মোহান্তের যোগ্য প্রতিনিধি বটে।

এই অল্পদিন পূর্বের কথাই ধরুন না কেন, কলিকাতায় কোন প্রসিদ্ধ কলেজে তিনি ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে লম্বা বক্তৃতা দিয়া আসিয়াছেন। শুনিয়াছি সভা ভঙ্গের পর ওই কলেজের কয়েকটি রসিক খ্রীস্টান ও হিন্দুর ছেলে জর্ডনের জল ও গঙ্গা জল মিশাইয়া, যে চেয়ারখানায় তিনি বসিয়াছিলেন তাহা ধুইয়া ঘরে উঠাইয়াছিল। অন্যান্য ছাত্রেরা হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে বলিয়াছিল। এই প্রকার বক্তৃতা দিতে যাওয়া কি কম্ বুকের পাটা? তাঁহার যে বিদ্যা তাহাতে যে বক্তৃতা তিনি পাঠ করিয়াছেন তাহা বুঝিবারই শক্তি তাঁহার নাই। তাঁহার বক্তৃতা লিখিয়া দেওয়ার [লোকের] অভাব নাই। কলিকাতার কোন কোন প্রসিদ্ধ কাগজের সম্পাদক মাসে মাসে নিয়মিত প্রণামী পাইয়া তাঁহাকে boom করিতে অর্থাৎ তাঁহার সম্বন্ধে ঢক্কা নিনাদে বাজার গরম করিয়া রাখিতে সর্বদাই প্রস্তুত, এই সকল বক্তৃতা লিখিয়া দিতেও তাঁহারা প্রস্তুত। এই প্রকার সাহস এবং প্রয়োজন হইলে সর্ব প্রকার সৎ অসৎ কার্য করিবার শক্তি তাঁহার আছে বলিয়াই লক্ষ্মী তাঁহাকে কৃপা করিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশন, জাতীয় বাণিজ্য সমিতির তিনি মেম্বার, আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের তিনি মেম্বার। গুণ না থাকিলে কি আর কেহ এত প্রতিষ্ঠানের মেম্বার হইতে পারে? আমার এক

রসিক বন্ধু বলিয়াছেন—"প্রয়োজন হইলে মেম বা'র করিতে পারেন বলিয়াই পদ্মরঞ্জন এত দলের মেম্বার।" কিছুদিন পূর্বে তাহার ভোটরঙ্গ, টাকাকড়ি সম্পর্কিত [একটি সংবাদ পত্র]জুয়াচুরির একখানা দলিলের ব্লক করিয়া ছাপাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এসব জাল জুয়াচুরিতে পদ্মরঞ্জনের কি হয়? ভোটরঙ্গ অতবড় একটা গুরুতর জুয়াচুরির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াই বা তাঁহার কি করিতে পারিয়াছেন? তিনি ক্ষণজন্মা পুরুষ।

কি ভাবে নাম করিতে হয়, কি ভাবে কোথায় কী প্রকার ব্যয় করিলে চট করিয়া বেশি পরিচিত হইতে পারা যায় পদ্মরঞ্জন তাহা বেশ জানেন। তাঁহার এই বিদ্যা তিনি একেবারে আর্টে পরিণত করিয়াছেন। থিয়েটারের অভিনেত্রী যাহারা হয়, রূপ হিসাবে তাহারা প্রায়ই তৃতীয় শ্রেণির, কিন্তু তাহাদের সঙ্গ করিলে কাপ্তেন নাম সহজে জাহির হয়, কাজেই পদ্মরঞ্জন অভিনেত্রীর দলে ভিড়িয়াছিলেন।

প্রভাবশালী দুইচার জন লোককে হাতে রাখিলে, সময় অসময়ে ভোট প্রভৃতি ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়, সুতরাং তাহাদের ছেলেপিলেকে তিনি নিজের কোম্পানিতে চাকুরি দিয়া রাখিয়াছেন। প্রথমবার যখন ভোটে প্রতিযোগিতা করেন তখন তাঁহার দেশের প্রতিপত্তিশালী প্রায় সকল লোকের বেকার আত্মীয়ের চাকুরি করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়াছিলেন। তাঁর যে কী ক্ষমতা তাহা ত দেশের লোক জানে না! যে দলে আছেন তাহাতে এক দিনেই বঙ্গবিখ্যাত হওয়া সহজ, কাজেই সে দল ছাড়েন নাই। আবার অপর দল হইতে লাঠি গুঁতার আশঙ্কা আছে তাই গোপনে গোপনে নিজের দলের সংবাদ সেখানে পৌঁছাইয়া দিয়া তাহাদেরও মন রাখেন। নিজের দলের আদেশ অনুসারে কোন একটি প্রতিষ্ঠান তিনি ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু যেখানে তাঁহার স্বার্থ বিজড়িত, সে সকল প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করেন নাই। দেশকর্মী পদ্মরঞ্জন, দেশের অর্থ যাহাতে অপব্যয় না হয়, সেজন্য গত কলিকাতা কংগ্রেস এক্‌জিবিশনের সময়ে তাঁহার মাতার মৃত্যু-শয্যা পার্শে না যাইয়াও ন্যাস রক্ষকের কার্য করিয়াছেন। তিনি ছিলেন বলিয়াই টাকাগুলি অপরে নষ্ট করিতে পারে নাই। গর্ভধারিণী মাতা হইতেও ভারতমাতা তাঁহার নিকট কত বেশি প্রিয়। ভারতমাতার প্রতি এই প্রকার আকর্ষণ না থাকিলে কি দেশকর্মী আখ্যা পাওয়া যায়?

সুতরাং এহেন পদ্মরঞ্জনের উন্নতি হইবে না কেন? পদ্মরঞ্জনের জীবন-চরিত লেখা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির ক্ষমতা নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের "মুচিরাম গুড়" হইতেও পদ্মরঞ্জন বেশি ভাগ্যবান। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে উপযুক্ত ভাষায় পদ্মরঞ্জনের জীবন চরিত লিখিতে পারিতেন। পদ্মরঞ্জনের জয় হোক।

দুঃখের বিষয় এই যে, এই বঙ্গবিখ্যাত লোকটি তাঁহার দলের খাতিরে এবং নাম কিনিবার জন্য অজস্র অর্থব্যয় করিলেও ওই সকল ব্যক্তিই তাঁহার অনুপস্থিতিতে শ্বশুর-নন্দন ভিন্ন বলে না—বিবাহিত কি অবিবাহিত সকলেই এই মধুমাখা নাম বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে।

বর্তমান জীবন

কমলার সঙ্গ পরিত্যাগ করার পর আমি স্বতন্ত্র ভাবে বাস করিতে লাগিলাম। কমলার সঙ্গে এতদিন থাকিয়া বেতন এবং উপরি পাওনা ইত্যাদিতে আমার প্রায় পাঁচ হাজার টাকা জমিয়াছিল। সেই টাকাটা আমি একটি বিশ্বাসী মহাজনের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম। তিনি আমাকে মাসে মাসে ২৫৲ করিয়া সুদ দিতে লাগিলেন। অর্থ সম্বন্ধে অনেক ঠেকিয়া শিখিয়া আমি অনেকটা হুশিয়ার হইয়াছিলাম। এবার সংকল্প করিলাম যে ওই টাকাতে আর হাত দিব না। একটি অফিসার মেসের কক্ষ ভাড়া লইলাম। এম. এ. পাশ করিলেও চাকুরির বাজারে দেখিলাম আমার মূল্য খুবই কম। কমলার সঙ্গে থাকিয়া আমার পরিচয় হইয়াছিল, কাপ্তেন-বিলাসী-লম্পট বাবুদের সঙ্গে। যাঁহারা সদ্ভাবে জীবনযাপন করিয়া কমলার কৃপালাভ করিয়াছেন, সেই সমুদয় লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটিলেও তাঁহারা আমায় ঘৃণা করিতেন। চাকুরির বাজারে আমার বিশেষ সুবিধা হইল না অথচ খাইতে হইবে, থাকিতে হইবে, নেশার অভ্যাসটা তখনও ছাড়িতে পারি নাই, তাহারও খরচ আছে, কাজেই একটা কিছু না করিলেও চলে না। সুতরাং আমি তখন সেই ব্যবসাই অবলম্বন করিলাম, যাহা করা আমার পক্ষে একমাত্র সম্ভব ছিল, অর্থাৎ ''বেশ্যার দালালি"। আমার পাঠকগণ অনেকেই হয়তো জানেন না যে এটা কি ব্যাপার। তাঁহারা শুনিলে আশ্চর্য হইবেন যে কলিকাতার ভদ্রবেশধারী একদল লোক আছে যাহাদের জীবিকাই নির্বাহ হয় কাপ্তেন এবং লম্পটবাবুদের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য নূতন নূতন বেশ্যা সংগ্রহ করিয়া দিয়া। যাহারা কাপ্তেনি করিতে করিতে পাকা হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি আবার বেশ্যাতে হয় না, তাঁহারা গৃহস্থ ঘরের চরিত্রহীনা স্ত্রীলোক কামনা করেন। এই সকল দালাল সেই প্রকার স্ত্রীলোকও জোটাইয়া দিয়া অর্থ উপার্জন করিয়া থাকে। বেকুব বাবু পাইলে বেশ্যার হাতের বালা চুড়ি খুলিয়া তাহাকে থান কাপড় পড়াইয়া ভদ্রঘরের বিধবা পরিচয় দিয়া অনেকে বেশ ভাল রকম অর্থ আদায় করিয়া লইয়াছে, ইহাও আমি চোখের উপর দেখিয়াছি। ভদ্রঘরের চরিত্রহীনা স্ত্রীলোক আনিয়া—এমন কি অনেক সময় বেশ্যাকে ভদ্রমহিলা সাজাইয়া, এই সকল দালাল 'ইহাই তাহার প্রথম অভিসার' এই কথা বুঝাইয়া মূর্খের নিকট বহু টাকা লুটিয়াছে, ইহাও আমি জানি। দালালি ভাষায় এই প্রকার স্ত্রীলোকের নাম "Untouched"। অর্থাৎ একটি ভিন্ন অন্য কোন পুরুষ স্পর্শ [সেই নরীকে] করে নাই। কাপ্তেন বাবুদের নিকট এই "Untouched"-এর মূল্য খুব বেশি। শুনিলে আপনারা আশ্চর্য হইবেন, বাংলার কোন পত্রিকার সম্পাদক—এই ব্যবসা করিয়া বেশ দুপয়সা উপরি রোজগার করিতেছেন।

আমিও এই দালালি করিতে আরম্ভ করিলাম। তাহাতে আমার বেশ দুপয়সা উপার্জন

হইতে লাগিল। এই প্রসঙ্গে লম্পট জগতের আর একটা বিশেষত্বের পরিচয় পাঠকগণকে না দিয়া পারিতেছি না। হিন্দুস্থানি বেশ্যাদের মধ্যে (সাধারণত যাহারা বাইজী পর্যায়ে উন্নত তাহাদের মধ্যে) প্রথম পুরুষ সঙ্গ করার একটা Ceremoney অর্থাৎ বিহিত প্রথা আছে। সেই ব্যাপারকে "নথ্‌নি খসান" বলে। এই নথ্‌নি খসান ব্যাপারে মেয়ের অভিভাবিকা বা মাতা বেশ দুপয়সা লাভ করে। যে লম্পট বেশি অর্থ দিতে স্বীকৃত হয়, নথনি খাসাইবার সৌভাগ্য এবং গৌরব তাহারই লাভ হয়। কলিকাতার উত্তর অঞ্চলের কবিরাজ গোবর গণেশ সেনশর্মা একবার এক বাইজী কন্যার নথ্‌নি খসাইয়া দক্ষিণা দিয়াছিলেন পাঁচশত টাকা। এই গোবর গণেশের আরও অনেক কীর্তি আছে। একটি নার্স তাঁহার প্রেমে পরিয়াছিল, নার্সটির পায়ে গোদ ছিল কিন্তু সম্পত্তি ছিল প্রায় আশি হাজার টাকা মূল্যের। সেই গোদ্‌ সুশোভিত পায়ে প্রাণ সমর্পণ করিয়া গোবর গণেশ ওই সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন। যাক্‌ এসব কথা, যাহা বলিতেছিলাম তাহাই বলি।

বিপদ কখনো একা আসে না। যে মহাজনের নিকট আমি আমার টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম—এই সময়ে তিনি দেউলিয়া হইলেন—আমার শেষ সম্বল যাহা তাঁহার নিকট ছিল তাহাও গেল।

আমার জীবনব্যাপী পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। কখনো রাস্তায় ফুটপাতে, কখনো কোন পূর্ব পরিচিত বেশ্যার দাওয়ায়, কখনো ধর্মশালায় রাত্রি যাপন করি, আহার কোন দিন জোটে, কোন দিন জোটে না। মানসিক অশান্তিতে, রোগের যন্ত্রণায় ও ক্ষুধার তাড়নায় কতদিন আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছি, কিন্তু কাপুরুষ আমি, তাহাও করিতে পারি নাই। কলিকাতার ঘৃণিত পল্লীতে পূর্ব-জীবনের পরিচিত কোন একটি বেশ্যা তাহার নীচের তলার একটি স্যাঁতসেঁতে ঘরে দয়া করিয়া থাকিতে দিয়াছে, সেইখানেই থাকি। অন্য নেশা অনেক পূর্বেই ছাড়িয়াছিলাম। আফিম প্রায় সিকি ভরি দৈনিক না হইলে চলে না।

একটি পুরাতন গল্প আছে যে—এক ব্রাহ্মণ মানুষের কপাল ফলকে—বিধাতার লেখা পড়িতে পারিতেন। একদিন রাস্তায় একটি নরকপাল পড়িয়া আছে দেখিয়া তিনি কৌতূহলবশত তাহার কপালের লেখা পাঠ করিলেন ; দেখিলেন তাহাতে লেখা আছে—

ভোজনং যত তত্রশ্চ শয়নং হট্ট মন্দিরে।
মরণং গোমতী তীরে অপরস্বা কিং ভবিষ্যতি।।

অর্থাৎ—"ইহার যেখানে সেখানে ভোজন হইবে, হাটের কুঁড়ে ঘরে শয়ন হইবে, গোমতী তীরে মরণ হইবে (অর্থাৎ যেখানে মরিলে নরক) এবং ইহার পর আরও কিছু হইবার সম্ভাবনা আছে।" ব্রাহ্মণ খুবই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন—ভিক্ষান্নে জীবনযাপন, মাথা পাতিবার আশ্রয় না থাকায় হাটের কুঁড়ে ঘরে শয়ন, মৃত্যুর পরও নরক বাস, ইহার পর আরও কী হইতে পারে তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি নরকপালটি কুড়াইয়া বাড়িতে লইয়া গেলেন এবং তাঁর গোশালার পশ্চাদ্ভাগে একটি গামছায় জড়াইয়া ঝুলাইয়া রাখিলেন এবং প্রতিদিন একবার করিয়া সেইখানে যাইয়া নরমুণ্ডটি দেখিয়া

আসতেন। ব্রাহ্মণের স্ত্রী অত্যন্ত সন্দিগ্ধচিত্তা ছিলেন, তিনি—ব্রাহ্মণ রোজই ওই স্থানে যাইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকেন দেখিয়া সন্দেহবশত অনুসন্ধান করিতে যাইয়া ওই নরকপাল দেখিতে পাইলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন যে এই নরকপালটি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণের কোন গুপ্ত প্রণয়িনীর। মৃত্যুর পরও তাহাকে ভুলিতে পারে নাই, মুণ্ডটি আনিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। নরকপালটি পদাঘাতে চূর্ণ করিলেন, তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া সেই চূর্ণিকৃত মস্তক পায়খানার মলের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ পরে ব্যাপারটি যখন জানিতে পারিলেন তখন তাঁহার দুঃখও হইল, হাসিও পাইল। তিনি কেবল মাত্র বলিলেন যে—

—'অপরস্বা কিং ভবিষ্যতি" এখন বুঝিতে পারিলাম।

আমার অবস্থা এখন ওই নরকপাল যাহার ছিল তাহারই মত। মৃত্যুর পর আর কী আছে তাহা জানি না। এখন যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি তাহার চেয়েও বেশি যন্ত্রণা কি বৈতরণীর পরপারে আমার জন্য সঞ্চিত আছে? যে যন্ত্রণা, যে শত সহস্র বৃশ্চিক দংশন এখন আমি সহ্য করিতেছি তাহাতেও কি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই? কে বলিবে—কে আমার প্রশ্নের উত্তর দিবে! উত্তর নাই, পাইব কিনা জানিনা। ইহজীবনের যাতনা দুর্বিসহ হইয়া উঠিয়াছে, অনাগত পরজীবনের বিভীষিকাময়ী কল্পনায় মৃত্যুকেও সাদরে আহ্বান করিতে পারিতেছি না ইহাই আমার বর্তমান জীবন।

উপসংহার

আমি লেখক নহি, সাহিত্যিক নহি। ভাষার ঝঙ্কারে, আর্টের প্রাচুর্যে পাঠকগণকে মুগ্ধ করিবার শক্তি আমার নাই। জীবনে যাহা ঘটিয়াছে, যাহা উপলব্ধি করিয়াছি, যাহা দেখিয়াছি, যাহা শুনিয়াছি সোজা কথায় তাহাই প্রকাশ করিয়াছি। কোন পাঠকের মার্জিত রুচিতে আঘাত লাগিলে তিমি আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

এই পুস্তক কেন লিখিলাম তৎসম্বন্ধে পুস্তকের প্রথমে যে কৈফিয়ত প্রদান করিয়াছি. তদ্ভিন্ন আরও কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি। পূর্বে কী ছিল বলিতে পারি না, কিন্তু আমার জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে এবং বিশ্বস্ত বন্ধুগণের অভিজ্ঞতার ফল হইতে যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাতে আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমাদের হিন্দু সমাজের উচ্চ হইতে নিম্নতম সর্বপ্রকার স্তরের মধ্যে একটা ব্যভিচারের স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে। এই পুস্তকের মধ্যে আমি কতকগুলি সত্য ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি। পাঠকগণের অবগতির জন্য আরও কয়েকটা ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে এই উপসংহারে উল্লেখ করিব!

বাংলার সর্বজন পরিচিত খড়দহের গোস্বামী বংশের সরযূ নাম্নী কন্যা শিষ্যপুত্রের সঙ্গে কুলের বাহিরে আসিয়া প্রকাশ্যে বেশ্যাবৃত্তি করিতেছে। দেশের মধ্যে বিশেষভাবে পরিচিত উচ্চ রাজবংশের গৌরবময় আসনের অধিকারী জনৈক রাজা বাহাদুর, আমরা তাঁহাকে পাঁচকোটির অধীশ্বর বলিব, তিনি তাহাকে রক্ষিতাভাবে আশ্রয় দিয়াছেন। ভাবনীপুরের বিখ্যাত ব্যারিস্টার ঘোষবর্মা পরিবারের কন্যা কিছুদিন হইল পলায়ন করিয়াছেন।

একজন বিখ্যাত হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কন্যা বিবাহিতা হইয়াছিলেন চট্টোপাধ্যায় বংশের একজন ডাক্তারের সঙ্গে। এই ডাক্তার যাঁহার নাম আমরা দয়াময় চট্টোপাধ্যায় বলিব, তিনি কোন একটি বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। মহিলাটি নবাববংশীয় এক মুসলমান যুবকের সঙ্গে গৃহত্যাগ করিয়াছেন। শ্যামবাজারের সেন শর্মা পরিবারের কন্যা কুমারী গৌরী দেবী অপ্রকাশ্যে বেশ্যাবৃত্তি করিতেছেন। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব কোন বিখ্যাত বিচারপতির পুত্র রক্ষিতা বেশ্যা মণিমালাকে লইয়া প্রকাশ্যে দিল্লিতে এসেম্বলির অনেক সভায় যোগদান করিয়া থাকেন।

গৌরীশঙ্কর লেনের রেণুবালা পিতৃপরিচয়ে হাইকোর্টের এক জজের নাম বলে। রেণুর দুই লক্ষ টাকার সম্পত্তি আছে—বর্তমান সময় যে রাজকুমার তাহার নিকট আছেন তিনিও ষাট হাজার টাকা দিয়াছেন।

পুস্তকে কয়েকটি উচ্চশ্রেণির দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল, নিম্নশ্রেণির রমণীদের কথা সকলেই

জনেন—শতকরা ৯৫টিই বেণে, সাহা, নাপিত, ধোপা, পোদ, কেওড়া প্রভৃতি নিম্নশ্রেণির মেয়ে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমি বলিতে বাধ্য যে ব্যক্তিগত ভাবে আমি কমলার কথা ঠেলিয়া ফেলিতে পারি না, আমার নিজ জীবনের এবং বন্ধুবান্ধবগণের অভিজ্ঞতা হইতে যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে স্ত্রী এবং পুরুষের যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা পরস্পরের সহিত যদি অবাধ মেলামেশার সুযোগ পায় তাহা হইলে তাহাদের মানসিক প্রবৃত্তি তাহাদিগকে অধঃপতনের পথে টানিয়া লইয়া যায়। আমাদের শাস্ত্রকারগণ মূর্খ ছিলেন না—নারীকে ঘৃতকুম্ভের সহিত এবং পুরুষকে তপ্ত অঙ্গারের সহিত তুলনা করিয়া তাহাদিগের অবাধ মেলামেশার বিরুদ্ধে যে বাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন সেই বাণী অভিজ্ঞতাপ্রসূত তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার এই জীবন কথাতে যে সমুদয় ঘটনা উল্লেখ করিয়াছি তাহা হইতেই পাঠকগণ আমার কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন। রমলার অধঃপতনের কারণ, সে পল্লীগ্রামের কন্যা, বয়স্থা অবিবাহিতা পল্লীজীবনের কন্যার স্বাধীনতা বধূগণ হইতে অনেক বেশি, সুতরাং অবাধ মেলামেশার সুযোগ তাহার যথেষ্ট ছিল। উষা স্বাধীন জেনানা দলের মেয়ে, অবাধ মেলামেশাই তাহার সমাজের নীতি, মনোরমা এবং পরিমলও ওই দলের, সুতরাং তাহাদেরও ওই অবাধ মেশার ফলে পতনের সুযোগ ঘটিয়াছিল। সিংহকন্যা রমলা গুপ্তা, বরিশালের শোভনা হরণ, লীলাবতী হরণ, বি. এ. উপাধিকারিণী পদ্মকুমারী সিংহের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ অহল্যা হরণ প্রভৃতি যতগুলি উচ্চশ্রেণির হিন্দুবালিকার পতন ঘটিয়াছে তাহার মূলে ওই অবাধ মেলামেশাই মুখ্য ক ারণ।

বরিশালের গুহ বংশীয় ঢাকার এক বিশিষ্ট উকিলের পুত্র কলিকাতা হইতে এম. এ. পাশ করিয়া বিলাতে বিশেষ সম্মানের সহিত পি-এইচ. ডি. প্রভৃতি উপাধি পাইয়া পাঞ্জাবের কেনে কলেজে ৫০০ টাকা বেতনে প্রফেসারি চাকরি পান। এই সময়ে অন্য এক প্রফেসারের সঙ্গে তাঁহার খুব বন্ধুত্ব হয়, ফলে প্রফেসার পত্নী ইহার সঙ্গে সান্ধ্যভ্রমণ ইত্যাদিতে যোগ দেন। বন্ধুর মোটর সাইকেলেও এই প্রফেসারপত্নী বেড়াইতে যাইতেন ; বন্ধুর এই প্রকার আন্তরিকতায় স্বামী খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। হঠাৎ একদিন পত্নী তাঁহার স্বামীকে বলিলেন—"আমি তোমাকে মোটেই পছন্দ করি না, আমি প্রভুর সঙ্গে থাকিব।" যে কথা সেই কাজ। তিনি আর স্বামীর ঘর করিলেন না, প্রভুর সঙ্গে রহিলেন। দুর্ভাগ্য, এই ঘটনা প্রকাশ হওয়ায় প্রভুর চাকুরি গেল। প্রভু বন্ধুপত্নীকে লইয়া এখন কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। তাঁহার দুইটি সন্তান পিতার সঙ্গেই রহিয়াছে। প্রেমিক যুগল এখন খুব অর্থকষ্টে আছেন। এই মেয়েটি কোন অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের জজের কন্যা।[২৩] ইহা অবাধ মেলামেশার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। কমলার কথা কমলা নিজমুখেই বলিয়াছে, সুকৃতিও কমলার পদানুসরণই করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে যাঁহারা এই বিষয়টি একটু অবহিত হইয়া চিন্তা করিবেন তাঁহারাই জানিতে পারিবেন যে অবাধ মেলামেশাই এই সকল ব্যভিচারের মুখ্য কারণ।

কত আর বলিব? যে সমুদয় ঘটনা জানি তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ দিতে গেলে আর একখানা প্রকাণ্ড পুঁথি লিখিতে হয়। নারীজাতির দুঃখে নানাস্থানে কর্ম্মমন্দির, সেবাশ্রম, উদ্ধারাশ্রম, সমিতি প্রভৃতি স্থাপিত হইতেছে কিন্তু তাহার একটার মধ্যে যে কি ব্যভিচার স্রোত চলিতেছে যে, মানদা তাহার আত্মচরিতে খুলিয়া বলিয়াছে। আমিও অনেক জানি, দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত এই প্রকার একটি আশ্রমে শান্তিপুর হইতে উমা দেবী দেশের ডাকে গৃহের ডাক তুচ্ছ করিয়া আগমন করিয়াছিলেন। দেশবন্ধুর দলের জনৈক কায়স্থ কুলতিলক যিনি এসেম্বলির হুইপ হইয়াছিলেন, তিনি রুদ্ধকক্ষে উমাদেবীকে গীতা পড়াইতেন। শ্রীযুক্ত বসন্ত সরকার মহাশয় এই কেলেঙ্কারি জানিতে পারিয়া দেশবন্ধুকে তাহা জানান এবং উমাদেবী তাড়িতা হন। উপরোক্ত মিত্র মহাশয় তখন উমাদেবীকে লইয়া পশ্চিমে গমন করেন এবং সপুত্র প্রত্যাগমন করেন। উমাদেবীর স্বামী স্ত্রীকে ফিরাইয়া লইতে আসিয়া অনেকবার গলা ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া যান।

আর বাড়াইতে চাই না। এই ব্যভিচার স্রোত সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কোথায় এই স্রোত রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবেন, তাহার পরিবর্তে অতি আধুনিক তরুণ সাহিত্যে এমন ভাবে যৌন সম্মিলনের চিত্তাকর্ষণকারী চিত্র অঙ্কিত করা হইতেছে। যাহাতে তরুণবয়স্ক যুবক যুবতী পাঠক পাঠিকার মনে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইতেছে। আধুনিক তরুণ সাহিত্যের কাটতি দেখিয়া প্রাচীনপন্থী লেখকও এখন তাঁহাদের অনুকরণে সেইভাবে কলম চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই তরুণ সাহিত্যের প্রচার জন্য কয়েকখানি পত্রিকা বাজারে প্রকাশিত হইতেছে, শুধু তাহাই নহে পুরাতন এবং বহুল প্রচারিত কয়েকখানি মাসিক পত্রিকাও দেখিতেছি ওই জাতীয় গল্প প্রবন্ধে নিজ নিজ কলেবর সুশোভিত করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। ইহার পরিণামে আমার ন্যায় সহস্র সহস্র রমেশচন্দ্র সৃষ্টি হইবে সন্দেহ নাই।

দুই একখানি পত্রিকা কেবলমাত্র এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইবে কি না জানি না। প্রথমই এই সম্পর্কে নাম করিতে হয় সঞ্জীবনী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের। এই ঋষিকল্প বৃদ্ধ সময়ে অসময়ে স্থানে স্থানে প্রাণপণে এই ব্যভিচার স্রোত রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক নাট্যাভিনয়ের প্রতিও তীব্র কশাঘাত করিতে ইনি কুণ্ঠিত হন নাই। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে আজ ওই নাট্যাভিনয়ের ছড়াছড়ি পড়িয়া গিয়াছে। তরলমতি যুবক-যুবতীরা প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে মিলিয়া মিশিয়া পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া অভিনয়ের অনুরোধে পরস্পরের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যৌন ক্ষুধার অগ্নিতে ইন্ধন প্রদান করিতেছে, আর সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ সেই রঙ্গমঞ্চের দর্শকের আসনে বসিয়া তাহাদিগকে বাহবা দিতেছেন। আমার বেশ মনে আছে কমলা তাহার আত্মজীবন কাহিনি আমাকে বলিতে বলিতে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল—

—"পারিবারিক থিয়েটারই আমার সর্বনাশের প্রধান কারণ। তাহাতে ঘনিষ্ঠতার ফলেই

আমার লালসার আগুন প্রথম জ্বলিয়া উঠিয়াছিল আর তাহা নিবাইতে পারি নাই। নারীত্বের গর্ব সেইখানেই প্রথম ধুলায় লুটাইয়াছিল।"

আমার পাপ জীবনের চিত্রকে আমি সর্বসমক্ষে উদঘাটিত করিয়া দেখাইতেছি। যাঁহারা সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং সমাজের সংস্কারপ্রয়াসী তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া কোন্ কোন্ ছিদ্রপথে কেমন করিয়া পাপ প্রবেশ করিবার সুযোগ পায়। চাঁদ সদাগর যদি লোহার বাসরের ক্ষুদ্র রন্ধ্রটুকুর কথা পূর্বে জানিতেন তাহা হইলে লক্ষ্মীন্দ্রকে কালনাগিনী কাটিতে পারিত না। আজ আমাদের সমাজের শত শত লক্ষ্মীন্দ্র (লক্ষ্মী ছেলে কালে ইন্দ্রতুল্য হইতে পারিত) ব্যভিচার কাল নাগিনীর বিষে জর্জরিত হইয়া প্রাণ হারাইতেছে। স্কুল কলেজ বোর্ডিং-এর লৌহ বাসরে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া তাহাদিগের অভিভাবকরূপী চাঁদ সদাগর নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছেন। কিন্তু যে রন্ধ্রপথে কাল নাগিনী আসিয়া দংশন করিতেছে তাহার সংবাদও তাঁহারা রাখিতেছেন না। অমার এই জীবন কথা যদি তাঁহাদিগকে সেই রন্ধ্রগুলি দেখাইয়া দেয় এবং তাঁহারা যদি আমার জীবনের শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া তাঁহাদের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা স্থল স্নেহের পুতুলগুলির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সেই সকল রন্ধ্রগুলি বন্ধ করিতে চেষ্টিত হন তাহা হইলে আমার জীবনব্যাপী পাপের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

পরিশিষ্ট

মানদা-রমেশদা'র

চাপান-উতোর

পটভূমি : মানদা দেবী ও রমেশচন্দ্রর বই দু'টির প্রথম প্রকাশকাল জানা নেই। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ দেখবার সুযোগ থাকলে হয়তো তথ্যটি পাওয়া যেতো।

বই দুটি অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য দেখে অনুমান দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর ১৯২৫/২৬ থেকে ১৯৩০ সালে মানদা দেবীর বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। মনে হয় রমেশচন্দ্রর বইটি রমেশচন্দ্রর কথা অনুসারে 'শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত'-এর "....খুবই কাটতি হইয়াছে, পর পর চার পাঁচটী সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। গ্রন্থখনি হিন্দিতে এবং ইংরেজীতেও অনুবাদিত হইয়াছে." (দ্র. পৃ. ১৭৫) সুতরাং 'আত্মকথা' মানদা দেবীর বই প্রকাশের বেশ পরে প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা মানদা দেবীর বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ এবং রমেশচন্দ্রের বইয়ের পঞ্চম সংস্করণ মাত্র দেখবার সুযোগ পেয়েছি। এই সংকলনে মানদা দেবী ও রমেশচন্দ্রর বই-এর পাঠ এই দুই সংস্করণের (না পুনর্মুদ্রণ?) পাঠানুযায়ী। বানানের ক্ষেত্রে আমরা স্বাধীনতা নিয়েছি।

২

প্রকৃতপক্ষে মানদা-রমেশদার চাপান-উতোরের পালা শুরু হয়েছে ১৯১৪ সালে। রমেশচন্দ্র জানিয়েছেন : "বাংলা ১২৯২ সনের ৩০শে আশ্বিন তারিখে হুগলী জেলায়...গ্রামে আমার জন্ম হয়, আমার পিতা বিশেষ সঙ্গতিপন্ন না হইলেও একেবারে দরিদ্র ছিলেন না।' (দ্র. পৃ. ১২১)। অর্থাৎ রমেশচন্দ্র ১৮৮৫ খ্রিস্টিয় সনের অক্টোবর মাসে ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

অপরদিকে মানদা দেবীর কথায়, "১৩০৭ সালের ১৮ই আষাঢ় তারিখে আমি জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতা কলিকাতার এক সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্রাহ্মণ। আমি তাঁহার প্রথম সন্তান। পিতার নাম ও পরিচয় প্রকাশ করিতে অক্ষম।...আমার পিতামহ একজন সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। কলিকাতাতে তাঁহার চারিখানা বাড়ি এবং নগরের উপকণ্ঠে একখানা বাগানবাড়ি ছিল। তিনি বৃদ্ধ বয়েসে রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।...আমার পিতা হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার পসার বেশ জমিয়া উঠে।" (দ্র. পৃ. ২১)।

অন্যদিকে রমেশচন্দ্রর বাবা 'বর্ধমানের মহারাজাধিরাজের অধীনে বাৎসরিক প্রায় দেড় হাজার টাকা আয়ের পত্তনি তালুকের মালিক ছিলেন। এতদ্ব্যতীত গ্রামে আমাদের একটি বড় জোত ছিল।' (দ্র. পৃ. ১২১)। বেথুন স্কুলের ছাত্রী মানদা যখন পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী (সেকালের কথায় ষষ্ঠ শ্রেণির) তখন তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। মেয়ের ও সংসারের

তত্ত্বাবধানের জন্য মানদা দেবীর বাবা তাঁর বড় বোনকে নিয়ে আসেন। মানদার দেবীর ভাষায়, 'আমাকে দেখাশুনা করিবার নিমিত্ত আমার বিধবা পিসিমা আসিয়াছিলেন। তিনি আমার পিতার জ্যেষ্ঠা ভগিনী। আমার যাহাতে কোনো কিছুর অসুবিধা না ঘটে, সে বিষয়ে তিনি সর্বদা দৃষ্টি রাখিতেন।' (দ্র. পৃ. ২৬)।

মানদা দেবী ছিলেন বাবার আদরের দুলালি। কিন্তু অবস্থাগতিকে তাঁর মার মৃত্যুর প্রায় এক বছর বাদে, বাড়িতে বিমাতা আসলেন। ধীরে ধীরে মানদা দেখলেন, আগের মত তিনি বাবার সঙ্গ পাচ্ছেন না। যদিও বিমাতা তাঁর সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করতেন না। কিন্তু তারপর তাঁর একমাত্র সাথী ছিল মামাতো ভাই নন্দদা। মায়ের মৃত্যুর পর বাবা তাঁকে স্কুল ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই পরে আবার তিনি তাঁকে এক ক্লাস নিচুতে বেথুন স্কুলেই ভর্তি করে দেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে মানদা ও তাঁর মামাতো ভাই নন্দলালের অধ্যয়ন সংক্রান্ত তথ্যে সামান্য তারতম্য ত্রুটি আছে।

যা-হোক, ধীরে ধীরে মানদা প্রত্যক্ষভাবে পিতৃসান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হলেন। যদিও মেয়ের প্রতি বাবার জাগতিক সমস্ত কর্তব্য তিনি করতেন।

এই ভাবেই বালিকার মনে ক্ষোভ-দুঃখ জমতে লাগলো। এবং শিক্ষক মুকুলদা, নন্দদার সান্নিধ্যে এবং বিমাতার বাপের বাড়ি থেকে আগত খাস দাসী (নামে মাত্র) হরিদাসী মানদাকে বা মানদার আচার-ব্যবহার পছন্দ করতে না পারায়, তার সঙ্গে মানদার সম্পর্ক 'মধুর' ছিল না।

ইতিপূর্বেই মানদাদের দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি রমেশচন্দ্র চাকুরির সুপারিশ নিয়ে হাজির হয়েছিলেন।

মানদার তেরো বছরের জন্মদিনের পর থেকে সিনেমা-থিয়েটারে রমেশচন্দ্র ও মানদা-নন্দদা-গৃহশিক্ষক মুকুলদার সঙ্গে নিয়মিত সঙ্গী হয়ে উঠেছিলেন রমেশচন্দ্র।

পাঠকের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে, রমেশচন্দ্রর মানদাদের সঙ্গে নৈকট্যের আগের জীবনের কথা তাঁরই 'আত্মকথা' অনুসারেও কদর্য ছিল।

মানদা অকপটে লিখেছেন, 'আমার যৌবনোদ্ভব হইয়াছিল। অভিভাবকের অসাবধানতা [না অবহেলায়?] ও অনুকূল পবনে যথাসময়ে আমার হৃদয়ের মধ্যে প্রবৃত্তির অনল জ্বলিয়া উঠিল, আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।' (দ্র. পৃ. ৩২) এবং লক্ষণীয়, 'আমাব প্রথম যৌবনের উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা প্রাণের মধ্যে জাগিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে **সম্মুখে দেখিলাম দুইটি যুবক—মুকুল ও রমেশ**। প্রকৃতির নিয়মে ইহাদের দিকে প্রবৃত্তির প্রবাহ প্রবল বেগে ছুটিল।...**মুকুলদা একটু ভীরু স্বভাব। রমেশদা ছিল সাহসী** ও বেপরোয়া।' (দ্র. পৃ. ৩৬-৭)।

তারপরের কাহিনি তো পাঠকের জানা। এই পরিপ্রেক্ষিতে মানদা দেবীর চাপান বিচার করাই উচিত।

মানদার প্রথম চাপান ১. রমেশদা তাঁকে কুলত্যাগিনী করেছেন। ২. রমেশদা তাঁকে মিথ্যা কথা বলেছিলেন। 'মানি, আমি চার মাসের ছুটি নিয়েছি। চলো পশ্চিমে যাই।' তার আগে বলেছিলেন, 'একদিন রমেশদা আমার নিকট প্রস্তাব করিল আর তো এ বাড়িতে হতে পারে না। এমন স্থানে চলো, যেখানে নিত্য তোমায় দেখব...আমি কোনো উত্তর না দিয়া রমেশদার গলা জড়াইয়া তাঁর বুকে মাথা লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম।' (দ্র. পৃ. ৩৭)

মনে রাখতে হবে ইতিমধ্যেই মানদা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্রর **উতোর** কি? তিনি তাঁর 'আত্মকথা'র "মানদা ও আমি" অধ্যায়ে সোজাসাপটা বলেছেন : 'প্রায় মাসাধিক কাল তাহাদের বাড়িতে থাকিয়া পরে বোর্ডিং-এ গিয়াছিলাম। এই সময়ের মধ্যেই জানিতে পারিলাম যে মানদার কুমারীধর্ম অক্ষত নাই। মুকুলই তাহার গুপ্ত প্রণয়ী।...যদি না জানিতাম যে মানদা পতিতা হইয়াছে তাহা হইলে হয়ত মানদার সর্বনাশ করিবার প্রবৃত্তিই আমার প্রাণে জাগিত না।... সে নিজের সঙ্গে সম্পর্কিত বলিয়া [জ্ঞাতি-আত্মীয়তা] আমি খুব সম্ভব আপনাকে সম্বরণ করিয়াই চলিতাম,.. মানদা কিন্তু মুকুলের সঙ্গে তাহার সম্পর্কের কথা একেবারেই চাপিয়া গিয়াছে।' (দ্র. পৃ. ১৭৬)।

এই প্রসঙ্গে মানদা ও রমেশচন্দ্রর বয়ানে ফারাক আছে। আমরা জেনেছি মানদার বিবরণ থেকে, যেদিন মানদা-রমেশের মধ্যে যৌনমিলনের ইঙ্গিত আছে, মানদার ভূমিকা ছিল প্রশ্রয় দানের। রমেশ ছলনা বা বলপ্রয়োগ করেছিল এমন অভিযোগ নেই। বরং তারপর থেকে পারস্পরিক আকর্ষণে তারা মিলিত হত। অন্তঃসত্ত্বা হবার পর রমেশচন্দ্রর পক্ষে যে কাজটা স্বাভাবিক ছিল, তা হচ্ছে মানদার সঙ্গে সম্পর্কছেদ অথবা গোপনে 'গর্ভপাত' করানোর চেষ্টা করা। এখানে রমেশচন্দ্রর চাকরি উপলক্ষে মানদার বাবার উপকার গৌণ। মানদার গৃহত্যাগের কারণের জন্য রমেশকে একা দায়ী করা চলে না।

মুকুল সম্পর্কে রমেশের কথা বিবৃতি মাত্র। তার কোনো প্রমাণ নেই। 'আত্মকথা'র সঙ্গে সংযুক্ত একটি বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় **মুকুলদার মর্মকথা** নামক একটি বই, বিজ্ঞাপনে ঘোষিত 'মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত। **মানদা ও রমেশদা যাহা গোপনে করিয়াছিলেন, মুকুলদা তাহাও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।'**

চাপান-উতোরের অন্য অভিযোগ রমেশচন্দ্রর চাকরি থেকে ছুটি, অফিসের তহবিল তছরূপ, মানদাকে অসহায় অবস্থায় ত্যাগ করে পালিয়ে যাওয়া, লাথি মারা ইত্যাদি প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্রর মিথ্যাচার 'আত্মকথা'র পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন।

সুতরাং মানদা দেবীর **চাপান-এর** গুরুত্বপূর্ণ অংশ মানদার অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় গৃহ/কুল ত্যাগের **উপলক্ষ** রমেশচন্দ্র। পরবর্তীকালে রমেশচন্দ্রর **উতোর** তাঁর 'আত্মকথা' অনুসারেই ধাপে টেকে না।